

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য:  
ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন (১৭০০-১৮৯৯)

পিএইচ.ডি (কলা বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

পাভেল সুলতানা

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নং - A00BE1401517

তত্ত্বাবধায়ক

ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী

প্রাক্তন অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

২০২৩

**Certified that the Thesis entitled**

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য: ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন  
(১৭০০-১৮৯৯) (Musolman Sahitik Rochito Nirbachita Bangla Sahityo:  
Vasha o Sanskritir Pratiphalan (1700-1899)) Submitted by me for the  
award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur  
University is based upon my work carried out under the Supervision of  
Dr. Udaya Kumar Chakraborty, Professor (Retd), Department of Bengali,  
Jadavpur University; And that neither this thesis nor any part of it has  
been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

**Countersigned by the  
Supervisor:**

**Dr. Udaya Kumar Chakraborty  
Retired Professor  
Department of Bengali  
Jadavpur University  
Kolkata 700032  
Dated:**

**Candidate**

**Pavel Sultana  
Dated:**

## মুখবন্ধ

সুবিশাল ব্যাপ্তির মধ্যেই ধরা পড়ে ঐক্য। ভারতবর্ষের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে বহু ধর্ম, বহু জাতির মানুষের সমাবেশ যেমন লক্ষ করা যায় তেমনই বন্ধনের সুরও ধ্বনিত হতে থাকে তাঁদের হৃদয়ে। এই চিরকালীন আত্মীয়তার হাত ধরে এই দেশের মানুষের বেঁচে থাকা। তবুও বারংবার বহুজাতির দেশ ভারতবর্ষ বৈদেশিক শক্তির আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে। আক্রমণাত্মক হয়েও ততটা পরাহিত না হয়ে নিজেদের সূত্রে বেঁধে থেকেছে আমাদের এই দেশ। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন কালক্রমে এদেশ তাঁদের সকলের মাতৃভূমি হয়ে উঠেছে। আসলে এই দেশের নিজস্ব একধরনের সংস্কৃতি হয়তো প্রতিটি মানুষ আজীবন বহন করে চলেছেন তাঁদের সন্তায়-মজ্জায়। যে ধর্মের-বর্ণের মানুষই হোক সকলের মন্ত্র হয়তো বা এক। সত্যি কথা বলতে মানবজন্মের পর একটা আইডেনটিটি (Identity) নিয়ে বাঁচতে হয়, সর্বদাই তা শুধুমাত্র জাতি বা শ্রেণিবিভাজনের নিরিখে নির্বাচিত হবে এমন বোধহয় বাঞ্ছনীয় নয়, সেই পরিচিতি সর্বোপরি 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকে সুদূরপ্রসারী হয়ে বাংলা সাহিত্যের সম্ভার বহুভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ধারায় মধ্যযুগ এক বিরাট ব্যাপ্তিকে তুলে ধরে। জানা যায় মধ্যযুগের একটা সময়পর্ব থেকে মুসলমান লেখকরা বলিষ্ঠ হাতে কলম ধরেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের যে গতানুগতিক ধারা সেখান থেকে সরে এসে নতুন ধরনের কাব্যসম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছেন। মূলত তাঁদের লেখনীতে রোমান্টিক প্রেমের যে আখ্যান তাকে প্লট করে বহু কাব্যের কথা উঠে এসেছে, এখানেই তাঁদের বিশেষ কৃতিত্ব। কাজেই এই সামগ্রিক আলোচনার পরিসর থেকে উঠে আসে বেশ কিছু প্রশ্ন।

প্রথমত- সাহিত্যিকদের আলাদা করে কোনও জাতির আওতাভুক্ত করে নির্বাচন সম্ভব কিনা।

দ্বিতীয়ত- সংস্কৃতির উৎস বলতে ঠিক কি বুঝি এবং সংস্কৃতি কীভাবে মানুষের জীবনে জড়িয়ে আছে।

তৃতীয়ত- এছাড়া ভাষা কীভাবে সমাজ বিশেষে বা শ্রেণিসম্প্রদায়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে তার কারণ খুঁজে বার করা।

মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে এনামুল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আনিসুজ্জামান, আবদুল করিম, আহমদ শরীফ, ওসমান গনী, সুকুমার সেন প্রমুখ ব্যক্তি যে সম্ভার পাঠক সমাজে হাজির করেছেন তা সত্যিই অমূল্য। তবে বিশেষভাবে ইসলামি সাহিত্য নিয়ে যা বলেছেন তার বিপুলতা অনেকখানি এবং কৃতিত্বের দাবী রাখে। ‘ইসলামি সাহিত্য’ এই নামে যে সাহিত্যের ভাঙার ঠিক এর উৎস কোন জায়গা থেকে, এই সাহিত্যের মধ্যে কোন ধারার কাব্য পাচ্ছি তা দেখার। ইসলামি সাহিত্য শুধুমাত্র ধর্মপ্রচারমূলক উদ্দেশ্যে লিখিত কিনা তা এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই উঠে আসবে, যা আমাদের সামনে নতুন দিককে উন্মোচন করবে আশা রাখি।

মুসলমান সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্য আলোচনার পাশাপাশি সেই সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার দিকটিও আমাদের নজরে আসার মতো, মধ্যযুগের সময়পর্বে একধরনের ভাষা সাহিত্য রচনায় ব্যবহৃত হতে থাকে, মুসলমান সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বলা যেতে পারে মুসলমান সাহিত্যিকরা পরিচিত থেকেছেন ‘দোভাষী পুথি’ রচনার মধ্য দিয়ে। এই দোভাষী ভাষা কি? এর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য কেমন তা আমাদের জানার বিষয়। মধ্যযুগের অন্যান্য শাখার সাহিত্যের সঙ্গে মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্য ধারার ভাষাগত বিভেদ কতটা সেই দিকটির প্রতিও লক্ষ রাখা হবে এই গবেষণার কাজে। সর্বোপরি আরও জানার বিষয় হল মধ্যযুগের সাহিত্যের যে বিপুলতা সেখান থেকে ইসলামি সাহিত্য কতখানি পাঠকসমাজে সমাদার লাভ করেছে।

সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে ‘পুথি’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, বাংলা ভাষায় এক ধরনের স্বর-পরিবর্তন দেখা যায়, যাকে ভাষাতাত্ত্বিকরা ভাষার স্বরসঙ্গতি বলেছেন। মধ্যযুগের বাংলায় ‘পোথা’ বা ‘পোথী’ উক্ত স্বরসঙ্গতির নিয়মে ‘পুথি’ শব্দে পরিণত হয়েছে। এছাড়া বানান বিধির ক্ষেত্রে ‘আকাদেমি বানান অভিধান’ (পঞ্চম সংস্করণ) অনুসৃত হয়েছে।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট উপাধি অর্জনের জন্য প্রদত্ত হয়েছে। সমগ্র গবেষণাপত্রটি যাঁর সহায়তায়, সহযোগিতায়, সুমতাদর্শ প্রদানে



সম্ভব হয়েছে তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী, স্যারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়ে গবেষণাপত্রটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিশেষ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এবং গাওসিয়া লাইব্রেরি, ওসমানিয়া লাইব্রেরি এছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর সমস্ত কর্মকর্তাসহ সকলের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

দীর্ঘ ৬ মাস অন্তর আয়োজিত Research Advisory Committee (RAC) এর পরামর্শদান আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। এক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা জানাই রাজ্যেশ্বর সিন্হা (বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), স্যামন্তক দাস (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), সুবর্ণ কুমার দাস (লাইব্রেরি সায়েন্স বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)। এছাড়া বাংলা বিভাগের স্যার এবং ম্যামদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনেকখানি।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ নির্মাণে UGC (University Grants Commission) কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ, তাঁদের আর্থিক সাহায্য গবেষণার কাজে সাফল্য দান করেছে।

এছাড়াও আমার একান্ত সুহৃদ তুহিন হককে কৃতজ্ঞতা অনেকখানি। গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনায় বিশেষভাবে পরামর্শদান, বহুক্ষেত্রে বেশ কিছু বই সংগ্রহ করে দিয়ে শেষ অবধি পাশে থেকেছে। আমার নিকটতম সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। এছাড়া যিনি নিয়মিত আমার কাজের খোঁজ নিয়েছেন পরামর্শ দিয়ে গেছেন তিনি হলেন গোলক শর্মা (দাদু সম্পর্কিত) তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ। সবশেষে আমি যাঁর কাছে চিরঞ্চনী, যাঁর সার্বিক প্রচেষ্টা সর্বদাই আমার চলার পথে পাথেয় হয়েছে তিনি হলেন আমার মা (কবিতা বিবি)।

পাভেল সুলতানা

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

## সূচিপত্র

মুখবন্ধ	i-iii
ভূমিকা	১-২৯
প্রথম অধ্যায়: মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা	৩০-৫৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: বিভিন্ন সংরূপ ও শ্রেণিবিচারের পর্যালোচনা	৫৪-৭৬
তৃতীয় অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: নিবিড়পাঠ ও বিশ্লেষণ (নির্বাচিত সাহিত্য)	৭৭-১৮০
ক. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান	৭৮
খ. ধর্মীয় ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক রচনা	৯৯
গ. জঙ্গনামা	১০১
ঘ. নীতিশাস্ত্রমূলক রচনা	১০৮
ঙ. পীরকেন্দ্রিক সাহিত্য	১১৩
চ. কিসসা/কেছা সাহিত্য	১৩১
চতুর্থ অধ্যায়: দৈনন্দিন জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির নানাদিক (নির্বাচিত সাহিত্য)	১৮১-২৫৯
পঞ্চম অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: সুফি সাধনার প্রভাব	২৬০-২৮৩
ষষ্ঠ অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য	২৮৪-৩৩৫
ক. সমাজভাষা	২৮৭
খ. সাহিত্যে প্রাপ্ত মৌখিক ভাষার ব্যবহার	২৯৩
গ. দোভাষী সাহিত্যে ভাষাগত বৈচিত্র্য ও শব্দ ব্যবহারের প্রায়োগিক দিক	৩০৫
ঘ. উপসর্গ ব্যবহার	৩১৭
ঙ. ছন্দ প্রয়োগ	৩১৮
চ. লিঙ্গ বাচক শব্দের ব্যবহার	৩২২
ছ. বানান রীতি	৩২৩
উপসংহার	৩৩৬-৩৪৮
গ্রন্থপঞ্জি	৩৪৯-৩৬৭

পরিশিষ্ট ১	I-VII
মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত পুস্তকের আখ্যাপত্র	
পরিশিষ্ট ২	VIII-XII
ইসলামি পুথির চিত্র	
পরিশিষ্ট ৩	XIII-XV
মুসলিম জনসংখ্যা ও শিক্ষার গণনা	

## ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কোনও এক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বা জাতির মানুষের হাতে বদ্ধ নয়। এই সাহিত্য হিন্দু, মুসলমান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর লোকজন রচনা করেছেন তাঁদের বিপুল দক্ষতার সঙ্গে। হিন্দু ধর্মের কোনও লোক যখন লিখছেন তিনি হিন্দু সাহিত্যিক হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছেন আবার ইসলামধর্মের লোকেরা যখন লিখছেন এঁদের আমরা মুসলমান সাহিত্যিক বলছি। ধর্ম দিয়ে সাহিত্যিকের শ্রেণি নির্ণয় করা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়। তবুও প্রাথমিকভাবে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে ‘মুসলমান সাহিত্যিক’ কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এইরকম শ্রেণিবিভাজনের কোনও গুরুত্ব আছে কিনা, তা অনুসন্ধানের একটি দিক হিসাবে দেখা হবে। এছাড়া একই সময় পরিমণ্ডলে থেকেও হিন্দু ও মুসলিম সাহিত্যিকদের লেখার ফারাক কতটা এটা বোঝানোর জন্য আরও এই শিরোনাম নির্বাচন। সাহিত্য সমালোচক মহলে এই বিষয়টি নিয়ে চর্চা-চর্যার জায়গা তৈরি হয় এবং তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উঠে আসে সপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) মুসলিম জাতির একেবারে অন্তরমহলের ভিতর থেকে সাহিত্যকে তুলে ধরার কথা বলেছেন। যা জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে সাহিত্যে। তিনি মুসলমানের ধর্ম-সংস্কৃতিকে বহনের কথা যেমন বলেন পাশাপাশি সমগ্র বাঙালি জাতির জীবনধারাকেও আত্মস্থ করার কথা বলেছেন।<sup>১</sup> অনেকেই আবার বিকল্প মতামত প্রকাশ করেছেন। আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন (১৯২৯-১৯৭১) এই প্রসঙ্গে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন, তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ভাষা অনুসারে সাহিত্যের নামকরণের কথা উঠে আসে।<sup>২</sup> এছাড়া সাহিত্য বিশারদ আবদুল করিম (১৮৬৯-১৯৫৩) ‘কোহিনুর নবপর্যায়’ পত্রিকায় তাঁর ‘বঙ্গীয় মুসলমানের বঙ্গ সাহিত্য-চর্চা’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন-

“হিন্দুর সাধনায় হিন্দু সাহিত্য, এবং মুসলমানের চেষ্ঠায় মুসলমান সাহিত্য- এই দুই শাখার সম্মিলনে বঙ্গসাহিত্য এক বিরাট কলেবর ধারণ করিবে ও বিপুল শক্তি শালিনী হইবে।”<sup>৩</sup>

এই বিষয়টি নিয়ে আবদুল করিম এখানেই থেমে না থেকে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, ‘মুসলিম সাহিত্য’ বলতে মুসলমানের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে রচিত সাহিত্যের কথা বলেছেন।<sup>৪</sup> বাংলা সাহিত্যে ‘মুসলমান সাহিত্যিক’ এই পরিচয়ের মধ্য দিয়ে যাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের সাহিত্য শুধুমাত্র যে ধর্মীয় বাতাবরণে ভরে উঠেছে এমনটা বলা বোধহয় সঙ্গত নয়, ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থের কথা আমরা জানতে পারি কিন্তু সব কাব্যই ধর্মমূলক নয়। এ প্রসঙ্গে হুমায়ূন কবিরের বক্তব্যে উঠে আসে পুরোপুরি মুসলমান রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচিত হলে তাতে একপ্রকারভাবে সাহিত্যের মর্যাদাহানি ঘটে। অপরপক্ষে হিন্দু সাহিত্যকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচিত হলে তাতেও সাহিত্য রচনা ক্ষুণ্ণ হয়। তাই সাহিত্যের দরবারে উন্মুক্ত মন নিয়ে সম্মিলিতভাবে প্রয়াসের পথে এগিয়ে চলাই শ্রেয়।<sup>৫</sup>

বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটিকে পূর্ণতা দানের জন্য বিশেষ সময়পর্ব হিসাবে মূলত সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীকে নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এই সময়পর্বে মুসলমান সাহিত্যিকরা কি ধরনের সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁদের সাহিত্য রচনার নির্বাচিত বিষয় কি ছিল এবং সংস্কৃতি ও ভাষার ঠিক কোন জায়গাগুলি আমরা এঁদের রচনায় আলাদা করে পেয়ে থাকি সেই বিষয়গুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিকদের এই আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের মুসলমান জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা জেনে নেওয়া দরকার। বিশ শতকের প্রায় প্রারম্ভকাল পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানদের জীবনে সর্বত্রই অবক্ষয় ও অধঃপতন নেমে এসেছিল, সামাজিকভাবে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে অনেক পিছিয়ে পড়ে। কেবলমাত্র বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেই এই চিত্র বহাল ছিল শুধুমাত্র এমনটা নয়, গোটা ভারতীয় মুসলমান সমাজকে বেশকিছু সামাজিক আচার-বিধি, মতবিশ্বাস, গোঁড়ামি গ্রাস করে।<sup>৬</sup> আসলে জানা যায় বঙ্গদেশে

হিন্দু-মুসলমান এই দুই জাতির মধ্যে সম্পর্কের যে বাঁধন তা মোটামুটিভাবে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আন্দোলিত হতে থাকে। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সেই সম্পর্ক অনেকাংশে উদারনৈতিকতার জায়গায় চলে আসে অবশ্যই সাহিত্যের হাত ধরে বিশেষত পীর সাহিত্যের ছোঁয়ায়। সমাজজীবনে হিন্দু-মুসলমান এই দুই জাতির পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উঠে আসে সুকুমার সেনের কথায় তুর্কি আক্রমণের পর গোটা বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির মধ্যে পারস্পরিক মিলনের সম্পর্ক তৈরি হয় দুটি ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে একদিকে শাসকের দরবার অন্যদিকে পীরের আস্তানা। শাসনকর্তার দরবারের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পরিসর তৈরি হয় এবং দরবারে উপস্থিত হিন্দু মন্ত্রী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নানাধরনের বিনোদনের আশ্বাস পেতে থাকে। অন্যদিকে মুসলমানদের পীরের আস্তানায় জাতিভেদের কোনও রকম বেড়াজাল না থাকায় সর্বধর্মের মানুষ অবাধে বিচরণ করতে পারত এবং প্রত্যেকে নিজেদের মতো করেই আশ্বাস ও নির্ভর পেত।<sup>১</sup> বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি সহাবস্থান যেমন তাঁদের সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেক পরিসর তৈরি করে দেয় ঠিক একইভাবে সামাজিক জীবনের মধ্যে গভীরভাবে ছাপ ফেলে। বঙ্গদেশ ছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোটা ভারতবর্ষের পরিস্থিতি নিয়ে K.N. Panikkar তাঁর ‘Culture, Ideology, Hegemony Intellectuals and Social Consciousness in Colonial India’ গ্রন্থে বলেছেন-

“Almost every work on eighteenth-century Indian posited a direct connection between political anarchy and socio-cultural development”.<sup>২</sup>

সামাজিকভাবে মুসলমানদের জীবনে যে অবক্ষয় নেমে আসার কথা আমরা জানতে পারি তা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় উঠে আসে। এছাড়া বঙ্গদেশের মুসলমানদের জীবনে ঊনিশ শতকের প্রভাব সম্পর্কে অতীন ভট্টাচার্য মতামত প্রকাশ করে জানিয়েছেন এই শতক মূলত সমগ্র বাঙালি মুসলমানদের জন্য দ্বন্দ্বের কাল হিসাবে চিহ্নিত।<sup>৩</sup> সামাজিকভাবে যেমন মুসলমানরা বাস্তব জীবনে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এই সময়ে অনেকটাই

ব্যর্থ হয়েছেন অন্যদিকে অর্থনৈতিকগত দিক দিয়েও তাঁদের জীবনে দুর্দিন নেমে আসে। সমাজের সর্বত্রই মুসলমানদের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল অনেকটাই দুর্বল। মুসলমানদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষজন যাঁরা কৃষিজীবী এবং শ্রমনির্ভর কেন্দ্রিক পেশায় নিযুক্ত ছিলেন।<sup>১০</sup> শুধুমাত্র এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের আলোচনাতে বঙ্গদেশের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক চিত্রই পরিস্ফুট হয় না, একই সঙ্গে উঠে আসে তাঁদের রাজনৈতিক চেতনার দিকটিও। প্রথমদিকে মুসলমানরা বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বরাবরই নিজেদেরকে দূরে রাখতে চেয়েছেন যা তাঁদের সার্বিকভাবে পিছিয়ে দেয়।<sup>১১</sup> অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে বিকল্প রাজনৈতিক প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করেছিল তা হল স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের উত্থান এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনরাষ্ট্র হিসেবে তাদের একত্রীকরণ। বলা যেতে পারে, মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের পর যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার খণ্ডন, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে নতুন রাজনৈতিক কাঠামোর উদ্ভব ঘটেছিল তাতে স্বায়ত্তশাসিত এবং স্বাধীন রাজ্যগুলি কোনোভাবেই প্রাণশক্তি বর্জিত ছিল না।<sup>১২</sup> মুসলমানরা তবুও সার্বিকভাবে ভারতবর্ষের মাটিতে নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাকে যেমন বহন করেছেন অপরদিকে অন্যান্য সংস্কৃতিকেও আত্মস্থ করেছেন।

ইসলামি কাহিনি, ইসলামি ভাব ও আদর্শ নিয়ে রচিত সাহিত্য বিশ্বের দরবারে যথেষ্ট যোগ্য বলে গ্রহণীয় নয় এই রকম মতবিরোধের জায়গা তৈরি হলে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দেয় কিন্তু কীভাবে এই সাহিত্য রচিত হবে তা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হতে থাকে। একদল পুঁথি সাহিত্যের ধারাকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনার কথা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে বাংলা ভাষার মধ্যে আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েও সাহিত্য তৈরির কথা জানা যায়। এই অবস্থায় মুসলমানরা মনে করেন তাঁদের জাতীয় সাহিত্যের দুটি দিক থাকবে একদিকে ‘দীন’<sup>১৩</sup> অন্যদিকে ‘দুনয়া’।<sup>১৪</sup> তাঁদের রচিত সাহিত্যে বৈজ্ঞানিকভাব (Scientific Spirit) ও ধর্ম্যভাব (Religious Spirit) দুটোকেই প্রাধান্যের কথা ভাবতে থাকেন।<sup>১৫</sup> প্রথমদিকে এইরকম বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হলেও সময়ের অগ্রগতিতে সাহিত্য রচনার স্টাইল বদলে যায়।

শিরোনামের দিকে তাকিয়ে যে শুধুমাত্র মুসলমান সাহিত্যিকদের কথায় জেনে নেব তেমন নয়, আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু সাহিত্যিকদের পরিচয় এবং তাঁদের রচিত সাহিত্য সম্পর্কেও আমরা জানব। বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন শাখার যে কাব্যধারা তা শুধুমাত্র হিন্দু লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে বদ্ধ থাকেনি, মুসলমান লেখকের চিন্তা-চেতনা-ভাবনায় এসেছে কাব্য রচনার অনুসন্ধিৎসু ইচ্ছা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ‘নবনূর’ পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা; শ্রাবণ, ১৩১১) ‘হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি’ নামক প্রবন্ধে বলেছেন-

“হিন্দু ও মুসলমান ভারতের দুইটি প্রধান ও উন্নত সম্প্রদায়। আজ কালবশে এই উভয় জাতির ভাগ্য একই সূত্রে গ্রথিত। উভয়ের সুখ দুঃখ উভয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কাহাকে ছাড়িয়া কাহারো একদন্ড তিষ্টিবার যোগ্য নাই। মাতৃভূমির প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত করিতে হইলে দেশস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসিবর্গের একতা একান্ত আবশ্যিক ও অপরিহার্য।”<sup>১৬</sup>

যে জায়গা থেকে গবেষণার এই প্রয়াস মূলত দেখতে হবে মুসলমান সাহিত্যিক যাঁদের কথা আমরা জানব তাঁরা কতটা নিজেদের মতো করে সাহিত্যের শাখাকে মেলে ধরেছেন তাঁদের দক্ষতায়। পূর্ববর্তী গবেষক যাঁরা ইসলামি সাহিত্য নিয়ে তাঁদের মূল্যবান সম্ভার পাঠকবর্গকে উপহার দিয়ে গেছেন সেই জায়গা থেকে আমাদের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের অভিনবত্ব ঠিক কোন জায়গায়। কোন বিষয়কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই গবেষণা তা গোড়াতেই বলা ভালো। এছাড়াও ভাবনাগত, আঙ্গিকগত দিক থেকে কোনও পার্থক্য আছে কিনা সেই সম্পর্কে গভীরভাবে পাঠ করে দেখার। এস. এম. আকবরউদ্দীন বলেন বাংলা সাহিত্য বলতে শুধুমাত্র হিন্দু লিখিত বাংলা সাহিত্যকে বুঝলে হবে না পাশাপাশি বাঙালি মুসলমানের রচনাকে দেশীয় সাহিত্যে স্থান দিতে হবে।<sup>১৭</sup> বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে নির্বাচিত সময়গুলি গভীর তাৎপর্য দাবী করে। যতদূর জানা গেছে বাংলা সাহিত্যের যে যুগবিভাগ তার সবচেয়ে বেশি সমাদৃত এবং এককথায় বলা যেতে পারে ‘সীমার মাঝে অসীম’কে খুঁজে পাওয়ার মতো যুগ হল মধ্যযুগ। এই সময়পর্বে যে ধরনের সাহিত্য বাঙালি পাঠককুল আত্মসাৎ করেন তাতে



যেমন তাঁদের একধরনের আলসেমি তেমন তাঁদের অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। ‘আলসেমি’ এই কারণেই বলা হল কারণ এই পর্বের সাহিত্যগুলো খুব নিবিড়ভাবে পাঠ না করলে অতটাও সাহিত্য রসাস্বাদনের উপযোগী বলে মনে নাও হতে পারে, বিশেষ করে ‘ইসলামি সাহিত্যের’ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কথাটি প্রযোজ্য। গোড়াতেই মঙ্গলকাব্যের কথা ধরা যাক, সে সময়ের মানুষের এক রকমের অন্ধবিশ্বাস ছিল সবকিছুর উপর, তার থেকে পরিত্রাণের জন্য এইসমস্ত কাব্যের জন্ম, ‘মঙ্গল’ অর্থাৎ সব কিছু শুভ হবে এমন প্রত্যাশায় মানুষ মঙ্গলকাব্যের জয়গান গেয়ে সব কিছুর উর্দ্ধে যেতে চেয়েছেন। তেমনভাবেই কখনও মর্ত্য জীবনেই স্বয়ং মানব চরিত্র মানুষের ভাবনার বিচারে হয়ে উঠেছেন দেবতার সমতুল্য, চৈতন্যদেব এমনই এক মানব চরিত্র যাঁর ভক্তিতে নিবেদিত প্রাণ থেকেছেন একদল মানুষ। বিচিত্রমুখী সাহিত্যের যে সম্ভার বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা সত্যিই আমাদের সামনে অনেক পথ খুলে দেয়। ঠিক এরই মাঝে মুসলমান সাহিত্যিকরা নিজেদের মতো করে বাংলা সাহিত্যে তাঁদের স্বাক্ষর বজায় রেখেছেন। আবদুল মালিক চৌধুরীর কথায় জানা যায়-

“মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্য সেবিগণ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা সংস্কৃত মূলক বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আলোচনা করেন তাঁহারা একশ্রেণী। এই সাহিত্য গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। আর যাঁহারা উর্দু পারসী শব্দ বহুল সাধারণ মুসলমানের চলিত ভাষায় আলোচনা করেন তাঁহারা অপর শ্রেণী। ইহা দোভাষী বাঙ্গালা বা মুসলমানি বাঙ্গালা নামে কথিত হইয়া থাক।”<sup>১৮</sup>

মুসলমানরা ভারতবর্ষে প্রবেশের পর থেকে ইংরেজ শাসন অবধি অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই সময়পর্বকে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এদেশে আসার পর মুসলমান জাতির জীবন একই প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেনি, পরিবর্তনের হাত ধরে তাদের পথ চলা। হিন্দু জনজাতির পাশাপাশি মুসলমানরাও সমাজে নিজেদের মতো জায়গা তৈরি করে নেয় কিন্তু একটা সময় এসে তাঁদের চিন্তাভাবনায় একমুখী প্রভাব পড়ে তার প্রমাণ

সাহিত্যে দেখা যায়।<sup>১৯</sup> ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং উচ্চতর সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে খুব সহজেই নিজেদের আকৃষ্ট করে তুলেছিল।

হিন্দু এবং মুসলিম উভয়ে মিলে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের এক ক্ষেত্র গড়ে তোলে।

‘During the Muslim rule, the Hindus were hardly inclined to absorb even the simple aspects of Muslim culture, while the common muslims living in India, were more easily attracted with the much superior cultural life in art, science, literature, music and spiritual knowledge of the Hindus, and they made themselves considerably benefited in their cultural field.’<sup>২০</sup>

ভারতবর্ষে আগত মুসলমান জনজাতির মাতৃভাষা ছিল ফারসি এবং ধর্মভাষা ছিল আরবি। মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের যে সাধনা সেই ধারায় মুসলিম সম্রাটগণের যথেষ্ট অবদান ছিল। বাগদাদ কার্ভোভায়, হিরাট কায়রায় মুসলমান খলিফাদের যে জ্ঞানসাধনা দেখা যায় তারই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে বাংলার বাদশাহেরা।<sup>২১</sup> ভারতবর্ষে অবস্থিত হিন্দু জাতির সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে একদম প্রাচীনকাল থেকে। আরবপ্রদেশের লোকজন সমুদ্রপথে নানাদেশে যাতায়াত করে পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদান করত। ভারতবর্ষের মুম্বাই, সুরাট, কালিকট প্রভৃতি পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলিতে আরবরা ভারতবাসীর সঙ্গে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। অপরপক্ষে ভারতবর্ষীয় বণিকগণরাও পণ্যসম্ভার নিয়ে পারস্য ও আরবদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিকভাবে লেনদেন চালাত। ফলে ভারতবর্ষে স্থিত হিন্দুগণের সঙ্গে আরব ও পারস্য দেশের বাণিজ্যিক সূত্র ধরে একরকম যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি হয়।<sup>২২</sup>

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত যে সাহিত্য আমরা এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি তা মূলত ‘বটতলার সাহিত্য’, ‘দোভাষী সাহিত্য’ এবং ‘পুথি সাহিত্য’ ইত্যাদি নামে পরিচিত।<sup>২৩</sup> মুসলমান সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যের ধারায় নিজেদের মতো করে সাহিত্য রচনার পথ তৈরি করে নেয়। সাহিত্য রচনার ভিতর দিয়ে নিজেদের জনজীবন, নিজেদের কালচারের কথা যেমন বলেছেন পাশাপাশি বাঙালি জাতির নিজস্ব যে একধরনের কালচার তার কথাও বলেছেন। মুসলমান সাহিত্যিকরা আরব, পারস্য দেশের কাহিনির দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়ে কলম ধরেছেন অন্যদিকে

হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রভাবেও সাহিত্য রচনা করেছেন। আরাকান রাজদরবারের রাজসভার সাহিত্য যেমন আমরা পাই তেমনভাবেই লৌকিক সাহিত্যের সম্ভার নিয়েও হাজির হয়েছেন মুসলমান সাহিত্যিকরা। আরাকান, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ইত্যাদি অঞ্চলের কথা অনায়াসেই এসে পড়ে মুসলমান সাহিত্যিকদের কথা প্রসঙ্গে। এই অঞ্চলগুলি সাহিত্য রচনার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বঙ্গদেশের সঙ্গে আরাকান-চট্টগ্রাম এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বহু আগেই থেকেই তৈরি হয় ইতিহাসের হাত ধরে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকায় তাঁর ‘রোসাঙ্গ রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন- রোসাঙ্গ ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তবর্তী এক বিশাল রাজ্যের রাজধানী। মগরাজার অধীন এই রাজ্য। একটা সময়ে মগরাজার মুসলমানভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁদের রাজদরবারে মুসলমানদেরই প্রাধান্য ছিল। সুদূর আসাম প্রদেশ পর্যন্ত মগরাজার বিস্তৃত ছিল। তাঁরা বহুবীর চট্টগ্রাম অধিকার করে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিকার নিয়ে ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ হয়। শেষপর্যন্ত মগ এবং পর্তুগীজ শক্তির পরাজয় হয়। অন্যদিকে মুসলমানরা চট্টগ্রাম অঞ্চল অধিকার করে এবং নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করে।<sup>২৪</sup> এই চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসে মুসলমান সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনা করেন। আমরা দৌলত কাজি, আলাওল প্রমুখ সাহিত্যিকদের কথা জানতে পারি। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রভূমিতে শ্রীহট্টের মুসলমানদের যথেষ্ট অবদানের কথাও জানা যায়। এ প্রসঙ্গে আবদুল মালিক চৌধুরী ‘আল্-এসলাম’ পত্রিকায় তাঁর ‘বঙ্গসাহিত্যে শ্রীহট্টের মুসলমান’ প্রবন্ধে বলেন-

“শ্রীহট্ট যেমন আমাদের মাতৃভূমি, শ্রীহট্টের ভাষা-তথা বঙ্গভাষাও আমাদের মাতৃভাষা। এই বঙ্গভাষা প্রধানতঃ প্রাচীন আর্যদের সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইলেও সুদীর্ঘকাল হইতে নানারূপ পরিবর্তন ও বিবিধ দেশজ ও বৈদেশিক ভাষার মিশ্রণজনিত রূপান্তর গ্রহণ করিয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে।”<sup>২৫</sup>

মুসলমান সাহিত্যিকরা বাংলা ভাষাকে রাজদরবারে স্থান দিয়ে নতুনভাবে সাহিত্য সৃষ্টির পথ খোঁজেন। রোমান্টিক প্রণয়কাব্য থেকে শুরু করে লোকজীবনের সাহিত্যের

ধারা তাঁদের হাতেই তৈরি হয়। লৌকিক দেবতা-পীরদের নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে দেখা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন উনিশ শতকের শুরু থেকেই বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আত্মানুসন্ধানের দিকটি প্রকট হয়ে ওঠে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক আচার-আচরণের টানা পোড়নে সমাজের মধ্যে পীর-প্রথা ও লৌকিক দেব-দেবী পূজা এছাড়া বিশুদ্ধ ইসলামীয় শিক্ষার অনুসরণের দিকে ঝোঁক বাড়তে থাকে।<sup>২৬</sup> এই পীর বা ফকিরদের কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দ্বারা পীরেরা পূজিত হতেন।<sup>২৭</sup>

মুসলমান সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্যগুলি কলকাতার বটতলায় মূলত পাওয়া যায় কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে কলকাতা লোকসংস্কৃতির দিক দিয়ে আরও পরিশীলিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠে। যে সমস্ত লেখকগোষ্ঠী গ্রাম থেকে শহরের বিভিন্ন প্রেসে আসতে শুরু করেন তাঁদের কাছে একটা অন্যতম আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল কলকাতা।<sup>২৮</sup> এছাড়া উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় সস্তা ছাপাখানা গড়ে ওঠে। এই ছাপাখানায় মুসলমানরাও সমানভাবে এগিয়ে আসে। শিক্ষিত-অশিক্ষিতসহ সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে এই ইসলামি পুথির বেশ কদর ছিল।<sup>২৯</sup> উনিশ শতকের কলকাতার বটতলায় প্রহসন, রোমাঞ্চ কাহিনি, ইত্যাদি বিশেষ সাহিত্য ধারার পাশাপাশি আরও একধরনের রচনারীতি গড়ে উঠেছিল যা সে তুলনায় স্বল্প-আলোচিত। এই পুস্তকগুলি মূলত ইসলামি শাস্ত্রকথা, আরবদেশের মোহাম্মদ ও তাঁর বংশধরদের বীরত্ব কাহিনি, পারস্য প্রণয়গাথা এবং স্থানীয় পীর-মাহাত্ম্য ও আচার-আচরণকেন্দ্রিক বিষয় নিয়ে লিখিত হয়েছে। এই ধারার সাহিত্যকে ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য’ এই নামের অন্তর্ভুক্ত করে সাহিত্যিক সুকুমার সেন মহাশয় ১৯৫১ সালে একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেন।<sup>৩০</sup>

ইসলামি সাহিত্যের যে বিস্তার পরিমণ্ডল আছে তা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এই সাহিত্যের নানা দিক পাঠক সমাজে আজও পাঠিত ও চর্চিত। বহু ধরনের আঙ্গিককে ঘিরে সাহিত্য রচিত হয়, মুসলমান সাহিত্যিক রচিত রোমান্টিক

প্রণয়োপাখ্যান, জঙ্গনামা, ইসলাম ধর্ম-ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক সাহিত্য, নীতিশাস্ত্রমূলক রচনা, পীরকেন্দ্রিক সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন সাহিত্যের মতো কেচ্ছা/কিসসা সাহিত্যও বেশ জনপ্রিয়তার জায়গা তৈরি করে নেয়। মূলত জানা যায় গ্রাম্য জীবনের বহু বিচিত্র দৈনন্দিন ঘটনাকে ঘিরে এই কেচ্ছা কাহিনির গল্প লিখিত হয়। এই কেচ্ছা সাহিত্য কি? এর বিষয়বস্তু কেমন? এই বিষয়টিও আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভে একটা দিক হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। কেচ্ছায় বর্ণিত গল্পগুলির বাস্তবতা সম্পর্কে পাঠক সমাজকে ভাবায়। গল্পের মধ্যে এমন ঘটনার কথা জানতে পারছি যা বাস্তবকে অতিক্রম করে অবাস্তবের দিকে হাত বাড়ায়। বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যিকরা নিজেদের সাধ্যমত গ্রামাঞ্চলের বহু ঘটনাকে প্লট করে গল্প রচনা করেছেন যা ‘গ্রাম্য কিসসা’ বা ‘কেচ্ছা’<sup>৩১</sup> হিসাবে প্রচলিত হয়েছে। শুধুমাত্র যে একটি ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু করে পুরো কেচ্ছা রচিত এমন বলা খুব সহজ কথা নয়, বহু ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে আবার নতুন নতুন ঘটনা নিয়ে কেচ্ছা কাহিনি সম্পন্ন হয়েছে। সমাজের বাস্তব চিত্রকে নিগূঢ়ভাবে কবির তুলে না ধরলেও অনেকক্ষেত্রেই ইসলামি জীবন, দর্শন সেই সম্প্রদায়ের নানান সংস্কৃতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি রূপকথার গল্পের ছলেও কেচ্ছার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আসলে ইসলামি সাহিত্যের ধারায় একদম লেখনীর প্রথমধাপ থেকে কেচ্ছা কাহিনি রচিত হতে শুরু করে। তবে পরবর্তীতে মূলত ‘দোভাষী রীতি’র সময় থেকে এর রচনা বাড়তে থাকে। তাই বলা যেতে পারে সময়ের হাত ধরে অন্যান্য সাহিত্য ধারার মতো এই কেচ্ছা সাহিত্য জনপ্রিয়তার জায়গা তৈরি করে নেয়।

মধ্যযুগের ইসলামি সাহিত্য যে শুধুমাত্র রোমান্টিকতার জায়গায় থেমে থাকেনি এটাই বলার, বিভিন্ন ধরনের রচনার কলাকুশলীতে মুসলমান সাহিত্যিকরা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। তাই ‘পদ্মাবতী’ ও ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’র মতো আরও অনেক কাব্যকে আমাদের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত করে এর সুরাহা করা দরকার এবং এই সাহিত্যের কদর কতখানি তা সত্যিই আমাদের জানা দরকার। এই সমস্ত ভাবনা থেকে আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে। ইসলামি সাহিত্যের যে পরিসর সেই জায়গা থেকে পূর্ববর্তী অনেক গবেষক বা সাহিত্যিকরা নিজেদের মতো

করে আলোচনার জায়গা তৈরি করেছেন এবং নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এই আলোচনার পাশাপাশি অনালোচিত কিছু রচনার বিবৃতিও তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণাগ্রন্থে। বেশকিছু ইসলামি পুথি যার আলোচনা হয়তো সেইভাবে হয়নি কিন্তু পুথিগুলি সম্পাদকের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সেই সম্পাদিত পুথির বিশেষ কতগুলোর নিবিড় পাঠ করে তার বিশ্লেষণের চেষ্টা আমরা করেছি। ইসলামি পুথির এই যে বিপুল সম্ভার তা আমাদেরকেই সযত্নে লালন করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের যে ধারা তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামি সাহিত্যের স্পর্শ আছে। অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্য সর্বত্রই এর অবাধ বিচরণ লক্ষ করার মতো। মুসলমান সাহিত্যিক কিন্তু তিনিও বিশেষভাবে নাথ ধর্মের গোরক্ষনাথের গল্পকে প্লট করে কাব্য রচনা করেন যেমন- শেখ ফয়জুল্লা (১৫৪৫) ‘গোরক্ষবিজয়’ (১৯১৭ সাল) কাব্য লিখেছেন। এইভাবে বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে ইসলামি সাহিত্য তার গতিপথে এগিয়ে গেছে। সেই গতিপথকে আরও সুদৃঢ় করতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত সাহিত্যের কথা জেনে নেওয়া হবে এবং বিশেষ এক ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সংস্কৃতি এবং ভাষার দিকে আলোকপাত করা হবে। আসলে সংস্কৃতির মধ্যে থেকেই একটি জাতির সত্তা যেমন নির্মাণ হয় তেমনই সেই সত্তার হাত ধরে সাহিত্যও রচিত হতে থাকে বিশেষ বিশেষ পরিমণ্ডলে।

“Culture is expressed in various elements of racial consciousness the common experience, the common sufferings, the common strivings in quest of happiness, the myths and the faith. Culture aims at accepting a complete man with his integrated personality, by fulfilling all of his shortcomings and improving upon his mental understanding.”<sup>৩২</sup>

আসলে আমাদের গবেষণার মূল জায়গা হল একদম সাধারণ জনজীবনকে ধরে প্রচলিত কালচার বা সংস্কৃতি যেমন- ঘর, বাড়ি, বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়, বসন এই বিষয়গুলিকে একেবারে অবজেকটিভ (Objective) জায়গা থেকে দেখা বা প্রেজেন্ট (Present) করা। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে আসলে মুসলমান সাহিত্যিক রচিত

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি এবং ভাষা এই দুটি দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

‘সংস্কৃতির’ কথা বলতে গেলে মানুষের জন্মলগ্নের কথা মনে পড়ে যায়। মানব-জীব সৃষ্টির পর থেকেই তাঁর সত্তার মধ্যেই Culture বা সংস্কৃতি সহজাত রূপেই থাকে। বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজনের মধ্য দিয়ে মানুষের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের হাত ধরে সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। সংস্কৃতি প্রত্যেক যুগে সমাজের প্রতিটি মানুষই বহন করে চলেছে নিজেদের অজান্তেই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে, সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত। চিরকালের জন্য তাই সংস্কৃতির রূপ নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। মানব জীবনের সঙ্গে সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুটোই গতিশীল ব্যাপার। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যুগে যুগে পরিবর্তন হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পরে এদেশে ইসলামি সভ্যতা আসে এবং ইসলামি সংস্কৃতির জন্ম হয়। মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতির কথা আমরা জানতে পারি যা বিশুদ্ধ হিন্দুও নয়, বিশুদ্ধ ইসলামও নয়, যা হচ্ছে ভারতীয় হিন্দু-ইসলামীয় সংস্কৃতি।<sup>৩০</sup> ভারতবর্ষের মতো বহুজাতির, বহুবর্ণের দেশে কোনও একক সংস্কৃতির স্মৃতিচিহ্ন হয় না, প্রত্যেক জাতি যে পরিমণ্ডলে বিরাজ করে সেইভাবে নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি মেনে চলার চেষ্টা করে, তবে শিকড় ভুলে কিছু নয়। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান জাতিরা নিজেদের মতো বেঁচে থাকলেও কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বৈদেশিক জনগোষ্ঠী (শক, হুণ, মোঘল, পাঠান) এদেশে এসেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে কিন্তু যুগের বহমানতায় এঁরাও এদেশের মানুষের সঙ্গে একদেহে লীন হয়েছে। ভারতবর্ষের কালচার বা সংস্কৃতি শুধু কোনও বিশেষ জাতের বা সমাজের মনোভাবের অবলম্বনে তৈরি নয়, এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের ভারতীয় কালচারকে (Indian Culture)<sup>৩১</sup> আগে জানা দরকার। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যুগে যুগে পরিবর্তন হয়েছে। এই ভারতীয় সংস্কৃতির একটি ধারা ইসলামি সংস্কৃতি। মুসলমান বিজয়ের পর ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। প্রথম পর্বে ছিল হিন্দু সংস্কৃতি পরে ইসলামি সংস্কৃতির ধারা এসে মেশে।<sup>৩২</sup> মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে সংস্কৃতি নিহিত থাকে, একদম ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে যেমন- সামাজিক, অর্থনৈতিক,

রাজনৈতিক, ধর্মীয়, পারিবারিক প্রতিটি স্তরেই সংস্কৃতি জড়িয়ে থাকে।<sup>৩৬</sup> মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যের মধ্যে কোনও একক সংস্কৃতির ছাপ নেই কাব্যপাঠে আমরা বুঝতে পারি। আসলে ধর্মীয় বাতাবরণের ছাপ যে সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে না তা ‘ইসলামি সাহিত্যের’ মধ্যে ধরা পড়েছে। মুসলমান সাহিত্যিকরা আরবি-ফারসি কাব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং অনুবাদের মাধ্যমে তাঁদের রচিত কাব্য জনপ্রিয়তার জায়গায় এসেছে। জাতি হিসাবে ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতবর্ষে বসবাস করলেও লেখনীর ছোঁয়ায় এসেছে আরবি-ফারসি কাব্যের অনুবাদ। তাই এই শ্রেণির রচিত সাহিত্যকে একদল সমালোচক ‘দোভাষী পুথি’ নামে চিহ্নিত করেছেন। কাব্যগুলির মধ্যে এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাতে ইসলামি পরিভাষা ফুটে উঠেছে। সংস্কৃতির একটা দিক হিসাবে ভাষাকেও আমরা ভাবতে পারি। ‘মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য: ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন’ শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে ইসলামি সংস্কৃতির কথা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছি যে সংস্কৃতির মধ্যে মিশ্রতার ছাপ ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি এ প্রসঙ্গে আমাদের বঙ্গদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কেও জানা দরকার। ইংরেজ আগমনের পূর্বে বাঙালি সংস্কৃতির দুটি প্রবণতা চোখে পড়ার মতো ছিল-

“The two main trends in Bengali culture prior to the advent of the British were represented first by a host of folk songs, rituals, poetry, verse-plays which had developed through social and occupational customs of the labouring classes as well as through popular religious beliefs; and secondary by lyrics and songs of a classical nature composed in Sanskrit or highly Sanskritized Bengali, patronized by the royalty”.<sup>৩৭</sup>

বঙ্গদেশে বাঙালি জাতির জীবন বিদেশি-শাসিত বা বিজাতি-শাসিত হয়ে এসেছে চিরকালধরে। বাংলায় প্রতিষ্ঠিত ধর্মগত জাতিগুলিও (হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিষ্টান) কখনও বিদেশ থেকে এসে অথবা আরব এবং প্রান্তবর্তী অঞ্চল থেকে এসে নিজেদের মতো জীবনপ্রণালী গড়ে তুলেছে। বঙ্গদেশের সংস্কৃতিকে ‘এক অখণ্ড বঙ্গীয় সংস্কৃতি’ বলে চিহ্নিত করা যায়না কখনও এমন মন্তব্য করেছেন অনেকে।<sup>৩৮</sup> সংস্কৃতির



আলোচনায় বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান এই দুই জাতির কথা উঠে আসে। বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক ধারায় বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভাষাগত বিভেদ থাকলেও সাংস্কৃতিক রুচি সম্পর্কিত বিষয়ে সমমনোভাবাপন্ন ছিলেন।<sup>৭৯</sup> বাংলাদেশে ইসলাম প্রবেশের পর বৈষয়িক, মানসিক, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি। সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়লেও কোনোভাবেই সাংস্কৃতিক দিককে ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি। বাংলায় বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির ক্ষেত্র তৈরি হয়, মুসলমান সাহিত্যিকদের কেউ কেউ আরব-ইরানীয় আবার দেশীয় সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে সাহিত্য রচনা করেছেন।<sup>৮০</sup> ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনেক আগে থেকেই মুসলমানদের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৈরি হতে শুরু করে। জগদীশ নারায়ণ সরকার (Jagadish Narayan Sarkar) বলেন-

‘Bengal’s contact with the Muslims, especially in the field of trade, colonization and missionary work, began much earlier than its conquest in the thirteenth century.’<sup>৮১</sup>

বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ইতিহাসকে শুধুমাত্র অসহিষ্ণুতা এবং বিভ্রান্তিকর বিবরণের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা যায় না। মাঝে মাঝে অনেকক্ষেত্রে পারস্পরিক সহর্মিতার প্রভাব উল্লিখিত। ফলে সমাজজীবন ও সংস্কৃতিতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সখ্যতার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।<sup>৮২</sup> বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে শিশিরকুমার মিত্রের কথায় জানা যায়-

“It is needless to multiply instance of this kind of fellowship in the domain of religion which is a remarkable phase in the Hindu-Muslim relations in Bengal. An inherent tendency towards synthesis and harmony had always been there; and it took a new turn when Bengal came into contact with Islam. This resulted in the growth of almost a common religious consciousness in the two communities to a degree that, in time, ‘many a Mahomedan offered puja at Hindu temples, as the Hindus offered sinni at ‘Mahomedan mosques.’”<sup>৮৩</sup>

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলিম জাতির culture বা সংস্কৃতির দিকটি কেমন ছিল সেই বিষয়েও আমরা জানতে পারি। মুসলিম

কালচার অর্থে আরব দেশের Semitic Culture<sup>৪৪</sup> ও গ্রিক জাতির Hellenic Culture এর কথা জানা যায়। তবে পরবর্তীতে মুসলমানরা World Culture এর দিকে নিজেদের নিয়োজিত করেন।<sup>৪৫</sup> ভারতবর্ষে মুসলিম কালচার বা সংস্কৃতি বলতে তাই একদিকে যেমন আরবি-ফারসি সংস্কৃতির কথা এসে পড়ে অন্যদিকে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের রূপও ধরা দেয়। একইসঙ্গে সুফি অনুশীলনের দিকগুলিও বেশ স্পষ্ট হয়।<sup>৪৬</sup> সুফি দর্শন, চিন্তা এবং তার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ মধ্যযুগের ভারতীয় জনজীবন, সমাজ এবং সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষকরে ভারতীয় মুসলমান জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে সুফি মতবাদ জড়িয়ে পড়ে।<sup>৪৭</sup> মুসলিম সংস্কৃতিকে অনেকেই অনেকভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) ‘মুসলিম সংস্কৃতি’ সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেছেন এই সংস্কৃতি আরবি অথবা ফারসি নয়। কোনোভাবে এটিকে জাতীয় সংস্কৃতিও বলা যায় না। সম্পূর্ণ ‘কোরানকেন্দ্রিক সংস্কৃতি’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।<sup>৪৮</sup> মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে বিরাট পরিসরে সমন্বয়-সাধিত হয়েছিল বলে যে ধারণায় আমরা প্রলুব্ধ সেই সাংস্কৃতিক দিকের বহুমাত্রিকতাকে জেনে নেওয়াও আমাদের দরকার। বর্তমান গবেষণার ভিতর দিয়ে আমরা সেই সংস্কৃতির নানা দিককে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছি। বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলিম দুই জাতির পারস্পরিক সহাবস্থানের ফলে তাঁদের মধ্যে একধরনের যোগাযোগ বরাবরই ছিল। উনিশ শতকের মুসলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলিতেও হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের চিত্র ফুটে ওঠে যার অবদানও স্বীকার করার মতো। এই ক্ষেত্রে আমরা আহমদী পাক্ষিক (জুলাই, ১৮৮৬), হিতকরী পাক্ষিক (এপ্রিল, ১৮৯০), হিন্দু মোসলমান (১৮৮৭) এবং কোহিনুর মাসিক (জুলাই, ১৮৯৮) এই পত্রিকাগুলির উল্লেখ করতে পারি।<sup>৪৯</sup> হিন্দু-মুসলমান দুই জাতির ঐক্যকে তুলে ধরতে কোহিনুর (মাসিক) পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের আখ্যাপত্রে লেখা হত- ‘হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত মাসিকপত্র ও সমালোচনা।’<sup>৫০</sup>

বাংলা সাহিত্যে হিন্দু সাহিত্যিকদের রচনার পাশাপাশি মুসলমান সাহিত্যিক রচিত যে সাহিত্য আমরা পাই সেই সাহিত্যগুলোর নিবিড়পাঠের পাশাপাশি সংস্কৃতির

আলোচনার প্রসঙ্গটি যেমন উঠে আসে তেমনই ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দিকটিও বিলম্বণের দাবি রাখে। আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য সেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে কেন্দ্র করে ভাষার দিকগুলিকেও তুলে ধরার। সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটি আলোচনার জন্য কতকগুলি প্রশ্নকে সামনে রেখে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

- বাংলা সাহিত্যে হিন্দু সাহিত্যিকদের পাশাপাশি ‘মুসলমান সাহিত্যিক’ এই নামে আলাদা করে সাহিত্য রচনার প্রয়াস কেন দেখা দিল।
- মুসলমান সাহিত্যিক রচিত যে সাহিত্য আমরা পাই তার বিষয়বস্তু কেমন ছিল সমসাময়িক রচিত সাহিত্যগুলির তুলনায় এছাড়া আলাদা করে ‘ইসলামি সাহিত্য’এ কি ধরনের স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রেখেছেন মুসলমান সাহিত্যিকরা রচনার ক্ষেত্রে সেই দিকগুলিকে নির্বাচন করে দেখতে হবে।
- বিষয়বস্তুর পাশাপাশি মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনাকর্মে কি ধরনের সংস্কৃতির সম্মুখীন আমরা হয়েছি সেই দিকটিকে খোঁজার চেষ্টা এছাড়া মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনার মধ্য দিয়ে বিশেষত পীর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির সম্মীলনের যে পরিসর তৈরি হয়, সেই ক্ষেত্রকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট ধরে গোটা বিষয়টি বুঝে নেওয়া।
- ভাষা সংস্কৃতির আওতাভুক্ত, ভাষার ভিতর দিয়ে যেমন একটি জাতির পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় অন্যদিকে তাঁর সমসাময়িক প্রেক্ষাপটকে নির্মাণ করে। মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনায় ভাষাগত সমস্যা আলাদা করে কেন দেখা দিয়েছিল সেই কারণগুলি দেখার এছাড়া তাঁদের রচিত সাহিত্যে কেন ‘দোভাষী ভাষা’র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা দেখতে হবে।

### গবেষণায় অবলম্বিত পদ্ধতি ও তত্ত্বভিত্তি

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজে বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিকে (Text Analysis Method) অনুসরণ করা হয়েছে। ‘মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য: ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন’ শীর্ষক গবেষণাপত্র প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্যায়ে মূলত সংগৃহীত

বইগুলি গবেষণার প্রাথমিক বা মূল উপাত্ত (Primary Source) হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যা আকর গ্রন্থ হিসাবে এখানে আমরা ব্যবহার করেছি। এছাড়া গৌণ বা সহায়ক উপাত্ত (Secondary Source) হিসাবে ইসলামি সাহিত্যের উপর আলোচিত যথাসম্ভব সমালোচনামূলক গ্রন্থ, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকদের প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেশকিছু ইসলামি পুথি যা সম্পাদকের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের নজরগত হয়েছে সেগুলোকেও গবেষণায় গৌণ উপাদানের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভে সংগৃহীত রোমান্টিক প্রণয়কাব্য, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত গ্রন্থ, জঙ্গনামা বিষয়ক কাব্য, নীতিশাস্ত্রমূলক রচনা, পীরকেন্দ্রিক রচনা এবং কেছা বিষয়ক গ্রন্থগুলিকে প্রাথমিক উপাদান হিসাবে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও শ্রীপঞ্চগনন মণ্ডল সংকলিত বেশ কিছু পুথি গবেষণা অভিসন্দর্ভের আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতিরেকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

## অধ্যায় বিভাজন

প্রথম অধ্যায়: মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা

দ্বিতীয় অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: বিভিন্ন সংরূপ ও শ্রেণিবিচারের পর্যালোচনা

তৃতীয় অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: নিবিড়পাঠ ও বিশ্লেষণ (নির্বাচিত সাহিত্য)

ক. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

খ. ধর্মীয় ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক রচনা

গ. জঙ্গনামা

ঘ. নীতিশাস্ত্রমূলক রচনা

ঙ. পীরকেন্দ্রিক সাহিত্য

চ. কিসসা/কেছা সাহিত্য

চতুর্থ অধ্যায়: দৈনন্দিন জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির নানাদিক (নির্বাচিত সাহিত্য)

পঞ্চম অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: সুফি সাধনার প্রভাব

ষষ্ঠ অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য

## অধ্যায় ভিত্তিক বিষয় সংক্ষেপ

সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটির ছয়টি অধ্যায়ের প্রত্যেকটিতে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে তুলে ধরা হল। আমরা আসলে এই অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে তা জেনে নেব।

### প্রথম অধ্যায়: মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা

এই অধ্যায়ে গোটা মধ্যযুগের যে সময়পর্ব সেই সময়ের ঠিক কোন শতাব্দী থেকে মুসলমান সাহিত্যিকদের লেখা আমরা পাচ্ছি সেই বিষয়ে বিস্তৃত জানতে পারছি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই মূলত এই সাহিত্যিকদের লেখা আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পাচ্ছি। সাবিরিদ খান তাঁর লেখার মধ্য দিয়েই ইসলামি সাহিত্যের বিকাশ ঘটিয়েছেন একথা বলা বাহুল্য। সময়ের হাত ধরে ইসলামি সাহিত্যের গতি বেড়েছে এসেছে নতুন নতুন কাব্য যা পাঠকদের নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছে কাব্যপাঠে। মধ্যযুগে মুসলমান সাহিত্যিকরা যে সাহিত্য রচনা করেছেন সেই সাহিত্যকে আলাদাভাবে নামকরণ করা হল কিন্তু কেন? তাঁদের রচিত সাহিত্যকে 'ইসলামি সাহিত্য' এই নামে চিহ্নিত করা হল এবং পূর্ববর্তী গবেষক থেকে শুরু করে সাহিত্যিকগোষ্ঠী প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ নাম দিয়ে এই সাহিত্যকে নামাঙ্কিত করেছেন সেই বিষয়ের আলোচনা এখানে করা হয়েছে। এছাড়া এই যে 'ইসলামি সাহিত্য' এর কথা বলা হয়েছে সেই সাহিত্যের বেশকিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা জানতে পারি এখানে। যে বৈশিষ্ট্যগুলি এই সাহিত্যকে সমসাময়িক ঘরানার সাহিত্য থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করেছে। এই অধ্যায়েই আমরা বিভিন্ন শতাব্দীর সাহিত্যিকদের সম্পর্কে এবং তাঁদের রচিত কাব্য সম্পর্কে জানতে পারছি। যে সাহিত্য/কাব্য সম্পর্কে আমরা জানছি সেই সাহিত্যের রচনাকাল বিভিন্ন বিজ্ঞানের মত অনুযায়ী ফারাক হয়েছে এই সবই আলাদা আলাদা করে তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া যে সমস্ত মুসলমান সাহিত্যিক লিখছেন তাঁদের সাহিত্য রচনার আলাদাভাবে কোনও প্রেক্ষাপট ছিল কিনা তাও জেনে নেওয়া হয়েছে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: বিভিন্ন সংরূপ ও শ্রেণিবিচারের পর্যালোচনা

সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সম্পর্কে সমসাময়িক লেখকরা কে কি মনোভাব পোষণ করেছেন তা দেখার। এই অধ্যায়ে মোটামুটিভাবে মুসলমান লেখক রচিত সাহিত্যকে কতগুলি ধারায় পাচ্ছি তা দেখার। গবেষণার কাজের অগ্রগতির স্বার্থে বেশ কয়েকটি ভাগে এই সাহিত্যকে ভাগ করেছি তা আমাদের লক্ষ্য করার মতো। এই বিভিন্ন ধারার সাহিত্যের মধ্যে কোন কোন লেখকদের আমরা পাচ্ছি তা দেখব, এছাড়া কেমন ধরনের কাব্য রচনা করেছেন তার প্রতিও নজর দেওয়া হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বিভিন্ন ধারার সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা আমরা এই অধ্যায়ে পেয়ে থাকব। প্রতিটি সংরূপকে আলাদা আলাদা করে চিনে নিতে পারব এবং তাঁদের রচিত সাহিত্যের কথা আমরা এখানেই জানতে পারছি। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধারা যেমন- জঙ্গনামা, নীতিশাস্ত্রমূলক, ধর্মীয় ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠান, পীরকেন্দ্রিক, কেচ্ছা কাহিনি ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান এই অধ্যায়ে আমরা আরোহণ করি।

## তৃতীয় অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: নিবিড়পাঠ ও বিশ্লেষণ (নির্বাচিত সাহিত্য)

গবেষণার কাজের অগ্রগতির জন্য যে সমস্ত সাহিত্যকে নির্বাচন করা হয়েছে, সেই সাহিত্যগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে উঠে এসেছে। মুসলমান লেখকদ্বারা রচিত সাহিত্যগুলির সব মূল পুথির পাঠ সম্ভব হয়নি, এখানে সাহিত্যিকের নিজের রচিত মূল গ্রন্থ যেমন ব্যবহৃত হয়েছে আলোচনা প্রসঙ্গে তেমনই মুসলমান লেখক রচিত কিন্তু সম্পাদিত গ্রন্থও ব্যবহৃত হয়েছে কাজের সুবিধার্থে। কাব্যগুলির নিবিড়পাঠের মধ্য দিয়ে বহু তথ্য উঠে এসেছে এছাড়া গল্পের যে প্লট নির্মাণ হয়েছে তাতে অন্য লেখকের প্রভাব থাকলেও মুসলমান সাহিত্যিকরা আপন স্বকীয়তায় মুসলমানের পরিচয় দিয়েছেন। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত এই সাহিত্যগুলির মধ্য দিয়ে কবির আত্মপরিচয়, ভণিতা, কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে পারি। কাব্য চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক জীবনের প্রতিচ্ছবি উঠে আসে।

### চতুর্থ অধ্যায়: দৈনন্দিন জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির নানাদিক (নির্বাচিত সাহিত্য)

এই অধ্যায়ে নির্বাচিত সাহিত্যগুলির মধ্যে সংস্কৃতির যে বিভিন্ন দিকের কথা তুলে ধরা হয়েছে তার প্রতি অবলোকন করাই উদ্দেশ্য। এই সংস্কৃতির ভিতর থেকে সর্বধর্মের সংস্কৃতিকে খুঁজে তুলে ধরাই কাজ এবং কোনটি কোন সংস্কৃতির কথা বলে তার উল্লেখ করা। মূলত মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যে আমরা 'ইসলামি সংস্কৃতি'কেই খুঁজে পেতে থাকি কিন্তু পাশাপাশি আমাদের এই সংস্কৃতির বাইরে গিয়ে সাধারণ জনজীবনের যে সংস্কৃতি যেমন- ঘর, বাড়ি, খাদ্য, বসন, প্রসাধন, বিনোদন এগুলোর পরিচয় পেতে চেয়েছি। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির নানা রকম প্রসঙ্গকে এই গবেষণায় তুলে আনা হয়েছে।

### পঞ্চম অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: সুফি সাধনার প্রভাব

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় সুফিদের কথা বাদ থাকে না। খুব স্বাভাবিক প্রয়াসেই চলে আসে এই সুফিরা। সুফিদের নিয়ে অনেক কথা প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে সুফিদের আগমন কবে? কীভাবে সুফিরা বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে একাত্মতা তৈরি করে নেয়? মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় সুফি মতবাদ কতটা এসেছে? এবং হিন্দু বৌদ্ধ তন্ত্রের মতবাদের সঙ্গে সুফিবাদ কোথায় মিলে যাচ্ছে তার আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে।

### ষষ্ঠ অধ্যায়: মুসলিম বাংলা সাহিত্য: ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য

এই অধ্যায়ে ভাষাগত বিশ্লেষণের দিকটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যে 'দোভাষী ভাষা' কতটা প্রয়োগ করা হয়েছে তার তালিকা করে শব্দ ব্যবহারের প্রায়োগিক দিকগুলিকে চিহ্নিত করা। এছাড়া সমাজভেদে ভাষার কতটা পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে তার আলোচনা করা হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত কাব্যে বানান রীতি ও তার প্রয়োগের দিকটিও এখানে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বানান ব্যবহারে যে বৈষম্য লক্ষিত হয়েছে তার যথাযথ কারণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

‘উপসংহার’ অংশে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হব। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যে আমরা যে সংস্কৃতির পরিচয় পাই সেই সূত্র ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারাকে সম্পৃক্ত করে ‘সংস্কৃতি’ বিষয়ক ধারণাকে সাজানোর একটি পরিসর তৈরি হবে এই অংশে। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে কিভাবে এই মুসলমানি ধারা মিশে যাচ্ছে তার কথা তুলে ধরা হবে এখানে। পাশাপাশি আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি ইত্যাদি ভাষার যে ব্যবহার কাব্যগুলিতে পরিলক্ষিত হয় সেই ভাষাগুলির ব্যবহারের ভিতর দিয়ে সমাজ-ভাষার যে নির্মাণ তার কথাকে এই অংশে বর্ণনা করা হবে।

আমরা সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে এইভাবে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আমাদের আলোচনার জায়গা তৈরি করে নিয়েছি এবং অধ্যায় ধরে ক্রমশ আলোচনার দিকে অগ্রসর হয়েছি। প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনার শেষে আমরা গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল বক্তব্যের জায়গাগুলিকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেছি।

## তথ্যসূত্র ও টীকা

১. ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ‘মুসলিম সাহিত্য-সমাজ’ এর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন- “আমরা অনেকবার বলেছি মুসলিম সাহিত্য। কেউ কেউ বলতে পারেন ‘কি গোঁড়ামি’। সাহিত্যেও আবার জাতবিচার।’ তাই একটু খোলাসা করে বলা দরকার মুসলিম সাহিত্য বলতে কি বুঝি। আমাদের ঘর ও পর, আমাদের সুখ ও দুঃখ, আমাদের আশা ও ভরসা, আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দু সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদীস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে।”

সূত্র: রহমান. হাবিব, ‘বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’, কলকাতা, মিত্রম্, ২০০৯। পৃ.১৬১



২. অনেকেই মুসলমান রচিত সাহিত্যের স্বরূপ চিহ্নিত করার জন্য আলাদাভাবে ভবনার জায়গা তৈরি করেন। শহীদুল্লাহ এর কথার প্রসঙ্গে আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীনের অভিমত জানা যায়- “ভাষা অনুসারে সাহিত্যের নামকরণ হয় বলিয়া আমরা জানি যেমন ইংরেজি সাহিত্য, পারসী সাহিত্য, আরবী সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য ইত্যাদি। ধর্মানুসারের সাহিত্যের নামকরণের কথা আমরা এ যাবত শুনি নাই। সুতরাং, ‘মুসলমান সাহিত্য’ কথাটা বুঝিতে পারা গেল না। তবে কথাটার অর্থ যদি হয় মুসলমানী রূপযুক্ত বাঙ্গলা সাহিত্য, তাহা হইলে আমরা তাহা বুঝিতে পারি। বাঙ্গলা সাহিত্যের যে একটা মুসলমানী রূপ আছে, তাহা আমরা জানি এবং মানি।.....কিন্তু ইহাদের কথার ভাবে বোধ হয়, ইহারা শুধু মুসলমানী রূপের কথাই বলেন না, সাহিত্যের অন্তরটাকেও ইহারা মুসলমানী করিয়া লইবেন। কিন্তু তাহা হয় না। কারণ তাহা করিতে গেলে সাহিত্য ‘মুসলমানীতে’ পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ‘সাহিত্য’ টিকিয়া থাকিবে না।”

সূত্র: তদেব। পৃ.১৬১

৩. করিম. আবদুল, ‘বঙ্গীয় মুসলমানের বঙ্গ সাহিত্য-চর্চা’, ‘কোহিনুর নবপর্যায়’, মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (সম্পা.), দ্বিতীয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ফরিদপুর, পাংশা, অগ্রহায়ণ ১৩২২। পৃ.২৮৩

৪. সাহিত্য বিশারদ আবদুল করিম এর বক্তব্যে আরও জানতে পারি- ‘মুসলমান তাঁহার ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহার লইয়া যে সাহিত্যের সৃষ্টি করে অর্থাৎ বাঙ্গলা সাহিত্যের যে অংশে মুসলমানের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারের সুন্দর দিক ফুটিয়ে উঠে, তাহাই ‘মুসলিম সাহিত্য’।

সূত্র: রহমান. হাবিব, ‘বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’, কলকাতা, মিত্রম্, ২০০৯। পৃ.৫৬

৫. কবির. হুমায়ুন, ‘বাঙলাভাষা ও মুসলমান সাহিত্য’, ‘মাসিক মোহাম্মদী’, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ৭ম বর্ষ, কলকাতা, কার্তিক-আশ্বিন ১৩৪০-১৩৪১। পৃ.৫৭৮

৬. হোসেন. ইমরান, ‘বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী: চিন্তা ও কর্ম’, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩। পৃ.৬৬

৭. সেন. সুকুমার, 'বাংলার সংস্কৃতিতে মুসলমান প্রভাব ও মুসলমানী কেচ্ছা', 'দেশ (সাহিত্য সংখ্যা)', শ্রী অশোককুমার সরকার (সম্পা.), ৩২ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, কলিকাতা, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭২। পৃ.৫৩-৫৪

৮. Panikkar. K.N, 'Culture, Ideology, Hegemony Intellectuals and Social Consciousness in Colonial India', New Delhi, Tulika, 2001. P.37

৯. “উনিশ শতক ছিল বাঙালি মুসলমান মননের দ্বন্দ্বের কাল। সমন্বয়বাদী ভাবধারা অর্থাৎ বাংলায় হিন্দু মুসলমানের সংঘবদ্ধ পরস্পরের প্রভাবিত জীবন ও অন্যদিকে ইসলামি শুদ্ধিকরণের গোঁড়ামি উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান মননকে যেমন উদারনৈতিক করেছিল তেমন ইসলামে ফিরে যাওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল। এই উভয়ের প্রতিফলন বাংলার মুসলমানি সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়েছিল।”

সূত্র: ভট্টাচার্য. অতীন, 'উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান মনন: স্ব-অন্বেষণ', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০২২। পৃ.৩১৮

১০. রহমান. হাবিব, 'বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন', কলকাতা, মিত্রম্, ২০০৯। পৃ.৩১-৩২

১১. মৌলভী. মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা, 'মুসলমানের সর্বনাশ', 'নবনূর', মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.), ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩১২। পৃ.৩৭৬

১২. K.N Panikkar এই বিষয়ে বলেন- “The alternate political trend that manifested itself in the eighteenth Century was the emergence of autonomous states and their subsequent consolidation as independent states. In other words, the political process that followed the break-up of the Mughal empire was fragmentation of political power, not political disintegration. Disintegration of a centralized empire is not necessarily a misfortune, nor is it politically retrogressive. At any rate, the new political structure emerging in the eighteenth century was not devoid of vigour and vitality; the autonomous and independent states did not necessarily present a picture of anarchy and decadence.”

সূত্র: Panikkar. K.N, 'Culture, Ideology, Hegemony Intellectuals and Social Consciousness in Colonial India', New Delhi, Tulika, 2001. P.36

১৩. 'দীন' আরবি শব্দ। এর অর্থ ধর্ম।

সূত্র: রশিদ. মোহাম্মদ হারুন, 'বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান', ঢাকা, বাংলা একাডেমি, জুন ২০১৬। পৃ.১১৫

১৪. 'দুনিয়া' আরবি শব্দ। এর অর্থ জগৎ, বিশ্ব। বাংলায় আমরা 'দুনিয়া' বলে থাকি।

সূত্র: তদেব। পৃ.১১৫

১৫. মোস্তফা. গোলাম, 'মুসলিম সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য', 'মাসিক মোহাম্মদী', মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, মাঘ ১৩৩৪। পৃ.২১২

১৬. গুপ্ত. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ, 'হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি', 'নবনূর', মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.) ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩১১। পৃ.১৭৬

১৭. এস.এম. আকবরউদ্দীন, 'বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের দান', 'আল্-এসলাম', মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ২য় ভাগ, ৮ম সংখ্যা, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩২৩। পৃ.৪৫৫

১৮. চৌধুরী. আবদুল মালিক, 'বঙ্গসাহিত্যে শ্রীহট্টের মুসলমান', 'আল্-এসলাম', মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩২৩। পৃ.৩৩৫

১৯. ওদুদ. কাজী আবদুল, 'শাস্ত্রতত্ত্ব', কলিকাতা, সিগনেট বুকশপ, ১৩৫৮। পৃ.৯৮

২০. Bandyopadhyay. Pranab, 'Indian Culture And Heritage', Calcutta, Book Club, 1991. P.77

২১. মোহাম্মদ. মনসুরউদ্দীন, 'বাঙ্গালা-সাহিত্যে মুসলমানের দান', 'মাসিক মোহাম্মদী', মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৩৫। পৃ.৭৩৫

২২. সেখ. ওসমান আলী, 'হিন্দু-মুসলমানে বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়', 'কোহিনুর', মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (সম্পা.), ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ফরিদপুর, পাংশা, অগ্রহায়ণ ১৩১৩। পৃ.১৯১-১৯২

২৩. বটতলার এই বিশিষ্ট ধারাকে সমালোচকেরা নানা নামে অভিহিত করেন। জেমস লঙ 'Mussalman Bengali Literature', নামে বর্ণনা করেন। আবদুল গফুর সিদ্দিকি

‘বটতলার পুঁথি’, মুহম্মদ আবদুল হাই ‘দোভাষী পুঁথি’, সৈয়দ আলী আহসান ‘দোভাষী পুঁথি’ এবং আনিসুজ্জামান ‘মিশ্রভাষারীতির কাব্য’ বলেন।

সূত্র: বন্দ্যোপাধ্যায়. সুমন্ত, ‘বটতলার দোভাষী সাহিত্য-সেকাল ও একাল’, ‘বাঙালির বটতলা (প্রথম খণ্ড)’, অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য (সম্পা.), কলকাতা, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩। পৃ.১৬৮

২৪. করিম. আবদুল, ‘রোসাজ্জ রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য’, ‘মাসিক মোহাম্মদী’, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), সপ্তম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, কলিকাতা, ভাদ্র ১৩৪১। পৃ.৭৩৭

২৫. চৌধুরী. আবদুল মালিক, ‘বঙ্গসাহিত্যে শ্রীহট্টের মুসলমান’, ‘আল্-এসলাম’, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩২৩। পৃ.৩৩০

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়. সুমন্ত, ‘বটতলার দোভাষী সাহিত্য-সেকাল ও একাল’, ‘বাঙালির বটতলা (প্রথম খণ্ড)’, অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য (সম্পা.), কলকাতা, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩। পৃ.১৯১

২৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন- “Both Hindus and Muslims respected the saints and fakirs of either communities and from this many have assumed a synthesis of the two religious. This mutual respect, however, stemmed from a belief in the supernatural powers of the saints and fakirs.”

সূত্র: Majumdar. R.C, ‘History of Mediaeval Bengal’, Calcutta, G. Bharadaj & Co, 1973. P.256

২৮. Banerjee. Sumanta, ‘The Parlour and the Streets Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta’, Calcutta, Seagull Books, 1998. P.90

২৯. সেন. সুকুমার, ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য’, কলকাতা, আনন্দ, এপ্রিল ২০১৩। পৃ.১০০

৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়. সুমন্ত, ‘বটতলার দোভাষী সাহিত্য-সেকাল ও একাল’, ‘বাঙালির বটতলা (প্রথম খণ্ড)’, অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য (সম্পা.), কলকাতা, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩। পৃ.১৬৭

৩১. সুকুমার সেন এই বিষয়ে বলেন- “উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ববঙ্গের মুসলমান গ্রাম্য কবিরা স্থানীয় কিংবদন্তীর উপর রঙ ফলিয়ে ছোটখাট ‘কেচ্ছা’ গাথা চালিয়েছিলেন।”

সূত্র: সেন. সুকুমার, ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য’, কলকাতা, আনন্দ, এপ্রিল ২০১৩।  
পৃ.১২৭

৩২. Bandyopadhyay. Pranab, ‘Indian Culture and Heritage’, Calcutta, Book Club, 1991. P.6

৩৩. চট্টোপাধ্যায়. সুনীতিকুমার, ‘সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস’, কলকাতা ২৯, জিজ্ঞাসা, জানুয়ারী ২০০৩। পৃ.১১-১২

৩৪. “Indian culture is synthetic in character. It comprehends ideas of different orders. It embraces in its orbit beliefs, customs, rites, institutions, artas, religions and philosophies belonging to strata of society in varying stages of development. It eternally seeks to find a unity for the heterogeneous elements which make up its totality. At worst its attempts end in a mechanical juxtaposition, at best they succeed in evolving an organic system.”

সূত্র: Chand. Tara, ‘Influence of Islam on Indian Culture’, Allahabad, The Indian Press Ltd, 1922. P. Introduction (i)

৩৫. হালদার. গোপাল, ‘সংস্কৃতির বিশ্বরূপ’, কলিকাতা, মনীষা, মে ১৯৬০। পৃ.১১০

৩৬. শরীফ. আহমদ, ‘বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব’, ঢাকা, অনন্যা, আগস্ট ২০১২। পৃ.৭২

৩৭. Banerjee. Sumanta, ‘The Parlour and the Streets Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta’, Calcutta, Seagull Books, 1998. P.78

৩৮. শরীফ. আহমদ, ‘বাঙলা বাঙালী বাঙালীত্ব’, ঢাকা, অনন্যা, আগস্ট ২০১২। পৃ.৭৫-৭৭

৩৯. হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক রুচি সম্পর্কিত বিষয়ে সুমন্ত ব্যানার্জীর কথায় উঠে আসে- “As evident from earlier Bengali literature, in the rural Society Bengali Hindus and Muslims not only shared the same language, but also similar cultural tastes..... Since Persian and Arabic were used in official transactions (during the Mughal regime), many

terms and words from those languages found their way into the Bengali vocabulary. Just as the Aryan Hindu myths underwent a form of localization in the Bengali religious rituals and literature, So also was Islam adapted to a large extent to local traditions by its Bengali Converts. A sort of interfusion of Hinduism and Islam took place in the shape of adoption of Arabic and Persian words in colloquial Bengali as well as in the exchange of Hindu and Muslim themes and motifs in literary compositions. Certain common godliness and peers (Muslim Saints) developed, who were worshipped by both Hindus and Muslims”.

সূত্র: Banerjee. Sumanta, ‘The Parlour and the Streets Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta’, Calcutta, Seagull Books, 1998. P.116-117

৪০. আহমদ. ওয়াকিল, ‘উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা (প্রথম খণ্ড)’, নিউ দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৩। পৃ.১৪

৪১. Sarkar. Jagadish Narayan, ‘Islam in Bengal’, Calcutta, Ratna Prakashan, 1972. P.20

৪২. “It is easily discernible from this that instances of blind bigotry did not happen frequently and that a favourable atmosphere of friendship in society and culture was developing.”

সূত্র: Sarkar. Jagadish Narayan, ‘Hindu-Muslim Relations in Bengal’ (Medieval Period), Delhi, Idarah-i Adabiyat-i-Delhi, 1985. P.31

৪৩. Mitra. Sisirkumar , ‘A Marvel of Cultural Fellowship’, Calcutta, Lalvani Publishing House, 1967. P.83

৪৪. পৃথিবীর ইতিহাসে সেমেটিক জনগোষ্ঠীর অবদান চিরস্মরণীয়। ‘সেমেটিক’ শব্দটি বাইবেলের ‘সাম’ শব্দ থেকে উদ্ভূত। মহানবি হজরত মোহাম্মদ সেমেটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আরব দেশ ছিল সেমেটিক জাতির আদি বাসভূমি এবং একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচারে সেমেটিক জাতিরা নেতৃত্ব প্রদান করে।

সূত্র: করিম. আবদুল, ‘ইসলামের ইতিহাস পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন [প্রাচীন সভ্যতা থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত]’, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২০। পৃ.১০

৪৫. “মুসলিম কালচার অর্থে আমরা আরবীয় বা Semitic Culture-ই বুঝিয়া থাকি। এই ‘কালচারের’ ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে সর্বত্রই আরব দেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে। আরবগণের কাছে পূর্বেও (প্রাক ইসলামিক যুগে) কাব্য, বাগ্মিতা, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয় ছিল সাধনার বস্তু। তবে দর্শন-বিজ্ঞান বা সাহিত্য বলে তেমন কিছুই ছিল না, পরে ইসলামের মধ্যবিত্ততায় আরবগণ এক নতুন জীবন লাভ করে।.....জ্ঞান-বিজয়ে বর্হিগত হইয়াই গ্রীকজাতির এই প্রাচীন জ্ঞানসাধনা বা Hellenic Culture এর সহিত আরবদিগের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিল।.....মুসলমানদিগের হস্তে যে বিচিত্র জ্ঞান-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা Hellenic Culture এবং Semitic Culture এরই পরস্পর সংমিশ্রণ।.....পরবর্তীতে মুসলমানগণ আর Hellenic Culture নয়, World Culture এর দিকে নিজেদের ফোকাস করে। নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার পথে চেয়ে রয়।”

সূত্র: মোস্তফা. গোলাম, ‘মুসলিম সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য’, ‘মাসিক মোহাম্মদী’, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পাদ.), প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৪। পৃ.২০৭-২১৩

৪৬. “Muslim culture was thus humanistic and religious. It relied on Arabic and Persian cultures because they were its sources. At the same time it tried to steal the thunder from Hindu culture by adopting certain Hindu forms and rituals especially in its ceremonies. Along with this we see the rise of a Muslim sect of Sufis who used to accept Hindu yogi practices and try to bring about a compromise. This attitude of compromise is clearly evident in Bauls, Murshids and Yoga-ka-lander series of poems. In brief we may conclude that significant aspects of Muslim culture could be seen in it’s religiously, its love for mysticism, its attitude of compromise with certain aspects of Hinduism, its Persian bias and its humanism.”

সূত্র: Ali Ashraf. Syed, ‘Muslim Traditions in Bengali Literature’, Karachi University, Bengali Literature Society, 1960. P.6

৪৭. Rahman. A, ‘History of Indian Science, Technology and culture AD 1000-1800’, P. 425

৪৮. পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন- ‘The Muslim Culture is neither Arabian nor Persian as Pandit Jawaharlal fancies it is. It is neither racial nor national. It is, if I may so call it, Quranic’.

সূত্র: Latif. Dr. Syed Abdul, ‘Islamic Cultural Studies’, Lahore (Pakistan), Sh. Muhammad Ashraf, 1953. P.29-30

৪৯. ভট্টাচার্য. অতীন, ‘উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান মনন: স্ব-অন্বেষণ’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০২২। পৃ.৩৫২-৩৫৫

৫০. আনিসুজ্জামান. ‘মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র [১৮৩১-১৯৩০]’, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ১৯৬৯। পৃ.১১৫



## প্রথম অধ্যায়

### মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা

যেকোনও ধরনের সাহিত্যের মধ্য দিয়েই একটি জাতির সামাজিক ইতিহাস গড়ে ওঠে সাহিত্যিকের আপন আপন মুগ্ধিয়ানায়। আসলে সাহিত্য মানেই তো সমাজের দলিল চিহ্নস্বরূপ। সেই দলিলের ভিতর থেকেই প্রত্যেক জাতির আলাদা আলাদাভাবে পরিচয় ফুটে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত পরিমণ্ডলে যে সমস্ত সাহিত্যিক নিয়োজিত থেকেছেন প্রত্যেকের লেখনীর ছোঁয়ায় আছে কবিমনের একধরনের রচনার বিশিষ্টতা যা পাঠককে অনেক ধারণার সম্মুখীন করে। সময়ের হাত ধরে সাবলীলভাবে অনবরত যে সাহিত্য পাঠকবর্গ আশ্বাদন করে তাতে ঘুরে-ফিরে বিভিন্ন ধরনের ফর্ম (form) এর বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। শুধু ফর্ম নয়, বলতে গেলে একটা সময় এসে ভাবনাগত-আঙ্গিকগত-রচনারীতিগত পার্থক্য ঘটে যায়। বাংলা সাহিত্যের যে ঘরানা তাতে আমরা সকলেই জানি যে সময় বা যুগের (Time) পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তৈরি হয়েছে, সেই ইতিহাসকে অবলম্বন করে সাহিত্যিকরা তাঁদের কাব্য-সাহিত্য রচনা করেছেন।

প্রাচীনযুগের একটা ধারাকে পেরিয়ে এসে মধ্যযুগের দোরগোড়ায় বাংলা সাহিত্য যখন পৌঁছে গেছে তখনই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রটা বিরাট আকার ধারণ করে নিয়েছে। এই মধ্যযুগের সময়পর্বে আমরা হিন্দু সাহিত্যিকদের পাশাপাশি মুসলমান সাহিত্যিকদের কথা জানতে পারছি এবং তাঁদের রচিত সাহিত্যও পাচ্ছি। আর এখান থেকেই বাংলা সাহিত্য যুগের ধারাকে অতিক্রম করে বা ছাপিয়ে গিয়ে নতুনত্বকে বহন করে আনছে মুসলমান সাহিত্যিকদের হাত ধরে। আবদুল করিম ‘কোহিনুর’ (নবপর্যায়, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৩২২) পত্রিকায় ‘বঙ্গীয় মুসলমানের বঙ্গ সাহিত্য-চর্চা’ প্রবন্ধে বলেছেন-

“বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি সর্ব প্রধান জাতি। এই দুই জাতির একত্র সমবায়ে বিশাল বাঙ্গালী জাতি গঠিত। উভয় জাতির

মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্য অভিন্ন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর সহোদরের  
ন্যায় একই দেশে বাস করেন এবং একই রূপ চিন্তা হৃদয়ে পোষণ  
করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উভয়ের সুখ, দুঃখ, উন্নতি-অবনতি একই  
সূত্রে গ্রথিত।”<sup>১</sup>

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমরা ‘মুসলমান সাহিত্যিক’<sup>২</sup> এই কথাটির উপর  
বিশেষভাবে লক্ষ রাখব, আসলে ধর্ম দিয়ে আলাদাভাবে কোনও সত্তারই আইডেনটিটি  
(Identity) গড়ে ওঠে না কিন্তু বাংলা সাহিত্যের যে বিশেষ সন্ধিক্ষণ এই মুসলমান  
সাহিত্যিকদের হাতে গড়ে উঠেছে তা কোনোভাবেই অবজ্ঞার বিষয় নয়। সেই প্রায়  
হারিয়ে যাওয়া, বহুলচর্চিত থেকে বঞ্চিত হওয়া সাহিত্যের গল্পকথা কেমন হতে পারে,  
তার বিষয়বস্তু কি, কেমন এই সাহিত্য তার রসাস্বাদনের আহ্লাদটুকু অর্জন করার ইচ্ছা  
থেকেই এই আলোচনা, ভাবনা সবকিছু। শিরোনামের দিকে তাকালেই সেই বিষয় স্পষ্ট  
হয়। প্রথমে জেনে নেব এই সাহিত্য গড়ে ওঠার ইতিহাস এবং সময়ের হাত ধরে এই  
সাহিত্যের বিস্তৃতি কতদূর তার কথা জানব এছাড়া কাব্য বা সাহিত্যপাঠ করে পুরো  
বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাবে। ‘মাসিক মোহাম্মদী’ (প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা,  
মাঘ ১৩৩৪) পত্রিকায় গোলাম মোস্তফার ‘মুসলিম সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য’ প্রবন্ধে জানা  
যায় বঙ্গদেশে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনের তাগিদ দেখা যায়  
এবং তাঁরা পুঁথি সাহিত্যের পথ ধরে নিজেদের সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হন।<sup>৩</sup> মুসলমান  
সাহিত্যিকরা আরবি-ফারসি সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্য রচনা করেন এবং  
রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনার মধ্য দিয়ে নিজেদের নজির তৈরি করেন বাংলা  
সাহিত্যে।<sup>৪</sup>

তবুও মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যের জনপ্রিয়তার পরিসর কম হওয়ার  
পিছনে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস আছে তা জানা দরকার।  
প্রথমেই সামাজিক দিক থেকে মুসলমানদের অবস্থান সেই সময়ে এতটাই অবক্ষয়ের  
জায়গায় এসে পৌঁছেছিল তার ফলে মুসলিম জনমানসে ভাবনা-চিন্তার যে বহিঃপ্রকাশ  
ঘটে তাতে অত উন্নত পরিসরে এসে লেখালেখি সম্ভব হয়ে ওঠেনি, ফলে তাঁদের

রচনাকর্মে যে অনুষ্ণ এসেছে তা সেই সময়ের ভাবনা-চিত্তার ফলাফল। বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় তাঁরা রক্ষণশীলতার জগত থেকে নিজেদের প্রগতিশীল করে তুলতে অনেকটা দিন অতিক্রান্ত করেছেন।<sup>৬</sup> এছাড়া বাংলার মুসলমানদের সাহিত্যিক জীবনে বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের কথা জানা যায়। বাংলাদেশে সাধারণ মুসলমান ও ভদ্র শ্রেণির মুসলমানের (আশরাফ ও আতরাফ) অনেকখানি ব্যবধান ছিল। ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাবও বাংলার মুসলিমদের গ্রাস করে এমন মতও শোনা যায়, তাঁদের প্রচারিত ইসলামি শরিয়তের নতুন শিক্ষা বাংলার মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনায় হানিকর প্রভাব ফেলে।<sup>৭</sup> এছাড়া অর্থনৈতিকগত দিক থেকে মুসলমানরা সমাজে পিছিয়ে পড়ে ফলে নিজেদের রচনাকর্মকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন।

মুসলমান সাহিত্যিকরা সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কেমন ভূমিকায় বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন, কেমন ছিল তাঁদের সাহিত্যিকর্ম, মূলত যাঁরা লিখছেন তাঁরা কোথাকার সাহিত্যিক ছিলেন, এই সমস্ত কিছুর আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে এই অধ্যায়ে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনেক ধারা বজায় ছিল, সেই ধারায় মুসলমান সাহিত্যিকরা ঠিক কীভাবে এগিয়ে এসেছেন সাহিত্য রচনায় এখানে সেই বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এ বিষয়ে সৈয়দ আলি (Syed Ali) জানিয়েছেন-

“Middle Bengali Literature has three major traditions: the Buddhist, the Hindu and the Muslim. The Buddhist tradition is mainly a relic of old Bengali and as such a spent force in this period. Muslim traditions were gradually gaining prominence and Hindu traditions were also being formulated.”<sup>৯</sup>

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ একটি বিরল অধ্যায়। প্রাচীনযুগের সমস্ত রেশ কাটিয়ে সাহিত্যিকরা নতুনভাবে কলম ধরেছেন মধ্যযুগে। মোটামুটিভাবে মধ্যযুগের সময়সীমা ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ধরে নেওয়া হয়। এই গোটা

মধ্যযুগের সময়পর্বে নানা ঘটনার সাক্ষী থেকেছে বাংলা সাহিত্যের পাঠককুল। মধ্যযুগে বাংলায় শুধুমাত্র হিন্দু কবিরাই সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেননি, মুসলমান সাহিত্যিকরাও রচনাকর্মে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আহমদ শরীফ এর কথায় জানা যায়-

“মুসলমান রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের উন্মেষ এবং পরিপুষ্টি ঘটেছে। হিন্দু কবি যে-ক্ষেত্রে ধর্মীয় আবেগ এবং নিবেদিতচিত্ততাকে কাব্যের উপজীব্য সম্পদ ভেবেছেন, সে-ক্ষেত্রে মুসলমান কবি প্রধানত জীবন এবং আনন্দকে অবলম্বন করেছেন।”<sup>৮</sup>

তাই সর্বোপরি একথা বলা যেতে পারে, বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে গেলে হিন্দু সাহিত্যিকদের পাশাপাশি মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনা বৃত্তান্তের পরিচয় নেওয়া খুবই জরুরি। মুসলিম শাসন আমলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই পর্বে বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণির সাহিত্যিকদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল এবং বাংলা সাহিত্যে নানা রকমের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়।<sup>৯</sup> তুর্কি আক্রমণের পর ইসলামের অনুপ্রবেশ বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে বদলে দেয় এবং বাংলায় নতুন ধারণার পত্তন ঘটে।<sup>১০</sup> বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির পথে হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকরা একের পর এক সাহিত্য রচনা করেছেন। একদিকে মঙ্গলকাব্যগুলিতে (মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, চন্দ্রীমঙ্গল ইত্যাদি) হিন্দু দেব-দেবীদের মাহাত্ম্যপ্রচার। অন্যদিকে অনুবাদ সাহিত্যের ধারা, এছাড়া বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যাপক জোয়ার। এই পদাবলী সাহিত্যও শুধু হিন্দুদের মধ্যেই বদ্ধ নয়, মুসলিম সাহিত্যিকরাও পদাবলী রচনা করেছেন। মুসলমান বৈষ্ণব পদকর্তা হিসাবে যাঁদের নাম পাওয়া যায় অনন্ত, সৈয়দ আইনুদ্দীন, আকবর শাহ, আফজল আলি, সৈয়দ মুর্তজা, নরহরি সরকার, খান গয়াছ, গোবিন্দ ঘোষ প্রমুখ। এ বিষয়ে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বলেছেন-

‘বাংলাদেশে যে জনপ্রিয় ভক্তিমর্ম বাংলার মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াও সেই ভক্তিমর্মই প্রকাশ লাভ করিয়াছে।’<sup>১১</sup>

আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়কালকে ‘দোভাষী পুথি’ রচনার কাল বলে চিহ্নিত করা হয়। এই পর্বে আমরা আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি মিশ্রিত সাহিত্যের ধারা পাচ্ছি। সুমন্ত ব্যানার্জী এই বিষয়ে বলেন ‘দোভাষী’ আক্ষরিক অর্থে দু’টি ভাষা থেকে উদ্ভূত ভাষাকে বলা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই রচনাগুলির মধ্যে বাংলা, আরবি, ফারসি এবং উর্দু মিশ্রিত শব্দ পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে যদিও আরবি-ফারসি শব্দের প্রচলন শুরু হয় চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী এই সময়ে। তবে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এই ‘দোভাষী’ ভাষা ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।<sup>১২</sup> ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদান কোথায়, কীভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যের ধারা বয়ে চলেছে তাও আমাদের দেখার বিষয়।

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সমগ্র সাহিত্যভাণ্ডারকে ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য’<sup>১৩</sup> এই বিশেষ নামে অভিহিত করেছেন অনেকেই। আসলে যে সাহিত্যের কথা আমরা এখানে জানব সেই সাহিত্যের শিরোনাম নিয়ে সমালোচক মহলে বেশ রোল পড়ার মতো, বহু বিতর্কিত একটা জায়গা তৈরি হয়েছে এই ধারার সাহিত্যকে নিয়ে। ডক্টর ওসমান গনী তিনি ‘ইসলামি সাহিত্য’ এই নামটির মধ্য দিয়ে গোটা ইসলামের যে ইতিহাস তাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য রচিত তার কথাই বলেছেন, যেখানে নির্দিষ্ট করে কোনও লেখক বা কবিকে বা সাহিত্যিককে চিহ্নিত করা হয়না। অন্যদিকে মুসলমান সাহিত্যিক রচিত যে কাব্যধারা তা মূলত মুসলিম সাহিত্য এই নামেই আখ্যায়িত হতে পারে।<sup>১৪</sup> মুসলমান লেখকরা কাব্য রচনায় বহু প্লটকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করেছেন। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে সেই মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যের কথাই আমরা জানব। তাঁদের লেখনীর যে ভাবাবেগ, জীবনাদর্শ, রোমান্টিক প্রেম বহুগুণে ভাবন্বিত এই সাহিত্যের যে গল্পকথা সেই বিষয় নিয়েই ইসলামি বাংলা সাহিত্য

মুসলমান কবিদের দ্বারা লেখা হলেও তা একেবারে হিন্দু-ঐতিহ্য বহির্ভূত নয়। হিন্দু সাহিত্যিকরা বিভিন্ন ধারায় যে কাব্যাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন মুসলমান সাহিত্যিকরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেই ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাব্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। আব্দুল মান্নান (Abdul Mannan) এই বিষয়ে বলেন-

“The form and language of the works of Muslim writer were not however appreciably different from those of their Hindu contemporaries. The Muslim poets unquestionably were influenced by the style and form of literature established in the Medieval period by the Hindu poets.”<sup>১৫</sup>

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যের সময়সীমা মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ধরা হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে হোসেন শাহ গৌড়ের অধীনে থাকাকালীন বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে চট্টগ্রাম একটা কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। এই চট্টগ্রাম অঞ্চলের বেশকিছু মুসলমান শিক্ষিত লোকজন আরাকানে বসতি গড়ে তোলে। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, এই রাজাদের অনুরোধে বেশ কয়েকজন মুসলমান সাহিত্যিক রচনাকর্মে এগিয়ে আসেন। পরবর্তীতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে মুসলমান সাহিত্যিকরা আরও জোরকদমে নিজেদের লেখালেখি চালিয়ে যেতে থাকেন ‘দোভাষী রীতি’র মধ্য দিয়ে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ‘দোভাষী রীতি’র উল্লেখ আসলেই উঠে আসে মুসলমান সাহিত্যিকদের কথা। এই অধ্যায়ে তাই সেই সমস্ত সাহিত্যিকদের কথা আমরা জানব। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্যকর্মকে বহু নাম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিদেশি শব্দ ব্যবহার করে কাব্য রচনা করার একটা ধারা মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে গড়ে ওঠে, আনিসুজ্জামান এই ধরনের রচনাকে ‘মিশ্র ভাষারীতির কাব্য’<sup>১৬</sup> নামে চিহ্নিত করেছেন। মুসলমান রচনাকারেরা এই ভাষারীতি’র মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নিজেদের জায়গা তৈরি করে নেয়। হিন্দু সাহিত্যিকরা এই দোভাষী ভাষার শব্দ ব্যবহার করেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক আগে থেকেই। মূলত মুসলিম সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনাকর্মে এই ভাষা ব্যবহারকে আরও বৃহত্তর জায়গায় নিয়ে আসেন, যা মূলত

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে অব্যাহত থাকে।<sup>১৭</sup> দোভাষী পুথির উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক হিসাবে গরীবুল্লাহ'র নাম পাওয়া যায়।

মুসলমান লেখক দ্বারা রচিত কাব্যগুলি যে নামেই অভিহিত হয়ে থাকুক না কেন এই ধারার কাব্যের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য পাঠক হিসাবে আমাদের যেমন নজর কাড়ে তেমনই সাহিত্য রচনায় নিয়োজিত আছেন যাঁরা প্রত্যেকেই এর প্রত্যক্ষদর্শী।

### মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

১. মুসলমান লেখক দ্বারা রচিত সাহিত্যকে আমরা বহু নামে নামাঙ্কিত হতে দেখেছি। এই সাহিত্যের প্রকাশস্থান কলকাতার বটতলাতেই শুধুমাত্র ছিল না পূর্ববঙ্গের নানাস্থান থেকে এই সাহিত্য মুদ্রিত হত। ঢাকার চকবাজার ইসলামি পুথির কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। এই স্থানগুলো থেকেই মুসলিম কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়।

২. কাব্যের শুরুতেই আল্লাহ'র 'বন্দনা' ছাড়াও বিভিন্ন পীরদের স্মরণ করেছেন লেখকরা এছাড়া ইসলামি কলেমা, আয়াত ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া 'হামদ-নায়াত' এর উল্লেখ আছে।

৩. কাব্যগুলি সম্পূর্ণ অন্য নিয়মে লেখা হয়েছে, ধর্মগ্রন্থ 'কোরান' যেমন ডানদিক থেকে বামদিকে লেখা এবং পড়া হয় ঠিক সেই নিয়মেই ইসলামি কাব্য বা পুথি ডানদিক থেকে বামদিকে লিখিত এবং পাঠককুল এই নিয়ম মেনেই এই কাব্য পাঠ করেন।

৪. সমস্ত কাব্যই কম-বেশি বিভিন্ন ছন্দে রচিত। ছন্দের বৈচিত্র্যও বেশ চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন ধরনের ছন্দ যেমন- পয়ার, ত্রিপদী এই দুই ছন্দের ব্যবহার বেশি। এছাড়া চিতং মিল, একাবলি, রাগ ছুটকি, পঞ্চম ইত্যাদি ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. মুসলমান সাহিত্যিকরা প্রতিটি কাব্যের ক্ষেত্রে 'পুথি' কথাটি ব্যবহার করেছেন। 'পুথি' এখানে 'পুস্তক' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. মুসলমান সাহিত্যিক রচিত পুথিগুলি বড় হরফে ছাপা হতো। কারণ গ্রামান্তরে তেলের বাতির স্বল্প আলোয় সামান্য অক্ষরজ্ঞান বিশিষ্ট পাঠকের যাতে পড়তে অসুবিধা না হয়।<sup>১৮</sup>

৭. কাব্য রচনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সচিত্র ব্যবহারও করেছেন সাহিত্যিকরা।

৮. কাব্যের মধ্যে বা শেষে ভণিতা ব্যবহার করেছেন।

৯. ‘আত্মপরিচয়’ অংশ প্রদত্ত হয়েছে।

মুসলমান লেখকরা তাঁদের রচনাকর্ম যেভাবে শুরু করেছেন, সেইভাবে হয়তো সময়ের তালে নিজেদের জনপ্রিয়তা থেকে দূরে সরে গেছেন বহুকারণে। ঠিক কোন সময় থেকে মুসলমান লেখকরা লিখছেন এবং কি ধরনের কাব্য লিখছেন এছাড়া এই লেখকদের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে এক বিশেষ অঞ্চলের সমাজ সংস্কৃতিকে যেমন বুঝে নিতে পারি পাশাপাশি একটা যুগের বা সময়ের গুরুত্ব কতটা তাঁদের জীবনে প্রভাব ফেলে সেই সব বিবরণও পেতে পারি। মুসলমান কবিদের রচনাকর্ম সম্পর্কে সৈয়দ আলি (Syed Ali) বলেন-

“Muslim writers, especially they who wanted to be accepted by Muslim intelligentsia as competent artists, felt it necessary for them to show the capacity of the Bengali language as a medium of moral and religious instruction. This is the main reason for the moralizing tone of the Muslim literature of this period, for its didacticism and for the large number of religious poems in Bengali.”<sup>১৯</sup>

মুসলমান সাহিত্যিকদের নাম, বাসস্থান, রচিত কাব্য, রচনাকাল ইত্যাদি বিষয়ে একটা সামগ্রিক ধারণা পেতে নিচে তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

### পঞ্চদশ শতাব্দীর সাহিত্যিক ও কাব্য পরিচিতি

কবি পরিচিতি	কাব্য ও রচনাকাল
জৈনুদ্দীন, গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের সভাকবি ছিলেন।	রসূল বিজয়।
মুজাম্মিল, চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।	নীতিশাস্ত্র বার্তা, সায়াৎনামা/ছাহাৎনামা (১৭৫৭ খ্রিঃ), খঞ্জন চরিত্র।

সূত্র: কবি পরিচিতি, কাব্য ও রচনাকাল সম্পর্কিত তথ্য আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন রচিত ‘পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস’ এবং সুকুমার সেন রচিত ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য’ এই গ্রন্থগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে।



## ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যিক ও কাব্য পরিচিতি

কবি পরিচিতি	কাব্য ও রচনাকাল
আফজল আলী, চট্টগ্রামের মিলুয়া গ্রামের অধিবাসী।	নসিহত নামা (১৫৩২-৩৩ খ্রিঃ)।
সাবিরিদ্দ খান (১৫১৭-১৫৫০), চট্টগ্রামের নানুপুর গ্রামের অধিবাসী।	বিদ্যাসুন্দর, রসুল বিজয়, হানিফা ও কয়রাপরী।
দোনাগাজী, ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার এক গ্রামের বাসিন্দা।	সয়ফুল মুল্লুক বদীউজ্জামাল।
শায়খ ফয়জুল্লাহ, পাঁচনা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।	গোরক্ষ বিজয় (১৫৪৫ খ্রিঃ), গাজী বিজয় (১৫৪০ খ্রিঃ), সত্যপীর (১৫৪৫ খ্রিঃ), জয়নালের চৌতিশা, রাগ নামা।
হাজী মুহাম্মদ (১৫৫০-১৬২০)।	নূর জামাল, ছুরত জামাল।
সাইয়িদ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮), চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত চক্রশালার বাসিন্দা ছিলেন।	নবী বংশ, শবে মে'রাজ, রসুল বিজয়, ওফাতে রসুল, জয়কুম রাজার লড়াই, ইবলীস নামা, জ্ঞান চৌতিশা, জ্ঞান প্রদীপ, মারফতী গান, পদাবলী।
শায়খ পরাণ (১৫৫০-১৬১৫), চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।	নূরনামা, নসিহতনামা।
দওলত উজীর বাহরাম খাঁ (১৫৬০-১৫৭৫), বাহরাম খাঁর পৈতৃক উপাধি দওলত উজীর, ইনি চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।	লাইলা মজনুন (আনুমানিক ১৫৭৫ খ্রিঃ)।
নসরুল্লাহ খাঁ (১৫৬০-১৬২৫), চট্টগ্রামের অধিবাসী।	জঙ্গনামা, মুসারসোয়াল, শরীয়ৎনামা, হিদায়াতুল ইসলাম।
মোহাম্মদ কবীর।	মধুমালতী (১৫৮৮ খ্রিঃ)।
শায়খ চান্দ (১৫৫০-১৬২৫), দক্ষিণ সিলেটের অন্তর্গত ভানুগাছ পরগণার অধীন ভাগেরহাট গ্রামের বাসিন্দা।	রছুল বিজয় (১৬১২ খ্রিঃ), শাহ দৌলা, কেয়ামত নামা, হরগৌরী সংবাদ, তালিব নামা।

সূত্র: কবি পরিচিতি, কাব্য ও রচনাকাল সম্পর্কিত তথ্য আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন রচিত 'পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস' এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যিক ও কাব্য পরিচিতি

কবি পরিচিতি	কাব্য ও রচনাকাল
দৌলত কাজী, ইনি আরাকান রাজসভার সর্বপ্রথম মুসলিম কবি, চট্টগ্রাম জেলার সুলতানপুর গ্রামের বাসিন্দা।	লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না (১৬২২-১৬৩৮ খ্রিঃ)।
মরদন, কাঞ্চি নগরের অধিবাসী।	নসীরানা (১৬২২-১৬৩৮ খ্রিঃ)।
মাগন ঠাকুর (১৬০০-১৬৬০), আরাকানের অধিবাসী। মাগন কবির ডাক নাম এবং ঠাকুর সম্মানসূচক উপাধি।	চন্দ্রাবতী।
সৈয়দ আলাওল (১৬১৮-১৬৭১), গৌড়ের ফতেহাবাদ নামক স্থানের বাসিন্দা।	পদ্মাবতী, লোর চন্দ্রাণী ও সতী ময়নার শেষ অংশ (১৬৫৯ খ্রিঃ), হস্তপয়কর, তোহফা, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৫৮ খ্রিঃ), দারা সিকান্দার নামা (১৬৭১ খ্রিঃ)।
মুহাম্মদ খান, চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন।	সত্যকলি বিবাদ (১৬৩৫ খ্রিঃ), মাকতাল হুসায়ন (১৬৪৫ খ্রিঃ), হানিফার লড়াই, আসহাব নামা, কিয়ামত নামা, দজ্জাল নামা, কাসিমের লড়াই।
শায়খ মুত্তালিব, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের অধিবাসী।	কিফায়াতুল মুছল্লীন (১৬৩৮ খ্রিঃ), কায়দানী কিতাব (১৬৩৯ খ্রিঃ)।
আবদুল করিম খোন্দকার, রোসাঙ্গের বন্দর এলাকার বাসিন্দা।	দুল্লা মজলিস, হাজার মাসায়েল, নূরনামা।
আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০), নোয়াখালী জেলার সুধারাম অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।	ইউসুফ জলিখা, শিহাবুদ্দীন নামা, লালমতী সয়ফুলমুলক, নূরনামা, নসীহৎনামা, চারি মকাম ভেদ, কারবালা, শহর নামা।
নওয়াজিশ খাঁ (১৬৩৮-১৭৬৫), চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত সুখছড়ি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।	পাঠান প্রশংসা, গুল-ই-বকাওলী, জোরওয়ার সিংহকীর্তি, বয়ানাত, গীতাবলী।
সাইয়িদ মুহাম্মদ আকবর আলী, ত্রিপুরা জেলার অধিবাসী ছিলেন।	জেবল মুলক শামারোখ (১৬৭৩ খ্রিঃ)।
আব্দুন নবী, চট্টগ্রাম জেলার ছিলপুর এলাকার বাসিন্দা।	৮০ পর্বে আমীর হামজার কিছা (১৬৮৪ খ্রিঃ, কোরআনের কায়দা)।

শুকুর মাহমুদ (১৬৮০-১৭৫০), রাজশাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়ার উত্তরে সিন্দুরকুসুমী গ্রামের বাসিন্দা।	ময়নামতীর গান, মধুমালা মনোহর।
আরিফ, দক্ষিণ রাঢ়ের লোক ছিলেন, নিবাস ছিল দেশড়ার তাজপুর গ্রামে।	লালমোনের কেছা (১৮৬৮)।
মুনশী শাহ মুহাম্মদ গরীবুল্লাহ, হুগলি জেলার হাফিজপুরের অধিবাসী।	আমীর হামজা কেছার প্রথম জেলেদ রচনা করেন, ইউসুফ যুলায়খা, মাকতাল হুসায়ন, সত্যপীর।

সূত্র: কবি পরিচিতি, কাব্য ও রচনাকাল সম্পর্কিত তথ্য আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন রচিত 'পুথি সাহিত্যের ইতিহাস' এবং আনিসুজ্জামান রচিত 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' এই গ্রন্থগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে।

### অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাহিত্যিক ও কাব্য পরিচিতি

কবি পরিচিতি	কাব্য ও রচনাকাল
শেখ সাদী, ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী।	গদা মল্লিকা (১৭১২ খ্রিঃ)।
শেবরাজ, ত্রিপুরার বাসিন্দা।	ফক্কর নামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল, কাসেমের লড়াই, ফাতিমার সূরতনামা।
কাজী হয়াত মাহমুদ, ইনি সুলঙ্গাবাগদ্বার পরগণার অন্তর্গত ঝাড় বিশলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।	জঙ্গনামা বা মহরম পর্ব (১১৩০ বঙ্গাব্দ), চিত্ত উথান বা সর্বভেদবাণী (১১৩৯ বঙ্গাব্দ), হেতুজ্ঞান বা হিতজ্ঞান বাণী (১১৬০ বঙ্গাব্দ), আশ্বিয়া বাণী (১১৬৫ বঙ্গাব্দ)।
ব্রান উল্লা, ইনি দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত নফর গ্রামের অধিবাসী।	কেয়ামতনামা।
শাহ বদীউদ্দিন।	ফাতিমার সূরতনামা নামে পুথি পাওয়া যায়।
মুহাম্মাদ রেজা (১৬৯১-১৭৬৭), চট্টগ্রাম জেলার বাসিন্দা।	তমীম গুলাল চতুর্থ ছিল্লাল, মিসরী জামাল।
মুহাম্মাদ মুকীম (১৭০০-১৭৭৫), চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামের জন্মগ্রহণ করেন।	গুলে বকাওলী, কালাকাম, মৃগাবতী, আয়ুব নবীর কথা, ফায়েদুল মুকতাদী।

মুহাম্মদ আলী, চট্টগ্রামের আজিম নগরের অন্তর্গত ইদিলপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।	হযরাতুল ফিকহ, শাহ পরী মল্লিকজাদা ও হাসনা বানু।
আলী রাজা (১৬৯৫-১৭৮০), চট্টগ্রাম জেলার ওশখাইন গ্রামের বাসিন্দা।	জ্ঞান সাগর, সিরাজ কুলুব, ধ্যানমালা, আগম, যোগকালন্দর, ষটচক্রভেদ।
মুহাম্মদ দানেশ, শিবপুর এর অধিবাসী।	চাহার দরবেশ (১১৭৮ বঙ্গাব্দ), গুল ও সানুওয়াও, নূরুল ঈমান।
শাকের মামুদ, রংপুর জেলার রিকাইতপুরের অধিবাসী।	মধুমালতী (১১৮৮ বঙ্গাব্দ)।
মুহাম্মদ কাসিম, নোয়াখালি জেলার যুগীদিয়া গ্রামের অধিবাসী।	হিতোপদেশ, সুলতান জমজমা, সিরাজুল কুলুব (১১৯৭ বঙ্গাব্দ/১৭৯০ সাল)।

সূত্র: কবি পরিচিতি, কাব্য ও রচনাকাল সম্পর্কিত তথ্য আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন রচিত 'পুথি সাহিত্যের ইতিহাস' এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

### অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের সাহিত্যিক ও কাব্য পরিচিতি

কবি পরিচিতি	কাব্য ও রচনাকাল
সৈয়দ হামজা, বর্ধমান জেলার ভূরশুট পরগণার অন্তর্গত উদনাগ্রামের বাসিন্দা।	মধুমালতী, আমীর হামযার পুথি (১২০১ সাল), জৈগুন বিবির পুথি (১২০৪ সাল), হাতিম তাই (১২১০সাল)।
সাদেক আলী, সিলেটের দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দা।	হালতুল্লবী, মহব্বত নামা, ইউসুফ যুলায়খা, হাশর মিছিল, রদে কুফর।
চুহর, চট্টগ্রামের বাঁশখালির বাসিন্দা।	আজর শাহ শামারুখ, সুজান চন্দ্রাবতী, মনোহর মধুমালতী, কিচ্ছা দেলারাম।
হামীদুল্লাহ খাঁ, চট্টগ্রামের অধিবাসী।	ত্রাণপথ, গুলজারে শাহাদত।
কুতবুদ্দীন খাঁ, বগুড়া জেলার বাসিন্দা।	হানিফার জঙ্গনামা (১২১১ সাল)।
মুনশী আশরাফুদ্দীন	কেয়াফত নামা (১২৩৩-১২৪১ সাল)।
সাইয়িদ হাফীয আমানতুল্লাহ, উওর চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাটের বাসিন্দা।	কিয়ামত নামা (১২৪১), হিদায়াতুল ইসলাম।
মুনশী মালে মুহাম্মদ, ঢাকা জেলার হিন্নরকান্দি গ্রামের অধিবাসী।	হয়ফুলমুল্লুক ও বদীউজ্জামাল (১২৩৫ সাল), আহকামোল জোমা (১২৬৩ সাল), তাখিয়াতুল্লোসা (১২৭৩ সাল), সেরাতল মোমেনীন (১২৯৬ সাল)

মুনশী মুহাম্মদ মীরন, ঢাকার অধিবাসী।	বাহার দানেশ (১২৪৪ সাল), গুলযারে দানেশ (১৮০২ খ্রিঃ)।
মুনশী মুহাম্মদ খাতির, হাওড়া জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুরের অধিবাসী।	লাইলা মজনুন (১২৭১ সাল), কাছাছুল আশ্বিয়া (১২৭৩ সাল), আখবারুস সালাত (১২৭৮ সাল), নূরনামা হুলিয়ানামা (১২৭৮ সাল), মিফতাহুল জান্নাত (১২৮০ সাল), গোলে হরমুজ (১২৮২ সাল), ছহি বড় শাহনামা (১২৮২ সাল), আখবারুল ওজুদ (১২৮২ সাল), বোন বিবি জহুরানামা (১২৮৭ সাল), তুতীনামা (১২৯৭ সাল), মৃগাবতী যামিনীভান ও রুকমণি পরীর কিছা (১২৯৮ সাল), ছহি বড় মিরাজনামা, খুলাসাতুল আশ্বিয়া, তাজকিরাতুল আউলিয়া, নসীহতুল মুসলিমীন, জমজমা বাদশার কেছা, মারফতনামা।

সূত্র: কবি পরিচিতি, কাব্য ও রচনাকাল সম্পর্কিত তথ্য আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন রচিত 'পুথি সাহিত্যের ইতিহাস' এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

### উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাহিত্যিক ও কাব্য পরিচিতি

কবি পরিচিতি	কাব্য ও রচনাকাল
মুনশী ইরফান আলী, সিলেট জেলার কসবা গ্রামের বাসিন্দা।	মফিদুল মুসলিমিন, রাহাত নামা, আখবারুল ঈমান, ছয়ফুল বেদাত।
রওশন আলী।	তরীকুলইসলাম, নূরুল্লাহার, নিজামপাগলার কেছা।
মাওলানা আব্বাস আলী মরহুম, উওর চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রামের বাসিন্দা।	বরকুল মোওয়াহহিদ্দীন, মাসাইয়েলে জরুরিয়া, সিরিয়া বিজয়, ইরাক বিজয়, মিসর বিজয়, জুম'আর খুৎবার।
মুনশী আবদুর রহীম, ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ এলাকার গলাচিপা গ্রামের অধিবাসী।	ছহি দেল দেওয়ান (১২৬৮ সাল), নছিহাতুল খুবি, নছিহত নামা, নকনিয়েতে বাঙ্গালা, দিল দিওয়ানা (১২৬৮ সাল), ছাখাওত নামা, বিলাল নামা, হযরত মুসা পয়গম্বরের পুথি, খোনার বচন, রূপরাজ ও চন্দ্রাবতী কন্যার পুথি, কালু গাজী চম্পাবতী কন্যার পুথি, সেখ ফরিদের পুথি।

মুনশী জনাব আলী, হাওড়া জেলার ধলাগ্রামের অধিবাসী।	নকশে সোলেমানী (১২৬৮ সাল), আখবারুল আউলিয়া (১২৭৬ সাল), মোনাবেরহাত, রাহে নাজাত, যেমালুল ফিরদাওস, শহীদে কারবালা, কাছাছুল আশ্বিয়া, দরুদে মুজতবা, এহইয়াউল কুলূব, লজ্জতুল ঈমান, রেছালা বেনামাজী, তাম্বীছুল (১২৯৩ সাল), মাজমু'আ ফতহুশ শাম (১২৯০ সাল), তাজকেরাতুল আউলিয়া, জনাতুল ওয়ায়েযীন (১২৯৭ সাল)।
মওলবী হাজী আব্দুল মজীদ ভূয়াঁ, উড়িষ্যার বালেশ্বর কটক জেলার এক গ্রামের বাসিন্দা।	রংবাহার (১২৬৮ সাল), দেল বোবা টারচামান (১২৯৬ সাল), আমীর হামযার তরজমা (১২৯৮ সাল)।
উমেদ আলী, চব্বিশ পরগণা জেলার বাইশহাট্টা ধুপিহারীর অধিবাসী।	তাকবিরাতুল ঈমান (১২৭০ সাল)।
শায়খ আমীরুদ্দীন আহমদ, চব্বিশ পরগণা জেলার বাসিন্দা।	মল্লিকা আকার (১২৭২ সাল), মনসুর হাল্লাজ (১২৮২ সাল)।
মওলবী আতাউল্লাহ সিদ্দীকী, রংপুর জেলার গোরাই পেয়ারা গ্রামের অধিবাসী।	হযরতুল ফেকাহ (১২৭৩ সাল)।
মুনশী বেলায়ত হোসেন, যশোর জেলার বাসিন্দা কিন্তু কলকাতায় থাকতেন।	ফেসানায়ে আজায়েব (১২৭৫ সাল), সায়েবে দোজাহান (১২৮৬ সাল), নিয়তনামা (১২৮৭ সাল), আমীর হামযার অনুবাদ করেন।
মুনশী গোলাম মওলা, চব্বিশ পরগণা জেলার খাসপুরের অধিবাসী ছিলেন।	হায়রাতুল ফেকাহ (১২৭৬ সাল), মৌলুদে বাহারিয়া (১২৮২ সাল), মউতনামা (১২৮৩ সাল), সোলতান জমজমা (১২৮৭ সাল), হায়জানামা (১২৯২ সাল), হেদায়েতুল ইসলাম (১২৯৬ সাল), মালেকা জোহরা বিবি (১২৯৮ সাল), খাবনামা (১৩০৮ সাল)।
মুনশী ফসীহুদ্দীন, নদিয়া জেলার বড় চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা।	মেছবাহুল এছলাম (১২৭৯ সাল), সামসামুল মুওয়াহেদীন (১২৯৫ সাল), মিনহাজুল ইসলাম (১৩১৫ সাল), মফতাহুল ইসলাম, তরীকায়ে মুস্তফা।
মুনশী কামালুদ্দীন, চব্বিশ পরগণার বারুইপুর এলাকার বাসিন্দা।	বনবিবির গল্প নিয়ে পুথি রচনা করেন। (১২৮২ সাল)।

মুনশী শাহ আব্দুল করীম, ফরিদপুর জেলার চর শিমুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা।	ফাজায়েলে হারমাস্টিনমক্কা ও মদীনার মাহাত্ম্য (১২৮৩ সাল), মুফীদুল খালায়েক (১২৯০ সাল), ফজীলতে হজ্জ (১২৯৩ সাল), শ্রাবণ মুফীদুল ইসলাম (১৩০১ সাল)।
মুনশী আকবর আলী	বারমাস (১২৮৩ সাল), শাহাদৌলা (১৩১০ সাল)।
মুহাম্মদ তাহের, হুগলি জেলার অধিবাসী ছিলেন।	গেন্দ গোল হররোজ (১২৮৪ সাল)।
খোন্দকার আহমদ আলী, চব্বিশ পরগণার অধিবাসী ছিলেন।	কালু গাজী চম্পাবতী (১২৮৫ সাল)।
ওয়াজেদ আলী	সত্যপীরের পুথি রচনা করেন (১২৮৬ সাল)।
দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী, রাজশাহী জেলার অধিবাসী।	জঙ্গে খায়বার (১২৮৫ সাল)।
মুনশী মোহাম্মদ, হুগলি জেলার ভূরশুট কানপুরের অধিবাসী।	ইনিশাহে এমরান চন্দ্রভান (১২৮৭ সাল), শাম নূরীমান (১২৯০ সাল), উমর উম্মিয়ার নকল (১৩০০ সাল), মালতী কুসুম মালা (১৩০২ সাল), শহীদে কারবালা (১৩০৭ সাল), ফয়সলে আহকাম (১৩১০ সাল), হদ মজার শ্বশুর বাড়ী (১৩১৭ সাল), বদীয়ুজ্জামার লড়াই (১৩১৮ সাল)।
মুনশী আবদুল ওয়াহাব, কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন।	লায়লা মজনু (১২৮৭ সাল), আসবারুস সালাত (১২৯৬ সাল), ওজুদনামা (১৩০৩ সাল), নাজাতুল আরওয়াহ (১৩১০ সাল)।
মুনশী রবীউল্লাহ, কুমিল্লা জেলার শেখের গ্রামের অধিবাসী।	চৌদ্দ উজীর (১২৮৭ সাল)।
মুনশী আয়েজুদ্দীন, হুগলি জেলার তালপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।	পরীবানু শাহজাদী ও জামান শাহজাদার কেচ্ছা (১২৮৮ সাল), আকামুশ শরীয়ত (১২৮৮ সাল), গোলান্দাম (১২৯০ সাল), সেকেন্দার নামা (১২৯২ সাল), কেচ্ছা দেল পছন্দ (১২৯৯ সাল), আলেফ লায়লা (১৩০৪ সাল), সতী বিবির কেচ্ছা (১৩০৬ সাল), মালঞ্চ কন্যা (১৩০৮ সাল), মোরশেদ নামা (১৩১৫ সাল)।
মোহাম্মদ ছায়ীদ।	তাওয়ারীখে মোহাম্মদী (১৩৬০ সাল)।

মুনশী মুনাওয়ার আলী, কুমিল্লা জেলার বাসিন্দা।	আলমাছ ও গোলরায়হান (১২৯০ সাল)।
মুনশী গরীবুল্লাহ, ঢাকা জেলার রহমত গঞ্জের অধিবাসী।	নেকবিবি পুথি, দেল রওশন (১২৯৫ সাল)।
মুনশী রসুল মোহাম্মদ খোন্দকার, রংপুর জেলার মেলাবর গ্রামের অধিবাসী।	মৌলুদে গোলজারে বাহরিয়া (১২৯৪ সাল), চৌত্রিশ অক্ষরের ফজীলত (১৩০০ সাল)।
খোন্দকার গোলাম ইছমাঈল, নদিয়া জেলার বাসিন্দা।	পবন কুমারীর পুথি (১২৯৫ সাল)।
হাবিলুদ্দীন।	সোমর্তভানের পুথি (১২৯৬ সাল)।
মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম মরহুম, রংপুর জেলার লালবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা।	হেদায়েতুল ফোচ্ছাক (১২৯৭ সাল)।
আব্দুল শুকুর, পাবনা জেলার অধিবাসী।	নূরুল বাছার (১২৯৭ সাল), গুলে বকাওলি (১৩০০ সাল), গুলশানে নওবাহার (১৩০৪ সাল)।
মুনশী এনায়েতুল্লাহ সরকার, রংপুর জেলার শীতলগাতীর অধিবাসী।	ফকির বিলাস (১২৯৯ সাল)।

সূত্র: কবি পরিচিতি, কাব্য ও রচনাকাল সম্পর্কিত তথ্য আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন রচিত ‘পুথি সাহিত্যের ইতিহাস’ এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

### ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের সাহিত্যিক ও কাব্য পরিচিতি

কবি পরিচিতি	কাব্য ও রচনাকাল
শেখ ওমরগদ্দিন, চব্বিশ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামের অধিবাসী।	খায়রুল হাশর (১৩০০-১৩০২ সাল)।
আলীমুদ্দিন গাইন।	ভানুমতী বিবির লড়াই (১৩০১ সাল)।
শাহ জোবেদ আলী, ময়মনসিংহ জেলার ধল্লা নামক গ্রামের অধিবাসী।	রাজকন্যা মধুমালা (১৩০১ সাল), নইদার চাঁদ কুম্বীর (১৩১৩ সাল), জামাল গাজীর দাস্তানের বস্তানী, গোরক্ষনাথ ও মীননাথের পুঁথি, দেলন্দর ফকিরনামা, ময়নাবতি কন্যার পুথি।
মওলবী রহমতুল্লাহ, কলকাতার অধিবাসী।	কাছাছুল আশিয়া (১৩০২ সাল)।
মুনশী আবদুল জব্বার, চব্বিশ পরগণার	গোলশানে রুম (১৩০৩ সাল)।



কাঁঠালবাড়ীয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।	
রায়হানুদ্দীন।	গোলে আবজান (১৩০৪ সাল)।
মওলবী আবদুস সোবহান, বরিশাল জেলার রামনগর গ্রামের বাসিন্দা।	হাবিল কাবিলের কেছা (১৩০৬ সাল)।
মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, মেদিনীপুর জেলার হুসায়নাবাদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।	হরনূর বিবির কেছা (১৩০৬ সাল), রাতকানা জামাই (১৩১৫ সাল)।
হাজী গরীবুল্লাহ।	আরবা'ঈন হাদীস (১৩০৯ সাল)।
মুনশী ছমীরুদ্দীন।	কুলসুম বিবির মেজবাসী (১৩১৩ সাল)।
মোহাম্মদ কোরবান আলী, ঢাকা জেলার বাসিন্দা।	সখিসোনোর কেছা (১৩১৮ সাল), শাশুড়ি জামাইয়ের ঝগড়া (১৩২১ সাল)।
মুনশী কোবাদ আলী।	জঙ্গে হায়দার (১৩২২ সাল)।
মুনশী আবেদ আলী ও মুনশী আশরাফ আলী।	মউতনামা (১৩১৫ সাল)।
মুনশী ইসহাকুদ্দীন।	দাস্তান শহীদে কারবালা (১৩৩৪-১৩৩৬ সাল)।
তাজুদ্দীন।	ফরযোখ শাহা ও গোলভানু কন্যার পুথি (১৩২৮ সাল)।
মওলবী শায়খ আজহার আলী, হাওড়া জেলার অধিবাসী।	জঙ্গে রসূল ও জঙ্গে আলী (১৩২০ সাল), জঙ্গে জয়নাল (১৩২১ সাল), লজ্জাবতীর পুথি।

সূত্র: কবি পরিচিতি, কাব্য ও রচনাকাল সম্পর্কিত তথ্য আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন রচিত 'পুথি সাহিত্যের ইতিহাস' এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

মুসলমান সাহিত্যিকরা আরবি-ফারসির প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কখনও হাদিস বা কোরান বর্ণিত গল্পকে কাব্যের বিষয় করে এই সমস্ত কাব্য রচনা করেছেন। বহু সাহিত্যিকের নাম উঠে আসে যাঁরা ক্ষমতার আসীনে থাকা রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের বিনোদনের জন্য কিছু কাব্য রচনা করেছেন, অথবা অমাত্যগণের অনুরোধে বাংলায় সাধারণ মানুষের মনোগ্রাহী করে কাব্য রচনা করেছেন, যা সাহিত্য হিসাবে বেশ স্বীকৃতি পেয়েছে আজও, যেমন- আলাওল 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। আমরা এই অধ্যায়ে যে সমস্ত সাহিত্যিক বা কবিদের কথা জানতে পারছি তাঁদের লেখনীর দ্বারা প্রত্যেকেই পরিচিত থেকে গেছেন 'মুসলমান সাহিত্যিক' এই নামেই। ভারতবর্ষ তথা বাংলার সেই সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা জানলে বুঝতে পারি ক্ষমতার হস্তান্তর

হয়েছে বারংবার এবং তারই প্রভাবে সামাজিক চিত্রপট বদলে গেছে বারে বারে। তবে ভারতবর্ষে ইসলামের প্রবেশ এবং নিজেদের এক রকমভাবে তৈরি করে তোলা এই দৃশ্য অন্যরকম। তবে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান প্রভৃতি জাতি পম্পরবিরোধী ধর্মবিশ্বাস রূপে যে সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি মেনে চলুক সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁরা প্রত্যেক জাতি তাঁদের অখণ্ড ‘বাঙালি’ পরিচয়ে বেঁধে রেখেছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে আলাদা হলেও তাঁরা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে কেউই ত্যাগ করেননি।<sup>২০</sup> বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিকে প্রত্যেকেই বহন করেছেন এবং সাহিত্য রচনায় সেই সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ এসেছে। সেই সময়ে গৌড়বঙ্গ থেকে শুরু করে এদিকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতি সাহিত্য রচনার এক ঘরানা তৈরি করে। সেই আরাকানী রাজসভার এক বিরাট প্রভাব যে ইসলামি বাংলা সাহিত্য চর্চায় এসেছে তা আলাওল ও দৌলত কাজির কাব্যের মধ্যে উঠে এসেছে। তাঁরা দু’জন কবিই যেভাবে কাব্যের বিষয় নির্বাচন করেছেন এবং কাব্যের বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে রসাস্বাদনের জায়গা কোন অংশে কম নয়। মুসলমান সাহিত্যিক লিখছেন এখানে ধর্মীয় বাতাবরণের কথা ভুলে বা এই ধারণার বাইরে গিয়ে আমরা যদি অন্যভাবে ভাবতে পারি তবে কাব্যরচনার সাহিত্যিক মূল্য কতটা বুঝে নিতে পারব। তাই কোনও সাহিত্যিক এবং তাঁদের রচিত সাহিত্যিকে প্রথমত ধর্মকেন্দ্রিক আবর্তের সূত্র ধরে ব্যাখ্যা না করে, কাব্যের বিষয়বস্তু/প্লট ইত্যাদি সম্পর্কিত ধারণা আগে নেওয়া দরকার। হিন্দু সাহিত্যিকদের রচনায় ‘বন্দনা’ অংশে যেভাবে দেব-দেবীর প্রাধান্য পড়েছে সেখান থেকে মুসলমান সাহিত্যিকরা সরে এসে আল্লাহ’র বন্দনা করেছেন। এগুলোকে আমরা বিশেষ ধরণের Style বা রচনাশৈলীর আওতাভুক্ত করতে পারি। আসলে আমাদের এটাই দেখার যে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁদের কদর কতখানি এবং পাঠক তাঁদের কাব্যের প্রতি কতটা আকর্ষক। ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, লোরচন্দ্রাণী-সতীময়না ইত্যাদি কাব্যগুলির দিকে নজর দিলে দেখা যায় সময়ের বিচারে প্রতিটি কাব্য মধ্যযুগীয় ঘরানার কিন্তু প্রতিটি চরিত্র কতখানি উজ্জ্বল নিদর্শনের ছাপ ফেলেছে সেটাই ভাবার। এছাড়া লেখকদের যুগের চেয়ে এগিয়ে থাকার মানসিকতা তাঁদের লেখনীতে ধরা পড়েছে। প্রণয়কেন্দ্রিক কাব্যগুলিতে দেখা যায়

প্রেমের জন্য কতখানি আত্মত্যাগ এবং পরকীয়া সম্পর্কের যে ধারণা তা স্পষ্ট। বড় চণ্ডীদাসের কাব্য ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ এ রাধার প্রেম বর্ণিত হয়েছে। তবে মুসলমান সাহিত্যিক রচিত কাব্যগুলিতে কোনও দেবতাস্থানীয় চরিত্র নয় একদম মর্ত্যজীবনের নর-নারীর প্রেমের যে আকুলতা তা লক্ষণীয়। এখানেই মুসলমান সাহিত্যিকরা সময়ের থেকে একধাপ এগিয়ে থেকেছেন। এছাড়া মুসলমান সাহিত্যিক রচিত পীর কাব্যের মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের দিকটিও বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আহমদ শরীফ বলেন-

“কোন বহিরারোপিত ধর্মমত বা জীবনাদর্শ বাঙলাদেশে টেকেনি, বাঙালীরা সব সময়ে নিজেদের জীবন-জীবিকার গরজমত ধর্মমত, ইষ্টদেবতা এবং জীবনাদর্শ তৈরি করে নিয়েছে। গৌড়-সুলতানদের শাসনের শেষের দিকেও হিন্দু-মুসলমান এক মিলন-ময়দানে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, তাদের এ মিলনরাখী হয় ‘সত্য’ (truth) এবং প্রমূর্ত সত্যেই যুগপৎ সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর রূপে পূজা-শিরণী পেতে থাকেন।”<sup>২১</sup>

এই অধ্যায়ে সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত মুসলমান সাহিত্যিক যাঁরা কাব্য রচনায় এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের কথা বলা হয়েছে। আসলে বাংলার সাংস্কৃতিক পরিবেশে নিজেদের কতটা মানিয়ে নিয়েছেন এই লেখক-গোষ্ঠী তা রচনার দিকে তাকালেই স্পষ্ট। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত অনেক কাব্যেই সংস্কৃতির ক্ষেত্র অনেকটা উন্মুক্ত। নিজেদের ধর্মীয়-বাতাবরণের মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে না রেখে পারিপার্শ্বিক রচনাকর্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রায় অনুকরণ কিছুটা অনুসরণ করে নিজেদের মতো পরিসর তৈরি করে নেন। তবে ধর্মীয় ভাবাবেগকে একেবারে আত্মবিসর্জন দিয়ে নয়, আমরা দেখেছি কাব্যগুলির গল্পের প্লট কোরান, হাদিসের মতো জায়গা থেকে গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তাঁদের বিচক্ষণতা- নৈপুণ্যতাও অসীম, পূর্ববর্তী রচনাকর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল থেকেছেন লেখকরা। মধ্যযুগের হিন্দু কবির হাতে যে লেখা পাওয়া যায় তার বেশ কিছু জায়গাকে নিজেদের লেখায় উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন

মুসলমান কবিরা। মুসলমান সাহিত্যিকদের কাব্যগুলির বিষয়ে যেমন ভিন্নতা এসেছে তেমনই লেখক-গোষ্ঠীর চেতনায় এসেছে ভিন্ন সুর। তাই বলতেই পারি, মধ্যযুগের সাহিত্যের যে সম্ভার সেই সূচিতে মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনা বহুগুণে অধিক শুধুমাত্র কালের স্রোতে মূল পরিধি থেকে আজ অনেক দূরে। সেই প্রায় হারিয়ে যাওয়া সাহিত্যের আরও একবার পুনরায় পাঠের মাধ্যমে এবং সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষার দিকে আলোকপাত করার ইচ্ছে থেকেই গবেষণার এই অধ্যায়ের ভাবনা। তাই মুসলমান সাহিত্যিকদের একটা পরিসর তৈরি করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। আমরা এই পরিসর থেকে সহজেই সাহিত্যিকদের সম্পর্কে জেনে নিতে পারব। অনেক সাহিত্যিকদের পরিচয় আমরা এখানে পেয়েছি যাঁদের কথা মূলস্রোতের লেখায় উঠে না আসলেও আবদুল করিম, আহমদ শরীফ প্রমুখ ব্যক্তির নিজেদের লেখায় সেই কবিদের/সাহিত্যিকদের কথা তুলে এনেছেন। সেই জায়গা থেকে নামগুলো এই গবেষণার খসড়া তৈরি করার সময় যথেষ্ট কাজে এসেছে। নতুন নতুন সাহিত্যিকদের কথা আমরা জেনে নিতে পেরেছি এই অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে এবং সাহিত্যিকদের আবির্ভাবের এবং নিজ বসতির কথাও এখানে জানা যাচ্ছে। মুসলমান সাহিত্য বা ইসলামি সাহিত্য যাই বলা হোক না কেন এই সাহিত্যের পাঠের আগে সাহিত্যিকদের সম্পর্কে জেনে নেওয়াটা প্রাথমিক কাজের আওতাভুক্ত। ‘মুসলমান সাহিত্যিক’ হিসাবে যাঁদের কথা জানতে পারছি তাঁরা বঙ্গদেশের কোথায় বসবাস করেছেন এবং কোন প্রেক্ষাপটে কাব্যরচনায় প্রয়াসী হয়েছেন এটা জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপাতপক্ষে আমরা মুসলমান সাহিত্যিক বলতে আলাওল এবং দৌলত কাজি এই নামদুটির বাইরে খুব সহজে কিছু ভাবতে পারিনা তাই এই দুটো নামের বাইরে গিয়েও মুসলমান সাহিত্যিক কারা ছিলেন? সাহিত্য রচনায় ঠিক তাঁদের ভূমিকা কি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের জায়গা এখানেই মিলবে তাই এই অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বা চাঁটিগা ছাড়াও বঙ্গদেশে মুসলমানদের সাহিত্য রচনার রসদ যে পূর্ণমাত্রায় ছিল তা লক্ষণীয়। তাই এর বাইরে এসেও সাহিত্যিকরা নিজেদের মতো কলম ধরেছেন, লিখেছেন নিজেদের ভাবনা-চিন্তার জায়গা থেকে, এখানেই মুসলমান সাহিত্যিকদের

অবদান অনস্বীকার্য। মুসলমান সাহিত্যিক সম্পর্কে যে ধারণা আমরা পাই তাতে সহজেই বুঝতে পারি তারা বাংলার যে সংস্কৃতির ধারা তাকে টিকিয়ে রাখতে আরও সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। এমন কিছু লেখকদের পরিচয় পাওয়া যায় যাঁরা বঙ্গদেশের সংস্কৃতির দিককে জনমানসে তুলে ধরার জন্য সাহিত্য রচনা করেন, এই পর্বে আমরা পীর সাহিত্য রচনাকারদের নাম উল্লেখ করতে পারি। এছাড়া হিন্দু-মুসলমান এই জাতি পরিচয়ের উদ্দেশ্যে গিয়ে সাধারণ মানুষ সার্বিকভাবে সাহিত্যকে পাঠ করতে পারে উন্মুক্ত মানসিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই বোধও তাঁদের মধ্যে কাজ করেছে। পরিবেশ-পরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখা যায় সাহিত্যিকরা কাব্য রচনা করার অনুপ্রেরণা হিসাবে তাঁদের অমাত্যগণের কথাকে কাব্যের মধ্যে তুলে এনেছেন, বেশকিছু অমাত্যগণ ছিলেন হিন্দু যাঁদের পরামর্শে কবিদের কাব্যরচনা। সেইক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান জাতি সত্ত্বে যে পারস্পরিক মেলবন্ধন তাঁদের কথায় উঠে আসে, তাঁদের মননে সংস্কৃতির ভাবনা আলাদা করে ভাবতে শেখায়নি বরং সবকিছুকে গ্রহণ করে সংস্কৃতির সব আঙ্গিকগুলোকে কাব্যরচনার সময় এনেছেন। বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসে বহু সাহিত্যিক কাব্য রচনা করেছেন কিন্তু ভাবনায়-চেতনায় এসেছে গোটা বঙ্গদেশের পরিবেশের চিত্র যা খুব বেশি আলাদা করে তোলে না। মুসলমান লেখকগোষ্ঠীর হাতে সাহিত্য রচনার পরিবেশ তৈরি হয় এই পরিমণ্ডলের মধ্যেই। একদিকে যেমন এই লেখকগোষ্ঠী নিজেদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেছেন পাশাপাশি সর্বধর্মের সমন্বয়ের দিকটিকেও পরিস্ফুট করতে সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতার আঙ্গিককে অবলম্বন করেছেন। এভাবেই এই সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্য জগতে তৈরি করে গেছেন সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ক্ষেত্র যা আজও চর্চিত ও পঠিত।

## তথ্যসূত্র ও টীকা

১. করিম. আবদুল, 'বঙ্গীয় মুসলমানের বঙ্গ সাহিত্য-চর্চা', 'কোহিনুর নবপর্যায়', মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২২। পৃ.২৮১

২. বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদান অনস্বীকার্য। ‘মুসলমান সাহিত্যিক’ এই নামের মধ্য দিয়ে এঁদের আলাদা পরিচয় তৈরি হয়। আনিসুজ্জামান, সুকুমার সেন, ওসমান গনী, আবদুল করিম, আহমদ শরীফ, এনামুল হক, গিরীন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ ব্যক্তির এই একই নাম তাঁদের গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন।

৩. মোস্তফা. গোলাম, ‘মুসলিম সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য’, ‘মাসিক মোহাম্মদী’, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৪। পৃ.২০৫

৪. “As regards literature, Islamic influence is discernible only in the loan of some Arabic and Persian words in Bengali literature, but in nothing else. A class of Muslim writers inspired by the ideals of Persian literature, tried to introduce romanticism in Bengali literature.”

সূত্র: Majumdar. R.C, ‘History of Mediaeval Bengal’, Calcutta, G. Bharadwaj & co, 1973. P. 255

৫. রহমান. হাবিব, ‘বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’, কলকাতা, মিত্রম, ২০০৯। পৃ.১৮

৬. ওদুদ. কাজী আবদুল, ‘শাস্ত্রত বঙ্গ’, কলিকাতা, সিগনেট বুকশপ, ১৩৫৮। পৃ.২৬৫

৭. Ashraf. Syed Ali, ‘Muslim traditions in Bengali literature’, Karachi University, Bengali Literary Society, 1960. P.2

৮. শরীফ. আহমদ (সম্পা.), ‘মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ’, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৩৬৯। পৃ.৬

৯. Abdul Mannan. Kazi Muhammad, ‘The Emergence and developmet of dobhasi literature in bengal up to 1855 A.D’, University of London, Proquest, 1964. P.21

১০. আবদুল করিম বলেন- “Islam, which completely changed the socio-religious pattern of Bengal, came in the wake of Turkish conquest towards the beginning of the 13th century A.D.”

সূত্র: Karim. Abdul, ‘Social History of the Muslims in Bengal (Down to A.D 1538)’, East Pakistan, The Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1959. P.18

১১. ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন, 'বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' (দ্বিতীয় সংস্করণ), কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৫। পৃ.১৫৭

১২. সুমন্ত ব্যানার্জী দোভাষী পুথি সম্পর্কে বলেন- “the literature of these Bengali Muslims of the city consisted of narrative poems, elegiac verses and didactic poetry composed in a dialect known as ‘dobhasi’ (which literally means ‘derived from two languages’, but actually contained elements from more than two languages, namely, Bengali, Arabic, Persian and Urdu). Although, as we have seen, Arabic and Persian words had been in vogue in Bengali literature since the fourteenth-fifteenth centuries, ‘dobhasi’ literature was characterized by a preponderance of such words and it became popular among the Bengali Muslims in the eighteenth and nineteenth centuries.”

সূত্র: Banerjee. Sumanta, ‘The Parlour and the Streets Elite and Popular Culture in nineteenth Century’, Calcutta, Seagull Books, 1998. P.118-119

১৩. সুকুমার সেন এই ইসলামি বাংলা সাহিত্য নাম দিয়েছেন।

১৪. গনী. ওসমান, ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি’, কলকাতা, রত্নাবলী, ১৯৯৯। পৃ.২২

১৫. Abdul Mannan. Kazi Muhammad, ‘The Emergence and developmet of dobhasi literature in bengal up to 1855 A.D’, University of London, Proquest, 1964. P.21

১৬. আনিসুজ্জামান ভাষাবৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রেখে মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যকে ‘মিশ্র ভাষারীতির কাব্য’ বলেছেন।

সূত্র: আনিসুজ্জামান, ‘মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)’, ঢাকা, চারুলিপি, ২০১২। পৃ.২৯

১৭. আব্দুল মান্নান বলেন- “Dobhasi diction was first applied to literary composition by Hindu poets and that before 1700 there was no evidence of its use by Muslim poets. In the 18<sup>th</sup> century however, Muslim poets adopted Dobhasi diction as the language of large number of poetical works and the practice continued through the 19<sup>th</sup> century. It would not be true however, to infer that Dobhasi diction was from this time employed

by all Muslim poets in all their writings. Many of them continued to write in the standard Bengali of the age and still do.”

সূত্র: Abdul Mannan. Kazi Muhammad, ‘The Emergence and developmet of dobhasi literature in bengal up to 1855 A.D’, University of London, Proquest, 1964. P.86

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়. সুমন্ত, ‘বটতলার ‘দোভাষী সাহিত্য’-সেকাল ও একাল’, ‘বাঙালির বটতলা (প্রথম খণ্ড)’, অদ্রিশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য (সম্পা.), কলকাতা, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩। পৃ.১৭২

১৯. Ashraf. Syed Ali, ‘Muslim traditions in Bengali literature’, Karachi University, Bengali Literary Society, 1960. P.7

২০. ভট্টাচার্য. যতীন্দ্রমোহন, ‘বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি’ (দ্বিতীয় সংস্করণ), কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৫। পৃ.১৫৩-১৫৪

২১. শরীফ. আহমদ, ‘বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড)’, ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন, ২০১৩। পৃ.২৮২



## দ্বিতীয় অধ্যায়

### মুসলিম বাংলা সাহিত্য: বিভিন্ন সংরূপ ও শ্রেণিবিচারের পর্যালোচনা

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্যের যে বিপুল ভাণ্ডার তার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা জেনেছি। মুসলমান লেখক রচিত সাহিত্য যাকে আমরা ‘মুসলিম বাংলা সাহিত্য’ বলে একরকমভাবে চিহ্নিত করেছি, সেই সাহিত্যকে বিভিন্ন সংরূপ ও শ্রেণির আওতাভুক্ত করে আলোচনা করার জন্য এই অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে। যেকোনও সাহিত্যের নিবিড়পাঠের পাশাপাশি সংরূপ সম্পর্কিত বিষয়ে আমাদের অবগত থাকা প্রয়োজন। সেই দিকের প্রতি নজর রেখেই মুসলমান সাহিত্যিক রচিত কাব্যপাঠের বিশ্লেষণ এবং আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে আমাদের এই বিষয়ের প্রতি অবলোকন করা দরকার। এই সমস্ত শ্রেণিবিচারের ধারণা আমরা এই অধ্যায়ে জেনে নেব। তার সঙ্গে আরও জেনে নেওয়া দরকার কেন এই বিভিন্ন ধারায় মুসলমান সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনা করেছেন।

মুসলমান লেখকদের সাহিত্য রচনার কৌশল, রীতি, বর্ণনা-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংরূপের বৈচিত্র্যের স্বাদকে বদলে দিয়েছে বারে বারে। মুসলমান সাহিত্যিকরা কলম ধরেছেন পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে, হিন্দু সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাহিত্য রচনায় তাঁরাও এগিয়ে আসেন সমানভাবে কিন্তু যুগের বহমানতায় টিকে থাকার লড়াইয়ে মুসলমান সাহিত্যিকরা যেমন তাঁদের খ্যাতি হারিয়েছেন তেমনই তাঁদের রচিত সাহিত্যগুলিও জনপ্রিয়তার খাতিরে পাঠক সমাজ থেকে আজ বহুদূরে। বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলিম দুই জাতিই বাংলা সাহিত্যে নিজেদের স্বাক্ষর রেখেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বিষয়ে বলেন-

“When two communities live side by side, one always exerts some influence on the other in trivial or non-essential external matters. Culture, however is a comprehensive phenomenon and a matter of the heart-which expresses itself mainly through religious belief, social practices, law,

literature, philosophy, art etc of the people concerned. We have to find out the nature and extent of changes in all those aspects, if any, that were effected in the culture of the Hindu by contact with the Muslims.”<sup>১</sup>

বাংলা সাহিত্যে আমরা বিভিন্ন ধারার রচনাকর্ম পেয়ে থাকি। শুধুমাত্র হিন্দু সাহিত্যিকরাই একের পর এক ধারাকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করেননি, মুসলমান সাহিত্যিকদের দ্বারাও বিভিন্ন শ্রেণির রচনা রচিত হতে থাকে। অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় মালাধর বসু ভাগবতের বিষয়কে অবলম্বন করে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্য রচনা করেন। অন্যদিকে মুসলমান সাহিত্যিকরা আরবি-ফারসি-হিন্দি গ্রন্থ থেকে গল্পের বিষয়বস্তু বাংলায় অনুবাদ করেন, মুনশী আবদুশ্ শকুর রচিত ‘ছহী গুলে বকাওলী’ কাব্যটি হিন্দি গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। এই সময়ে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে রাজভাষা ছিল ফারসি, যা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছে এই ভাষা আয়ত্ত করার জায়গা ছিল। সাহিত্য সমাজের গতিতে এগিয়ে চলে তাই ভাষার এই সার্বজনীনতার কথা মনে রেখে মুসলমান সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনায় আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। সুকুমার সেন এ সম্পর্কে বলেছেন-

“সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে ধর্মকথাশ্রিত হইলেও সপ্তদশ শতাব্দের অধিকাংশ দীর্ঘ রচনায়-পুরাণের অথবা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ-অনুসরণ না হইলে বাহ্যত ধর্মের রঙটুকু মাত্র ফুটিয়াছে, অন্তরে ধর্মের রসটুকু ধরে নাই, অর্থাৎ দেবতার ভীতি যতটা আছে ভক্তি ততটা নাই। পরবর্তী শতাব্দের কয়েকটি বিশিষ্ট রচনায় দেবতার সম্বন্ধে উদাসীনতা আরও প্রকট হইয়াছে। সেখানে ভক্তি অত্যন্ত ফাঁকা এবং ভীতির স্থানে অভ্যস্ত সন্দ্রম ও প্রণতি। ধর্ম ও দেবতাকে একেবারে বাদ দিয়া (-নীতিতে নহে-) সপ্তদশ শতাব্দের কয়েকখানি প্রেমকথাময় আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছিল।”<sup>২</sup>

অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে বিদেশি শব্দবহুল কাব্য রচনার একটা ধারা মুসলমান সাহিত্যিকদের হাতে তৈরি হয়। বিভিন্ন নামের মধ্য দিয়ে এই সাহিত্য পরিচিত থেকেছে।<sup>৩</sup> বাংলার এক যুগসন্ধিক্ষণে এই মিশ্র ভাষারীতি’র কাব্যধারার সূচনা হয়েছিল মুসলমান সাহিত্যিকদের হাতে যা ঊনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত চলতে থাকে।

মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় এই ভাষারীতির ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তবে হিন্দু সাহিত্যিকদের রচনাক্ষেত্রেও এই ভাষার প্রভাবও লক্ষ্য করার মতো। মনসুর উদ্দীন এ বিষয়ে জানান সারা পৃথিবীতে প্রত্যেক বিজিত জাতিই বিজয়ী জাতির ভাষা থেকে অবাধে শব্দ গ্রহণ ও সঞ্চয় করেছেন এবং বিজয়ী জাতির নিয়ম প্রণালী ও জীবনযাত্রার সঙ্গে যে সমস্ত জিনিসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তা প্রত্যেকেই আত্মস্থ করে নেয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গণনায় নির্ধারিত হয়, প্রায় ২৫০০ আরবি-ফারসি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে।<sup>৪</sup>

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে গেলে তাই হিন্দু সাহিত্যিকদের পাশাপাশি মুসলমান সাহিত্যিকদের কথা অনায়াসেই উঠে আসে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে হোসেন শাহ গৌড়ের অধীনে থাকাকালীন বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে চট্টগ্রাম একটা কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। এই চট্টগ্রাম অঞ্চলের বেশ কিছু মুসলমান শিক্ষিত লোকজন আরাকানে বসতি গড়ে তোলে। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানের বেশিরভাগ রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, এই রাজাদের অনুরোধে বেশ কয়েকজন মুসলমান সাহিত্যিক কাব্য রচনা করেন। কাব্য রচনায় নিজেদের লেখার স্টাইল, শৈলীকে আঁকড়ে ধরেছেন। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনাশৈলীর ব্যাপারে জানা যায়-

“The Muslim poets unquestionably were influenced by the style and form of literature established in the Medieval period by the Hindu poets. Many of the poems bear descriptive titles which are clearly taken over from Hindu poetry. The use of the work *biav* and *pancali* which are common among Hindu writers of *Mahakavya* and *Mangal kavya* are found frequently in the titles of Muslim works. At the same time they introduced a large number of titles from Persian. Others were based on the name of the hero and heroine, or on the name of the theme. Thus the title *Keccha* and *Nama* like *Sikandarnama* or *Nasihata nama* are after the Persian style.”<sup>৫</sup>

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেশিরভাগই রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচনায় মুসলমান সাহিত্যিকরা এগিয়ে এসেছেন। এই প্রণয়কাব্যের পটভূমি হিসাবে আরবি-ফারসি-হিন্দি গ্রন্থের উল্লেখ করতে হয়। বাংলা রোমান্টিক প্রণয়কাব্যগুলো অধিকাংশই অনুবাদ হয়ে রচিত। হিন্দি-অবধী ভাষায় রচিত কিছু ভারতীয় কাহিনি এবং আরবি-ফারসি ভাষায় রচিত আরবি, ইরানি, কাহিনির অনুবাদ হয়েছে। ‘সয়ফুলমলুক বদিউজ্জামাল’, ‘জেবলমলুক শামারোখ’ কাব্যের উৎস ফারসি গ্রন্থ এবং ‘লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না’, ‘পদ্মাবতী’ ইত্যাদি কাব্যগুলি হিন্দি-অবধী গ্রন্থের অবলম্বনে রচিত হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত কাব্যগুলি বিভিন্ন সংরূপের আবেশে রচিত হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিকরা নারী-পুরুষের প্রণয় সম্পর্ক, ইসলাম ধর্মের কথা, নবিদের জীবন কাহিনি, কারবালার প্রসঙ্গ, শাস্ত্র-কথা, পীরকাহিনি ইত্যাদি এই রকম বহু বিষয়কে কেন্দ্রে রেখে নিজেদের নিপুণতা ও দক্ষতা দেখিয়েছেন কাব্য রচনায়। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাহিত্যিকরা নতুন ভাবধারা, বিষয়বস্তু ও ভাষার নতুন নতুন উপাদান ও ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে বিশ্বজনীনতা ও মানবতার আদর্শকে প্রচলন করেন। এই সমস্ত রচনা বঙ্গদেশের হিন্দু সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করে তোলে।<sup>৬</sup>

এই ইসলামি কাব্যের শ্রেণি অনুসারে বিভাজন এবং তার সামগ্রিক পরিচয় জানা খুব দরকার। বিভিন্ন সময়ে বহু সমালোচক, গবেষক এই বিষয় নিয়ে কাজ করার সুবাদে ইসলামি সাহিত্যের ধারাকে বিভিন্নভাবে বিভাজন করেছেন। সুকুমার সেন এই সাহিত্যকে কয়েকটি ভাগ করেছেন রোমান্টিক কাহিনি, নবীবংশ ও জঙ্গনামা, প্রণয়-গাথা, পীর-মাহাত্ম্য গাথা, পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য গাথা, শাস্ত্র-কথা ও শাড়ি, জারি, নাটগীত ইত্যাদি।<sup>৭</sup> আনিসুজ্জামান বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সাহিত্যের ধারাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ধারায় রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, দ্বিতীয় ধারায় ঐতিহাসিক জঙ্গনামা জাতীয় কাব্য এবং মুসলমান পীর-ফকির বা লৌকিক উপাখ্যান এবং ইসলাম ধর্ম-ইতিহাস-নবিদের জীবনকথা ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে রচনার কথা জানতে পারি।<sup>৮</sup> কাজী আবদুল ওদুদ মুসলমানের সাহিত্য চর্চাকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন অনুবাদ সাহিত্য, গাথা সাহিত্য ও মারফতী সাহিত্য।<sup>৯</sup>

আব্দুল মান্নান (Abdul Mannan) মুসলমান লেখকদের রচনাকে যেভাবে বিভাজিত করেছেন তা Narrative poems, Lyric poems, Instructive, or Didactic poems, Elegiac poems.<sup>১০</sup> অন্যদিকে ওসমান গনী মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনাকে প্রণয়গাথা, রোমান্টিক কাহিনি, শাস্ত্রকথা, দোয়া-তাবিজ ও হেকিমিশাস্ত্র, নবিবংশ কারবালা, নবিবংশ জঙ্গনামা, পীর-মাহাত্ম্য গাথা, শাড়ি-জারি ও নাটগীত ইত্যাদি পর্যায়ে মध्ये দিয়ে আলোচনা করেছেন।<sup>১১</sup> অন্যদিকে হিন্দু সাহিত্যিকরা মধ্যযুগে যে ধরনের সাহিত্য রচনা করেন তা লক্ষ করার মতো। তাঁরা মূলত দুই ধরনের লেখার উপর ফোকাস (Focus) করেন যেমন- Narrative (আখ্যানধর্মী) ও Lyric (লিরিকধর্মী)। Narrative বা আখ্যানধর্মী রচনার মধ্যে আমরা তিন ধরনের Stream বা ধারা লক্ষ করি যেমন- Mahakabya (মহাকাব্য), MangalKabya (মঙ্গলকাব্য), Biography (জীবনীকাব্য) এছাড়া লিরিকধর্মী রচনার মধ্যে পদাবলী সাহিত্যকে ধরা হয়। বাংলা সাহিত্যে পদাবলী রচনার ক্ষেত্রেও মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদান স্বীকার করার মতো।

বিভিন্ন লেখকের মতামতকে স্বাগত জানিয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজের অগ্রগতির জন্য বিশেষ কয়েকটি শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে নির্বাচিত সাহিত্যগুলিকে।

ক. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

খ. ধর্মীয় ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক রচনা

গ. জঙ্গনামা

ঘ. নীতিশাস্ত্রমূলক রচনা

ঙ. পীরকেন্দ্রিক সাহিত্য

চ. কিসসা/কেছা সাহিত্য

এই বিভিন্ন ধারার সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এবং এই পর্যায়গুলিতে কোন শ্রেণির সাহিত্যিকদের পাচ্ছি তা দেখার।

## ক. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

মুসলমান সাহিত্যিকরা সবেচেয়ে বেশি পরিচিত থেকেছেন রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনায়। এই শ্রেণির রচনার ক্ষেত্রে বহু সাহিত্যিক বিভিন্ন নাম ব্যবহার করেছেন অনেকেই ‘রোমান্টিক প্রেমকাব্য’, ‘রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান’, ‘রোমান্স কাব্য’, ‘প্রণয়-গাথা’, ইত্যাদি বলেছেন। মধ্যযুগীয় ঘরানায় একদম নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে এই শ্রেণির কাব্যধারা বজায় থেকেছে। এই প্রণয়োপাখ্যানের উপজীব্য হয়েছে নর-নারীর লৌকিক প্রেম, যা আমাদের অনেকখানি মুগ্ধ করে। এই শ্রেণির সাহিত্য রচনায় সাহিত্যিকরা আরবি-ফারসি গ্রন্থকে অবলম্বন করেছেন এছাড়া ধর্মগ্রন্থ থেকে কাহিনির বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন। কাব্যের কাহিনি নির্মাণ করে চরিত্রগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকথার মধ্য দিয়ে। মুসলিম সাহিত্যিকর প্রেমের উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে মানবচরিত্রকে একমাত্র জীবন্ত করে তুলেছেন, একেবারে লৌকিক জীবনের নর-নারীর প্রেম দিয়ে তাঁদের কাব্য ভরিয়ে তুলেছেন। মুহম্মদ আবদুল হাই মনে করেন-

“আরবী-ফারসীর প্রভাবেই বাংলা ভাষায় কল্পনাশ্রয়ী রোমান্টিক কাহিনীধারার সূচনা হয়। তাঁর মতে গোড় দরবারকে আশ্রয় করে পশ্চিমাঞ্চলের (পূর্বা হিন্দী ও ফারসী ভাষা থেকে) লৌকিক প্রণয়-কাব্যের ধারা বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়। এই রীতি শ্রীহট্ট চাটগাঁ আরাকান-রোসাঙ্গ রাজদরবারে গৃহীত হয়। সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভার আনুকূল্যে বহু মুসলমান কবি অনুবাদে মনোনিবেশ করেন। এঁদের অধিকাংশই চট্টগ্রাম ও রোসাঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।”<sup>১২</sup>

মুসলমান সাহিত্যিকরা প্রণয়কাব্য রচনায় বেশ কয়েকটি বিষয়কে কাব্যের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে কাব্যমূল্য অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছেন। ওয়াকিল আহমদ প্রণয়কাব্যের বৈশিষ্ট্য হিসাবে পাঁচটি উপাদানের কথা বলেছেন ১.মানবপ্রেম, ২.রূপ-সৌন্দর্য, ৩.যুদ্ধ ও অভিযাত্রা, ৪.অলৌকিকতা এবং ৫.আধ্যাত্মিকতা।<sup>১৩</sup> প্রণয়কাব্যের কাহিনি বর্ণনায় সাহিত্যিকরা কমবেশি এই উপাদানগুলির কথা বলেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রণয়কাব্যের আলোচনায় এই উপাদানগুলি কিভাবে এসেছে বিস্তারিত

জানব। এই পর্যায়ে রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের রচনাকার এবং তাঁদের রচিত কাব্য সম্পর্কে নিচে তালিকা তৈরি করা হয়েছে-

### রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের তালিকা

কবি	কাব্য	রচনাকাল
শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ-জোলেখা	পনেরো শতক
সাবিরিদ	বিদ্যাসুন্দর, হানিফা ও কয়রাপরী	ষোলো শতক
দোনা গাজী চৌধুরী	সয়ফুলমলুক বদিউজ্জামাল	ষোলো শতক
দওলত উজীর বাহরাম খাঁ	লাইলা মজনুন	১৫৭৫ খ্রিঃ
দৌলত কাজি	লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না	১৬২২-১৬৩৮ খ্রিঃ
কেশরী মাগন ঠাকুর	চন্দ্রাবতী	১৬৬০ খ্রিঃ
সৈয়দ আলাওল	পদ্মাবতী, সপ্তপয়কর	১৬৪৫-১৬৫২ খ্রিঃ
আবদুল হাকিম	ইউসুফ জলিখা, লালমতী সয়ফুলমলুক	১৬২০-১৬৯০ খ্রিঃ
নওয়াজিস খাঁ	গুল-ই-বকাওলী	---
মঙ্গলচাঁদ	শাহজালাল-মধুমালা	---
সাইয়িদ মুহাম্মদ আকবর আলী	জেবল মুলক শামারোখ	১৬৭৩ খ্রিঃ
মুনশী শাহ মুহাম্মদ গরীবুল্লাহ	ইউসুফ-যুলায়খা	১৬৫০ খ্রিঃ
শেখ সাদী	গদা-মল্লিকা	১৭১২ খ্রিঃ
মুহাম্মদ মুকীম	গুলে-বকাওলী, মৃগাবতী	১৭৭৩ খ্রিঃ
সাদেক আলী	মহব্বত নামা	অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে
মুনশী মালে মুহাম্মদ	ছয়ফুলমলুক ও বদিউজ্জামাল	বাংলা ১২৩৫ সাল
মুনশী মুহাম্মদ মীরন	বাহার দানেশ	বাংলা ১২৪৪ সাল
মুহাম্মদ খাতির	লাইলা মজনুন	বাংলা ১২৭১ সাল
মুনশী এবাদত আলী খাঁ	গোলে বকাওলি	---
খোন্দকার আহমদ আলী	কালু গাজী চম্পাবতী	ঊনবিংশ শতাব্দী
মুনশী আব্দুল ওয়াহাব	লায়লা মজনু	বাংলা ১২৮৭ সাল

সূত্র: তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে ওয়াকিল আহমদ রচিত ‘বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান’ এবং আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন রচিত ‘পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থগুলি থেকে।

### খ. ধর্মীয় ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক রচনা

মুসলমান সাহিত্যিকরা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনায় যেমন নিজস্বতার ছাপ রেখেছেন ঠিক সেইভাবেই পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম বৃত্তান্ত, জাতির ইতিহাস, এছাড়া ইসলামের প্রাণপুরুষ প্রচারক হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনকে কেন্দ্র করে যে আচার-রীতি-নীতি গড়ে ওঠে তা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে ব্যাপক পরিসরে। মধ্যযুগে আমরা লক্ষ করি চৈতন্যদেবের জীবনকে ঘিরে বিরাট আকারে সাহিত্য রচিত হয়েছে, যা ‘চৈতন্য জীবনী সাহিত্য’ এই নামে চিহ্নিত থেকেছে। ইসলাম ধর্মে নবিদের যে কাহিনি তাঁদের জীবনকে আদর্শ করে যে আচার-রীতি তৈরি হয়েছে তা ‘নবিকাহিনি’<sup>৪৪</sup> নামে পরিচিত হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিকরা বিভিন্ন নবিদের জীবন-ইতিহাসকে ঘিরে বহু কাব্য লিখেছেন, যে ইতিহাস ইসলামের আচার-অনুষ্ঠানকে তুলে ধরে। মুসলমান সাহিত্যিকরা পুরোপুরি ইসলাম ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে এই কাব্যগুলো রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। এই কাব্যগুলির ভিতর দিয়ে ইসলাম জাতির যে নিয়ম, রীতি-নীতি তার দিক বেশ স্পষ্ট হয়। এই শ্রেণির সাহিত্যিকদের নাম এবং তাঁদের রচিত কাব্যের তালিকা নিচে প্রস্তুত করা হয়েছে-

### ধর্মীয় ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক রচনার তালিকা

কবি	কাব্য	রচনাকাল
সাইয়িদ সুলতান	নবী বংশ	ষোড়শ শতাব্দী
শায়খ পরান	নূরনামা	ষোড়শ শতাব্দী
শাখয় মুত্তালিব	কিফয়াতুল মুচ্ছলীন, কায়দানী কিতাব	১৬৩৮ , ১৬৩৯ খ্রিঃ
কাজী হায়াত মাহমুদ	আম্বিয়া বাণী	১১৬৫ বঙ্গাব্দ
ব্রান উল্লা	কেয়ামতনামা	---
মুনশী আশরাফুদ্দীন	কেয়ামতনামা	১২৩৩-১২৪০ সাল
সাইয়িদ হাফীয আমানতুল্লাহ	কিয়ামত নামা	১২৪১ সাল



আলী রাজা	সিরাজ কুলুব	---
আব্দুন নবী	কোরআনের কায়দা	---
সাদেক আলী	হালতুলবী	---
শায়খ আমীরুদ্দীন আহমদ	মনসুর হাল্লাজ	১২৮২ সাল
মুনশী মুহাম্মদ খাতির	নূরনামা হুলায়ানামা, মিসফতাহুল জান্নাত	১২৭৮, ১২৮০ সাল
সাইয়িদ হাফীয	হিদায়াতুল ইসলাম	---
মুনশী মালে মুহাম্মদ	সেরাতল মোমেনীন	১২৯৬ বঙ্গাব্দ
মুনশী গোলাম মওলা	সোলতান জমজমা, হেদায়েতুল ইসলাম	১২৮৭, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ
মুনশী ফসীহুদ্দীন	মেছবাহুল এছলাম, মিনহাজুল ইসলাম	১২৭৯, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ
মুনশী ইরফান আলী	আখবারুল ঈমান	---
মওলানা আব্বাস আলী	জুমআর খুংবার	---
উমেদ আলী	তাকবিরাতুল ঈমান	১২৭০ বঙ্গাব্দ
মুনশী শাহ আব্দুল করীম	ফজীলতে হজ্জ, শ্রাবণ মুফীদুল ইসলাম	১২৯৩, ১৩০১ সাল
শাহ জোবেদ আলী	মেহরাজ নামা	উনবিংশ শতাব্দী
হাজী গরীবুল্লাহ	আরবা'ঈন হাদীস	১৩০৯ সাল

সূত্র: তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন রচিত ‘পুথি সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থ থেকে।

### গ. জঙ্গনামা

মুসলমান লেখকরা নিজেদের সাহিত্য রচনায় নিয়োজিত করেছিলেন যে সময়ের বাতাবরণে সেই সময় তাঁরা নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার যেমন বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন ঠিক তেমনভাবেই হিন্দু সাহিত্যিকদের দ্বারা তাঁরা এক রকমভাবে আবার প্রভাবিতও হয়েছেন। হিন্দুদের পুরাণ-পাঁচালির গল্প যেমন কাব্যে স্থান পেয়েছে ঠিক সেইভাবেই মুসলমান লেখকরাও নিজেদের ধর্মের ইতিহাসকে নিয়ে কাব্য রচনার কথা ভাবতে শুরু করেন। ইসলামে কাফের জাতির কথা, তাঁদের যুদ্ধের ইতিহাস এইসব বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বহু রচনা আমরা পাই। মূলত এই যুদ্ধকেন্দ্রিক কাহিনিনির্ভর কাব্যগুলিকে সাহিত্যিকরা ‘জঙ্গনামা’<sup>১৫</sup> এই নামে চিহ্নিত করেছেন। ‘জঙ্গনামা’ শব্দটি ফারসি ভাষার দুটি পৃথক শব্দ। ‘জঙ্গ’ অর্থাৎ যুদ্ধ এবং ‘নামা’ অর্থাৎ বিবরণ বোঝায়।<sup>১৬</sup>

ইসলাম জাতির ইতিহাস যদি আমরা জানি তবে দেখব শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়, এক বিরাট পরিমণ্ডলে যুদ্ধের ইতিহাসকে নিয়ে কিভাবে কাব্য রচনা হতে পারে তা মুসলমান সাহিত্যিকরা দেখিয়েছেন। মূলত ইহুদিদের সঙ্গে আরবদেশের যুদ্ধ হয়, কারণ তারা মুসলমানদের উর্দে গিয়ে উপহাস করত এবং ইসলামের মূলনীতি, নামাজ এবং 'কোরান' সম্পর্কে বিকৃত করে নানারকম নিরর্থক কথা বলত। হজরত মোহাম্মদের আদর্শকে ঘৃণার চোখে দেখে।<sup>১৭</sup> এই কাব্যের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারে বিরাট বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায়। যুদ্ধকাব্যে গালাগালি বা ভৎসনার ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। মনে করা হয় এই ধরনের ভাষা ব্যবহার যুদ্ধকাব্যের একটা অঙ্গ। যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে হীন পতিপন্ন করা এবং নিজেদের বীরত্ব ঘোষণা এই কারণে এইসব ভাষার ব্যবহার হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা এই ধারার সাহিত্যের ভাষার প্রয়োগের দিকগুলি জানব। জঙ্গনামা সাহিত্যের রচনাকার কারা ছিলেন এবং তাঁদের রচিত সাহিত্যগুলি সম্পর্কে নিচে তালিকা তৈরি করা হয়েছে-

### জঙ্গনামার তালিকা

কবি	কাব্য	রচনাকাল
জৈনুদ্দীন	রসূল বিজয়	পঞ্চদশ শতাব্দী
সাবিরিদ (শাহ বরীদ খান)	রসূল বিজয় বা জঙ্গনামা	ষোড়শ শতাব্দী
শেখ ফয়জুল্লাহ	জয়নালের চৌতিশা	ষোড়শ শতাব্দী
সাইয়িদ সুলতান	রসূল বিজয়, জয়কুম রাজার লড়াই	ষোড়শ শতাব্দী
নসরুল্লাহ খান	জঙ্গনামা	ষোড়শ শতাব্দী
শায়খ চান্দ	রচুল বিজয়	১৬১২ খ্রিষ্টাব্দ
শাহ মুহাম্মদ খান	মাকতাল হুসায়ন	১৬৪৫ খ্রিঃ
আবদুল হাকিম	কারবালা	---
শেরবাজ	কাসেমের লড়াই	অষ্টদশ শতাব্দী
গরীবুল্লাহ	জঙ্গনামা	---
কাযী হয়াত মাহমুদ	জঙ্গনামা বা মহরম পর্ব	১১৩০ সাল
সাদেক আলী	রদে কুফর	---
হামীদুল্লাহ খাঁ	গুলজারে শাহাদত	---

কুতবুদ্দীন খাঁ	হানিফার জঙ্গনামা	১২১১ সাল
মাওলানা আব্বাস আলী	ইরাক বিজয়, মিসর বিজয়	---
মুহাম্মদ খাতির	সুহরাবের ও রুস্তমের লড়াই	অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ
আব্বাস আলী মরহুম	সিরিয়া বিজয়, ইরাক বিজয়	উনবিংশ শতাব্দী
মুনশী জনাব আলী	শহীদে কারবালা	১২৬৮-১২৯৭ সাল
দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী	জঙ্গে খায়বার	১২৮৫ বঙ্গাব্দ
আলীমুদ্দিন গাইন	ভানুমতী বিবির লড়াই	১৩০১ সাল
মুনশী মোহাম্মদ	শহীদে কারবালা, বদীযুজ্জামার লড়াই	১৩০৭ সাল, ১৩১৮ সাল
মওলবী শায়খ	জঙ্গে রসূল ও জঙ্গে আলী,	১৩২০ সাল
শেখ আজহার আলী	জঙ্গে জয়নাল	১৩২১ সাল
মুনশী কোবাদ আলী	জঙ্গে হায়দার	১৩২২ সাল
মওলবী হাজী আমীনুল হক	ছহিহ বড় জঙ্গে কারবালা	উনবিংশ শতাব্দী

সূত্র: তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন রচিত ‘পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থ থেকে।

## ঘ. নীতিশাস্ত্রমূলক রচনা

মুসলমান সাহিত্যিকরা শুধুমাত্র রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের মতো কাব্য লিখেই নিজেদের স্থান বজায় রাখেন বাংলা সাহিত্যে এমনটা নয়, পাশাপাশি তাঁরা সাধারণ জনমানসে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে চলার উদ্দেশ্যে বেশকিছু ইসলামি শাস্ত্র সম্পর্কিত নীতি বা উপদেশকে অবলম্বন করে কিছু কাব্য রচনা করেন যা বাংলা সাহিত্যে ততটা স্থান না পেলেও সাহিত্যগুলো রচিত হয়েছে সময়ের হাত ধরে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কলকাতার প্রকাশকেরা ইসলামি শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ বার করতে থাকেন।<sup>১৮</sup> এই গ্রন্থগুলি ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষের মনে ব্যাপক সাড়া তৈরি করেছিল। আসলে আমরা রোমান্টিক কাব্যের পাঠ যেভাবে নিতে পারি, এই নীতিশাস্ত্রমূলক রচনার পাঠ সেইভাবে নিতে অভ্যস্ত নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কাব্যের জনপ্রিয়তার জায়গা কমে এসেছে, এই অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের জায়গাটা চিনে নিতে চাইছি এই রচনাগুলির প্রতি আলোকপাত করে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের অগ্রসরের জন্য আমরা এই ধরনের কিছু সাহিত্যকে বেছে নিয়েছি যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনায় অগ্রসর হব। এই অধ্যায়ে এই শ্রেণির সাহিত্যিকদের নাম এবং তাঁদের রচিত সাহিত্য সম্পর্কে জেনে নেওয়া হয়েছে তালিকা তৈরির মাধ্যমে।

### নীতিশাস্ত্রমূলক রচনার তালিকা

কবি	কাব্য	রচনাকাল
আফজল আলী	নসিহত নামা	ষোড়শ শতাব্দী
হাজী মুহাম্মদ	নূরজামাল	ষোড়শ শতাব্দী
শায়খ পরাণ	নসিহতনামা	ষোড়শ শতাব্দী
নসরুল্লাহ খান	শরিয়ৎনামা, মূসার সওয়াল, হিদায়াতুল ইসলাম	ষোড়শ শতাব্দী
শেখ চান্দ	কেয়ামত নামা, তালিবনামা	ষোড়শ শতাব্দী
আলাওল	তোহফা	সপ্তদশ শতাব্দী
আব্দুল হাকিম	শিহাবুদ্দীন নামা, নূরনামা, নসীহৎনামা	সপ্তদশ শতাব্দী
আব্দুন নবী	কোরআনের কায়দা	সপ্তদশ শতাব্দী
কাজী হায়াত মাহমুদ	হেতুজ্ঞান বা হিতজ্ঞান বাণী	১১৬০ সাল
মুহাম্মদ আলী	হযরাতুল ফিকহ	অষ্টাদশ শতাব্দী
হামীদুল্লাহ খাঁ	ত্রাণপথ	অষ্টাদশ শতাব্দী
মুনশী মালে মুহাম্মদ	তান্বিয়াতুল্লেসা	১২৭৩
মুহাম্মাদ খাতির	নসীহতুল মুসলিমীন	অষ্টাদশ শতাব্দী
মুনশী জনাব আলী	তান্বীছুল, জনাতুল ওয়ায়েযীন	১২৯৩, ১২৯৭ সাল
উমেদ আলী	তাকবিয়াতুল ঈমান	১২৭০ সাল
মওলবী আতাউল্লাহ সিদ্দীকী	হযরতুল ফেকাহ	১২৭৩ সাল
মুনশী বেলায়ত হোসেন	নিয়তনামা	১২৮৭ সাল
মুনশী শাহ আব্দুল করীম	মুফীদুল খালায়েক, মুফীদুল ইসলাম	১২৯০, ১৩০১
মওলানা এলাহী বখশ	দুররা-ই-মুহাম্মদী, জায়রুখ ফাসেকীন, হিদায়াতুল মুত্তাকীন	---
মুহাম্মাদ কাসিম	সিরাজুল কুলুব	১৭৯০ খ্রিঃ
মুনশী আমিরুদ্দীন	এশায়াতুল এছলাম, ফায়জুল এছলাম,	---

	সিরাজুল এছলাম, এজাযুল এছলাম, আমজাদুল এছলাম, আমীরুল এছলাম	
আবদুল গনী	আসরারুচ্ছলাত বা বার চান্দেদ ফজীলত	---
শায়খ কমরুদ্দীন	খয়রল হাশর	---

সূত্র: তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন রচিত ‘পুথি সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থ থেকে।

### ঙ. পীরকেন্দ্রিক সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে লৌকিক পীর-ফকিরকেন্দ্রিক সাহিত্যের জনপ্রিয়তা সুদূরপ্রসারী। জনশ্রুতি আছে হিন্দুর বেশ কিছু দেবতা মুসলমান সমাজে পীর এ রূপান্তরিত হয়। বাংলার সামাজিক পটভূমিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ধর্মের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই পীরদের সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন। গোটা বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক চালচিত্রের বদল হয়েছে এই পীরদের হাতে। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের মতো এই সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে মুসলমান সাহিত্যিকরা সাংস্কৃতিক দিকের প্রসার ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যে অবদানের জায়গা তৈরি করেছেন। গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল দিকই হল সাংস্কৃতিক দিকের কথাগুলোকে বার বার করে বলার, এই জায়গা থেকেই নির্বাচিত গ্রন্থ ধরে আমরা দেখব পীর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশে সাংস্কৃতিক দিকের কতখানি পরিসর তৈরি হচ্ছে এবং ধর্মীয় বাতাবরণকে নিঙড়ে ফেলে এই সাহিত্য কতখানি বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিতে পেরেছে। পীর কাহিনিকে নিয়েই তৈরি হয়েছে ‘পীর সাহিত্য’<sup>৯৬</sup> অনেকেই তা ভেবেছেন। বাংলা সাহিত্যে দেব-দেবীকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি পীর সাহিত্যগুলির মৌলিকতা বা ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি তাও বিবেচ্য।

মুসলমান সাহিত্যিক ছাড়াও হিন্দু সাহিত্যিক যাঁরা পীরকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করেছেন সেই সাহিত্যিকদের কথাও এখানে আলোচিত থেকেছে। পীর সাহিত্য রচনায় দুই ধরনের সাহিত্যিকদের মধ্যে লেখার শৈলী, ফর্ম, প্লট কতটা এক থেকেছে এই বিষয়টির প্রতিও নজর রাখা হয়েছে। মূলত সত্যপীর, গাজি পীর ও মানিক পীরের

মহাত্ম্যবিষয়ক কাব্যগুলি এই আলোচনার পরিসর তৈরি করেছে। মুসলমান সাহিত্যিকরা পীরকেন্দ্রিক অনেক কাব্য রচনা করেছেন। এ বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন-

“সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের দেবতার সঙ্গে কালু গাজির যুদ্ধ বৃত্তান্ত মুসলমানগণ কর্তৃক বাঙ্গালা বহু পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সত্যপীরের কথাও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পয়ারে অনেক মুসলমান লেখক বর্ণনা করিয়াছেন।”<sup>২০</sup>

এই অধ্যায়ে বিশেষ বিশেষ কবি/সাহিত্যিকদের নাম এবং তাঁদের রচিত সাহিত্যের তালিকা করা হয়েছে।

### পীরকেন্দ্রিক সাহিত্যের তালিকা

কবি	কাব্য	রচনাকাল
লালমোহন	সত্যপীর পাঁচালি চন্দ্রকেতু পালা	১২৭৫ সাল
শ্রীদয়াল	সত্যপীর পাঁচালি	১৩২০ সাল
জয়রদ্দি	মানিক পীরের জহুর নামা	১২২৪ সাল
শঙ্কর	হুকুম পীরের গীত	১২২৮ সাল
হৃদয়রাম	পীরের কালাম	১২২৭ সাল
জনার্দন ভট্টাচার্য	সত্যনারায়ণ-পাঁচালী	১১৭০ সাল
শ্রীকবিবল্লভ	সত্যনারায়ণের পুস্তক	১১৬২ সাল
অঞ্জাত	সত্যপীরের পাঞ্চালী	---
অঞ্জাত	সত্যদেব-পাঁচালী	---

সূত্র: তালিকাটি ওসমান গনী রচিত ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি’ এবং মুন্সী শ্রী আবদুল করিম সঙ্কলিত ‘বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ’ গ্রন্থগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে।

### চ. কিসসা বা কেছা সাহিত্য

মুসলমান সাহিত্যিকরা আরও এক ধরনের সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছেন। গ্রামবাংলার মানুষের জীবনদর্শনকে তুলে ধরেছেন তাঁদের লেখার মধ্যে দিয়ে যে সাহিত্য ‘কিসসা’ বা ‘কেছা’<sup>২১</sup> সাহিত্য এই নাম নিয়ে পরিচিত হয়েছে। কেছা কাহিনিগুলো মূলত বেশিরভাগ গল্পের ছলে বলা কাহিনি। মুসলমান

সাহিত্যিকদের হাতে যে কেচ্ছা কাহিনিগুলি লিখিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যায় অবশ্যই এগুলো গ্রাম্য জীবনের বহু দৈনন্দিন ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত। প্রতিনিয়ত জীবনে ঘটে চলা অনেক ঘটনার সমাহারের চিত্র এই কেচ্ছা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে, মূলত নারীদের জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোই কেচ্ছার সম্ভার। বিবাহিত নারী কিভাবে স্বামীর সঙ্গে সংসারজীবন যাপন করছে তার ছবি পরিস্ফুট হয়েছে, সতিন-জ্বালা কতটা প্রকট আকার ধারণ করেছে তা দেখা যায়। এছাড়া নারী-পুরুষের রোমান্টিকতার চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। অনেকসময় দেখা যাচ্ছে পীরদের নিয়ে বা পীরদের জীবনকে কেন্দ্র করে অনেক কেচ্ছা রচিত হয়েছে। এমনও কিছু কেচ্ছা আছে যার গল্পবর্ণনায় রূপকথার আঁচ পাওয়া যায়। তবে নারীদের কথাই কেচ্ছা কাহিনিতে বেশি মাত্রায় উঠে এসেছে। নারীদের প্রেম, দুঃখ, বেদনা, গর্ভধারণ, সাধ ভক্ষণ, বারমাস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন কেচ্ছা বা কিসসা মুসলমান সমাজের আদিরসের কাহিনি।<sup>২২</sup> কেচ্ছা কাহিনির গল্পের মধ্যে এমন ঘটনার কথা জানতে পারছি যা বাস্তবকে অতিক্রম করে অবাস্তবের দিকে হাত বাড়ায়। কেচ্ছায় বর্ণিত গল্পগুলির বাস্তবতা কতটা সে বিষয়ে পাঠক সমাজকে ভাবায়। বিভিন্ন অঞ্চলের লেখকরা নিজেদের সাধ্যমতো গ্রামাঞ্চলের বহু ঘটনাকে প্লট করে কাহিনি রচনা করেছেন যা ‘গ্রাম্য কিসসা’ হিসাবে প্রচলিত হয়েছে। কেচ্ছা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

“Kissa or Keccha are short stories translated from Perso-Arabic romances. Kissa traditional Pranayakavya (love tales) were written in Bengali using many Perso-Arabic words.”<sup>২৩</sup>

শুধুমাত্র যে একটি ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু করে পুরো কেচ্ছা রচিত এমন বলা খুব সহজ কথা নয়, বহু ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে আবার নতুন নতুন ঘটনা নিয়ে কেচ্ছা কাহিনি সম্পন্ন হয়েছে। কেচ্ছা কাহিনি হল কথায় কাহিনি বর্ণনা। অথবা বর্ণনামূলক গানের মধ্য দিয়ে কাহিনিকে তুলে ধরা, যেখানে দোহার মূল গায়ন।<sup>২৪</sup> সমাজের বাস্তব চিত্রকে নিগূঢ়ভাবে কবির তুলে না ধরলেও, অনেকক্ষেত্রেই ইসলামি জীবন, দর্শন, সেই

সম্প্রদায়ের নানান সংস্কৃতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন এই কেচ্ছা কাহিনিতে। বাংলা সাহিত্যের ধারায় মুসলমান সাহিত্যিকরা যখন নিজেদের লেখায় মগ্ন থেকেছেন, একদম লেখনীর প্রথমধাপ থেকে কেচ্ছা কাহিনি রচিত হতে শুরু করে। প্রথমদিকে অত জনপ্রিয়তা না মিললেও পরবর্তীসময়ে মূলত ‘দোভাষী রীতি’র সময় থেকে এর রচনা বাড়তে থাকে। তাই বলা যেতে পারে সময়ের হাত ধরে অন্যান্য সাহিত্যের পাশাপাশি কেচ্ছা সাহিত্যের জনপ্রিয়তা স্বীকার করার মতো। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত কেচ্ছা সাহিত্য মানেই শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে তা নয়। হিন্দুধর্মের বহু পুরাণকথাকে ঘিরে, রামায়ণের বিষয় নিয়ে কেচ্ছা রচিত হয়েছে। এই সাহিত্যের বিষয় নির্বাচন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, সব ধর্মের থেকে কাহিনি সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া পূর্ববঙ্গের লোককাহিনি থেকেও কেচ্ছার বিষয় নির্বাচিত হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা যায় বিশেষ বিশেষ ধারার মধ্য দিয়ে সাহিত্য রচনায় এগিয়ে এসেছেন। আসলে কোথাও থেমে থাকেননি, অনুসরণ, অনুকরণ আমরা যাই বলি না কেন একের পর এক সাহিত্য রচনা করে গেছেন। কেচ্ছা সাহিত্যের নিবিড়পার্শ্বের মধ্য দিয়ে তাঁর আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি তুলে ধরা হবে পরবর্তী অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে কবিদের নাম এবং তাঁদের রচিত সাহিত্যগুলির তালিকা নিচে দেওয়া হয়েছে।

### কিসসা বা কেচ্ছা সাহিত্যের তালিকা

কবি	কাব্য	রচনাকাল
মোহাম্মদ কবীর	মধুমালতী	১৫৮৮ খ্রিঃ
আব্দুন নবী	আমীর হামজার কিচ্ছা	১৬৮৪ খ্রিঃ
আরিফ	লালমোনের কথা	১৮৬৮ খ্রিঃ
শাহ মুহাম্মদ গরীবুল্লাহ	আমীর হামযা পুথি	১৬৫০ খ্রিঃ
শাকের মাহমুদ	মধুমালতী বা মধুমাল্লা- মনোহর	১৭৮১ খ্রিঃ
সৈয়দ হামযা/হামজা	মধুমালতী, হাতিম তাই	১৭৮২ খ্রিঃ, ১২১০ সাল
আবদুল জব্বার	গোলসানে রুম বা কেচ্ছা দেলখোস	১৮৯৬ খ্রিঃ



শেখ আমীরুদ্দিন	মনছুর হাল্লাজ ও সমছ তবরিজের কেছা	---
ওছিমুদ্দিন শাহা	কেছা অভয়দুর্লভ	---
আবদুল মতিন	ইছলাম-নবী কেছা	লিপিকাল ১৮৩৮
চুহর	মনোহর মধুমালতী, কেছা দেলারাম	---
মুহাম্মদ খাতির	বোন বিবি জহুরানামা, বড় তুতীনামার কেছা, মৃগাবতী যামিনীভান ও রুকমণি পরীর কিছা, জমজমা বাদশার কেছা	১২৮৭, ১২৯৭, ১২৯৮ সাল
বক্তার খাঁ	শুর্জ উজাল বিবির পুথি	১২৪৬-১২৫০ সাল
রওশন আলী	নিজাম পাগলার কেছা	---
মরহুম মুনশী মহাম্মদ	বড় নিজাম পাগলার কেছা	---
মওলবী হাজী আব্দুল মজীদ ভুঁইয়া	রংবাহার, দেল বোবা টারচামান	১২৬৮, ১২৯৬ সাল
মুনশী কামালুদ্দীন	বনবিবির পুথি	১২৮২ সাল
মুনশী রবীউল্লাহ	চৌদ্দ উজীর	১২৮৭ সাল
শাহ খোন্দকার	কেছা শাহে রুম	১৮৭৬ খ্রিঃ
মুনশী আয়েজুদ্দীন	পরীবানু শাহজাদী ও জামাল শাহজাদার কেছা, কেছা দেল পছন্দ, সতী বিবির কেছা	১২৮৮, ১২৯৯, ১৩০৬
মুনশী আবদুর রহিম	গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি	১২৮৫ সাল
শাহ জোবেদ আলী	রাজকন্যা মধুমালতী	১৩০১-১৩২৫ সাল
মরহুম কাজি সফিওদ্দিন	কাছাছোল আশ্বিয়া	১৩০১ সাল
মওলবী আবদুস সোবহান	হাবিল কাবিলের কেছা	১৩০৬ সাল
আবদুল রহমান	শুরঞ্জামাল-কেছা	---
মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার	ছরনূর বিবির কেছা	১৩০৬ সাল
মোহাম্মদ কোরবান আলী	সখিসোনার কেছা	১৩১৮ সাল
মুনশী ছেয়েদ নাছের আলী	কেছা আলেফ লায়লা	১৩৩৩ সাল
মফিজউদ্দিন আহমেদ	কেছা আলেফ-লায়লা	---

মহীউদ্দীন ওস্তাগর	পাঁড়য়ার কেছা/ সাশুফি সুলতান	---
গরীব তৈয়ব	আজদ্যার কেছা, গীত মদন গুড়িয়া	দুটি কাব্যের লিপিকাল আনুমানিক ১২০১ সাল
অধীন বালক, অধীন তৈয়ব, জয়রাম দাস	গরীব গদাই	লিপিকাল ১২০১ সাল
বালক মিঞা	পোস্তুক কেছা মানিক ছওদাগর	লিপিকাল ১২০১ সাল
গরীব বরকত	কেছা আলি অলি	লিপিকাল ১২০১ সাল
রাধাচরণ গোপ	ইমামের কেছা	লিপিকাল ১২৩৪ সাল
জয়রদ্দি	মানীকপীরের জহুরানাма	লিপিকাল ১২২৪ সাল

সূত্র: তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন রচিত ‘পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস’ এবং শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত ‘পুঁথি-পরিচয়’ (দ্বিতীয়, চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে।

মুসলমান সাহিত্যিকরা যে ধারার সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের পাঠককুলকে উপহার দিয়েছেন তার মূল্য অপরিমিত। এই অধ্যায়ে আমরা মুসলমান সাহিত্যিক রচিত আলাদা আলাদা ধারার কাব্যের সংরূপ সম্পর্কে জানতে পারি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে আমরা অনেক ধারার (যেমন- অনুবাদ, জীবনীমূলক, মঙ্গলকাব্য) সাহিত্য দেখতে পাই। তেমনই বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকরা পরিচিত থেকে গেছেন বিশেষ করে ‘রোমান্টিক প্রণয়কাব্য’ রচনার হাত ধরে। এই প্রণয়কাব্যে নায়ক-নায়িকাকে উপস্থিত করেছেন লৌকিক নর-নারীর আদলে, যা পার্থিব জগতের একদম সংলগ্ন পরিসরে বিরাজ করে। যেখানে নারীর মান-অভিমান-প্রেম একদম রক্তমাংসের নারীর সমতুল্য করে উপজীব্য করেছেন সাহিত্যিকরা। আসলে রোমান্টিক প্রণয়ের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে মধ্যযুগের মুসলমান নারীর প্রতিবাদ করার স্পর্ধা, প্রেমের জন্য আত্মবলিদান, সামাজিক ট্যাবুগুলোকে ভেঙে মুসলমান সংস্কৃতির নামে যাঁদের এক ধরনের গোঁড়ামি তার বিরুদ্ধতা করা হয়েছে। এছাড়া পীর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির বহমানতাকে টিকিয়ে রাখার এক প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে। মুসলমান সাহিত্যিকরা যে ধরনের সাহিত্য রচনা করেছেন তাতে বেশ কিছু আলাদা ধরনের

বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো এবং কাব্যের শুরুতেই তাঁরা ‘বন্দনা’ অংশের উল্লেখ করেছেন, যা মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করি, তবে ‘বন্দনা’র ক্ষেত্রে বিশেষ ধর্মের লোকজন বিশেষ বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে সৈয়দ আলি (Syed Ali) বলেছেন-

“Thus Muslims found it impossible to accept the invocation to Saraswati, the Muse of Poetry and fine arts or the invocation to gods and goddesses that we find in the opening of Mangala Kavvyas. They replaced these invocations by Hamd and Nat, the praise of God and the Holy prophet. This was a consistent practice of all Muslim writers of epics and long narratives.”<sup>২৫</sup>

‘বন্দনা’ ছাড়াও ‘হামদো নাত’ এই অংশের অবতারণা করে কাব্য শুরু করেছেন মুসলমান রচনাকারেরা। এই অংশে ইসলাম ধর্মের ধর্মগুরু, অন্যান্য নবিদের গুণকীর্তন করা হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টিজগত সম্পর্কে লেখকের চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়েছে। ‘বন্দনা’ অংশ ছাড়াও মধ্যযুগের সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় পয়ার ও ত্রিপদীর ব্যবহার করে কাব্যের যে প্লট তা বর্ণিত হয়েছে, প্রতিটি কাব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ শিরোনাম দিয়ে কাহিনির বর্ণনা করা হয়েছে। পয়ার এবং ত্রিপদীর ব্যবহার নিয়ে আব্দুল মান্নান (Abdul Mannan) এর কথায় জানা যায়-

“Both Hindu and Muslim poets employ the same metres in their narrative poetry, namely payar and tripadi. The payar metre consists of rhymed couplets, each line of which consists of fourteen syllables. The caesura normally falls at the end of the 8<sup>th</sup> syllable though positional variation is common. The two sections of the payar line are felt by Bengali critics to be quantitatively equal. The tripadi metre is a variation of payar. It too consists of rhyming couplets but each line is divided into three sections with a caesura after each. The first two sections in each line are linked by end rhyme. The greater part of narrative poetry was written in payar metre, tripadi being introduced as an occasional variation.”<sup>২৬</sup>

ইসলামি পুথি সাহিত্য হিসাবে যা পাওয়া যায় তার জনপ্রিয়তা একসময় কলকাতার ছাপাখানা থেকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই জায়গা থেকে বেশিরভাগ লেখা প্রকাশিত হয়েছে। মুসলমান লেখকরা প্রথমদিকে নিজেদের লেখা ছাপানোর জন্য কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় এসে হাজির হতেন দলে দলে। পরবর্তীতে কলকাতার চিৎপুর রোডের এক জায়গায় ‘বটতলা’ নামে ছাপাখানার জনপ্রিয়তা বাড়ে এবং এই প্রেসে হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মের লেখকদের বই প্রকাশক ছাপতে থাকেন। কলকাতার বহু জায়গায় মুসলমান লেখক রচিত বই পাওয়া গেলেও মূলত বটতলার প্রেস এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। জানা যায় কলকাতাতে মুসলমানদের দ্বারা স্থাপিত প্রেসের সংখ্যা তিনটি সবগুলিই শিয়ালদহে, মহম্মদ দেরাসতুল্লার মহাম্মদি যন্ত্র, কাদেরিয়া যন্ত্র ও রহমানি যন্ত্র। মুসলমান প্রকাশকেরা ধীরে ধীরে নিজেদের প্রেস ছেড়ে বটতলার প্রেসে এসে হাজির হতে থাকেন এবং ইসলামি যে পুথিগুলি এখান থেকেই প্রকাশ হতে থাকে। এই কারণে দোভাষী পুথি এই নামের পাশাপাশি এই সাহিত্যের ধারাকে ‘বটতলার সাহিত্য’ এই নামেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। গবেষণায় ব্যবহৃত বেশিরভাগ পুথির বই গাওসিয়া লাইব্রেরি এবং ওসমানিয়া লাইব্রেরি, ইসলামিয়া লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচিত কাব্য সেই সময়ে আপামর কলকাতার প্রান্তে ছড়িয়ে থেকেছে কিন্তু আজ এই সাহিত্যের প্রায় বিলীনপ্রায় অবস্থা। যাঁরা এই সাহিত্যের রসগ্রহণে আগ্রহী আশা রাখি পরবর্তীতে আরও কাজের জায়গা তৈরি হবে এবং নতুন নতুন দিকের উন্মোচন ঘটবে এই সাহিত্য ধারা নিয়ে।

### তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Majumdar. R.C, ‘History of Mediaeval Bengal’, Calcutta, G. Bharadwaj & co, 1973. P.254-255
২. সেন. সুকুমার, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড অপরাধ)’, কলকাতা, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৬৫। পৃ.৮

৩. ভাষাবৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করে এই ধারার কাব্যকে অনেকেই অনেক নাম দিয়েছেন। আনিসুজ্জামান ‘মিশ্র ভাষারীতির কাব্য’, জেমস লঙ ‘মুসলমানী বাংলা সাহিত্য’ [MUSALMAN BENGALI LITERATURE], ব্লুমহার্ড জেমস লঙ এর দেওয়া নাম ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ ব্যক্তির এই ধারার কাব্যকে বিভিন্ন নামে বা একই প্রচলিত নামে ব্যবহার করেছেন নিজেদের লেখায়। কলকাতার ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়েছে বলে এই ধরনের কাব্যকে ‘বটতলার পুঁথি’ নামেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪. মোহাম্মদ. মনসুরউদ্দীন, ‘বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের দান’, ‘মাসিক মোহাম্মদী’, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৫। পৃ.৭৩৮

৫. Kazi Muhammad. Abdul Mannan, ‘The Emergence and development of dobhasi literature in Bengal upto 1855 A.D, University of London, Proquest, 1964. P.65

৬. গনী. ওসমান, ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি’, কলকাতা, রত্নাবলী, ১৯৯৯। পৃ.৩৬

৭. সুকুমার সেন ইসলামি বাংলা সাহিত্য নিয়ে কাজ করার সুবাদে বিশেষ কয়েকটি শ্রেণিকে পর্যায়ভুক্ত করে সূচীপত্র নির্মাণ করেছিলেন।

সূত্র: সেন. সুকুমার, ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য’, কলকাতা, আনন্দ, ২০১২। (সূচীপত্র)

৮. আনিসুজ্জামান, ‘মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)’, ঢাকা, চারুলিপি, ২০১২। পৃ. ১১৫

৯. ওদুদ. কাজী আবদুল, ‘শাস্ত্রবঙ্গ’, কলিকাতা, সিগনেট বুকশপ, ১৩৫৮। পৃ.২৬২

১০. Kazi Muhammad. Abdul Mannan, ‘The Emergence and development of dobhasi literature in Bengal upto 1855 A.D, University of London, Proquest, 1964. P. 31

১১. গনী. ওসমান, ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি’, কলকাতা, রত্নাবলী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯। (সূচীপত্র)

১২. ঘোষ. কবিতা, ‘সপ্তদশ শতকের বাঙালির সমাজ ও সাহিত্য’, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪। পৃ.৩৮

১৩. আহমদ. ওয়াকিল, 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান', ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, জুলাই ২০১২। পৃ.৩৫

১৪. ইসলাম ধর্মে নবিদের জীবনকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তা 'নবিকাহিনি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৫. সুকুমার সেন বলেন- "জঙ্গনামা যুদ্ধকাহিনী, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মপ্রচারক আদি ইমামদের ইরান-বিজয় এবং আত্মকলহ-কাহিনী। কয়েকখানি জঙ্গনামার বিষয় কারবালার করুণকাহিনী। হাসান-হোসেনের মৃত্যু অভিমন্যুবধের মতই শোচনীয়। বাঙালী মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে এই কাহিনীর সমধিক আদর ছিল। সবচেয়ে পুরানো বাংলা জঙ্গনামা বোধ করি কবি মোহম্মদ-খানের 'মুজাল-হোসেন' (১০৫৬ হিজরী, ১৬৪৬ খ্রী)।"

সূত্র: সেন. সুকুমার, 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য', কলকাতা, আনন্দ, ২০১৩। পৃ.৪৫

১৬. জলিল মুহম্মদ. আবদুন (সম্পা.), 'শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জানুয়ারী ১৯৯১। পৃ.৩৯

১৭. করিম. আবদুল, 'ইসলামের ইতিহাস পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন (প্রাচীন সভ্যতা থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২০। পৃ.৪৭

১৮. সেন. সুকুমার, 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য', কলকাতা, আনন্দ, ২০১৩। পৃ.১৩২

১৯. গিরীন্দ্রনাথ দাস বলেছেন- "পীরগণকে কেন্দ্র করে যে বাংলা জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠেছে, সংক্ষেপে তা-ই পীর-সাহিত্য।"

সূত্র: দাস. গিরীন্দ্রনাথ, 'বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা', বারাসাত, শেহিদ লাইব্রেরী, এপ্রিল ১৯৭৬। পৃ.১১

২০. সেন. দীনেশচন্দ্র, 'বঙ্গভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব', 'মাসিক মোহাম্মদী', মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, কলিকাতা, চৈত্র ১৩৩৫। পৃ.৩৬৬

২১. জগদীশ নারায়ণ সরকার কেছা সম্পর্কে বলেন- "The punthis, kechchha kahini (stories of adventure)."

- সূত্র: Sarkar. Jagadish Narayan, 'Hindu-Muslim Relations in Bengal' (Medieval Period), Delhi, Idarah-I Adabiyat-i Delli, 2009. P. 6
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়. অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯-২০১০। পৃ.২৩৬
২৩. Mandal. Mousumi, 'Bonbibir Palagaan: Tradition, History and Performance' (Article), Sahapedia, 17 th March, 2017. P.(Introduction)
২৪. মণ্ডল. সুজিতকুমার (সম্পা.), 'বনবিবির পালা', কলকাতা, গাঙচিল, মার্চ ২০১০। পৃ.৩৫
২৫. Ashraf. Syed Ali, 'Muslim traditions in Bengali literature', Karachi University, Bengali Literary Society, 1960. P.8
২৬. Abdul Mannan. Kazi Muhammad, 'The Emergence and developmet of dobhasi literature in bengal up to 1855 A.D', University of London, Proquest, 1964. P.6

## তৃতীয় অধ্যায়

### মুসলিম বাংলা সাহিত্য: নিবিড়পাঠ ও বিশ্লেষণ (নির্বাচিত সাহিত্য)

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকরা বিভিন্ন ধারার কাব্য রচনায় নিজেদের পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এই সাহিত্যিকরা মূলত পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন এমন তথ্য উঠে আসে, তাঁদের রচিত সাহিত্যকর্ম ‘পুথি’ বা ‘ইসলামি পুথি’ এছাড়া ‘মুসলমানি বাংলা কাব্য’ এই নামে পরিচিত হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভে মূলত সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী এই সময়পর্বে মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত সাহিত্যগুলির বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনাসূত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিকরা কাব্য রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে আরব-পারস্যের কাহিনিকে যেমন গ্রহণ করেছেন, পাশাপাশি ইসলামি হাদিসের বিষয় নিয়েও কাব্য রচনা করেছেন। শুধুমাত্র ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার মধ্যে নিয়োজিত থেকে কাব্যপাঠ করলে কাব্যের সারবস্তু লঘু হবে, বরং সার্বজনীনতার ভিত্তিতে দেখলে পাঠ অনেক রসসিক্ত হবে। মুসলমান সাহিত্যিকদের কাব্য রচনার যে ধারা বহুমাত্রিকতার দিক দিয়ে সেই পরিসর অনেকটা। প্রথম থেকেই লেখার কৌশলকে করায়ত্ত করেছিলেন এই লেখকরা। বিভিন্ন ধারার রচনার মধ্য দিয়ে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁদের রচিত কাব্যগুলি শুধুমাত্র গল্পের বাতাবরণ দিয়ে ঘেরা নয়, আপাতদৃষ্টিতে একটা মূল থিম থাকলেও আসলে তার ভিতর দিয়ে লেখকরা সমসাময়িক সমাজে সংস্কৃতির যে ধারা তার দিকে আলোকপাত করেছেন এবং ওয়াকিবহল থেকেছেন। সমসাময়িক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে কাব্যগুলি মূলত রচিত, ফলে বহু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উঠে এসেছে লেখকের কথায়। কয়েকটি ধারার কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত আলোচনা এই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে।



## ক. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

মুসলমান সাহিত্যিকরা প্রণয়োপাখ্যান রচনার ক্ষেত্রে মূলত হিন্দি, আরবি, ফারসি গ্রন্থ থেকে নিজেদের কলাকুশলী প্রয়োগ করে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। প্রত্যেক সাহিত্যিক নারী-পুরুষের জীবনের প্রেমকে এক অন্যমাত্রায় গেঁথেছেন। একেবারে লোকজীবনের প্রেমের স্বরূপ এই রচনাকারদের লেখার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে, আমরা বেশ কয়েকটি কাব্য আলোচনায় এর সারমর্ম বুঝে নিতে চেয়েছি।

### লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না (দৌলত কাজি)

সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকানের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের অন্যতম দৌলত কাজি। জন্মসূত্রে ইনি আরাকানী নন, দৌলত কাজি চট্টগ্রামের সুলতানপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর রচিত কাব্যের নাম ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’, রচনাকাল (১৬২১-১৬৩৮ খ্রিঃ)। দৌলত কাজি কাব্য রচনা করেন রাজসভার অমাত্যপ্রধান আশরফ খানের অনুরোধে।

দৌলত কাজি’র কাব্যটি আপাতদৃষ্টিতে অনুবাদনির্ভর কাব্য। হিন্দি কবি মিয়া সাধনের ‘মৈনাসৎ’ কাব্যকে অনুসরণ করেছেন কাব্য রচনার ক্ষেত্রে, একথা কাব্যমধ্যেই স্বীকার করেছেন।

ঠেট চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।

না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।

দেশী ভাষা কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।

সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে।।

তবে কাজি দৌলতে বুঝিয়া আরতি।

পাঞ্চালী রচিয়া কহে মধুর ভারতী।। (পৃ.১১ )

দৌলত কাজি সাধারণ মানুষের উপযোগী করে বাংলায় প্রথম পাঁচালির ছন্দে ময়নার সতীত্বের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। কাব্যের ভগিতা অংশে নিজের সম্পর্কে তেমন কিছুই বলেননি। শুধুমাত্র নিজের নামটুকুই ব্যবহার করেছেন। ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’ কাব্যটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি- লোরচন্দ্রাণী, দ্বিতীয় খণ্ডটি-

সতীময়না। ১ম খণ্ডটির উৎস হিসাবে মওলানা দাউদ কর্তৃক রচিত ‘চন্দায়ন’ কাব্য এবং ২য় খণ্ডটির উৎস হিসাবে মিয়া সাধনের ‘মৈনাসৎ’ এই কাব্য দুটির উল্লেখ করতে হয়। দৌলত কাজি রচিত খণ্ডদুটির উৎস যেমন এক নয়, তেমন খণ্ডদুটিতে নামের পার্থক্য শুধু নয়, কাহিনিগত পার্থক্যও চোখে পড়ার মতো।

**লোরচন্দ্রাণী ও চন্দায়ন:** দৌলত কাজি তাঁর কাব্যের প্রথম খণ্ডটি মওলানা দাউদের রচনার অনুসরণ করে লিখেছেন। তবে হুবহু অনুবাদ করেননি, অনেক পরিবর্তন, পরিবর্জন ও নতুন কিছু সংযোজন এর মধ্য দিয়ে ‘লোরচন্দ্রাণী’ অংশটিকে নির্মাণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মওলানা দাউদের কাব্যের কাহিনি আমাদের জানা দরকার। দাউদের কাব্যটি আওয়াধী-হিন্দি কাব্যের অন্তর্গত। এই কাব্যটির মূল কেন্দ্রবিন্দু আহীর লোককাহিনিতে নিহিত আছে। মালিক নাথনের মুখে শোনা এই লোককাহিনিকে মওলানা দাউদ নিজের মতো করে ফুটিয়ে তুলেছেন।<sup>২</sup> ‘চন্দায়ন’ কাব্যটি সৃষ্টিকর্তার স্মৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে আরম্ভ হয়েছে।

পহিলে গাব্ উঁ সির্জন্‌হারা।

জিন্ সিরজা ইহ্ দেবস বয়ার।।

সিরজসি ধরতী ওঁর অকাসূ।

সিরজসি মেরু মঁদর কবিলাসূ।।

সিরজসি চাঁদ সুরজ উজিয়ারা।

সিরজসি সরগ নখত কা মারা।।<sup>৩</sup>

গৌড়ের রাজা সহদেবের অপরূপ, সুন্দরী কন্যা চান্দার জীবন ঘিরে এই কাব্য। চান্দা বৈবাহিক সূত্রে বাবন এর সঙ্গে আবদ্ধ হয় ৪ বছর বয়সে। বাবন নপুংসক হওয়ায় পরিণত বয়সে চান্দা নিজের সব সুখ চরিতার্থ করতে পারেনি। পুনরায় পিতৃগৃহে ফিরে এসে বাল্য সখীদের নিয়ে ব্যর্থ যৌবনের বিলাপ করে। এরই মধ্যে বাজির নামে এক সাধু চান্দাকে দেখে তার রূপে মূর্ছিত হয়। শুধু বাজির নয়, চান্দার রূপের প্রশংসায় রাজা রূপচাঁদ মুগ্ধ হয়। সহদেব ও রূপচাঁদ এর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। লোরক ও মৈনার দাম্পত্য জীবনের কথাও কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে দেখা যায় চান্দার রূপে লোরকও মুগ্ধ হয়। লোরক ও চান্দা উভয়ের মধ্যে এক প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে

দাসী বৃহস্পতির সহায়তায়। শেষে তারা গৌড় ত্যাগ করে, হরদী রাজ্যের দিকে এগিয়ে চলে। অবশেষে বাবন ও লোরের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতে লোরক চান্দাকে নিজের করে নেয়। অন্যদিকে মৈনা বিরহ জীবনযাপনে লিগু থেকেছে দীর্ঘদিন। কিন্তু শেষপর্যন্ত লোরক বাড়ি ফিরে নিজের মায়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং মা ছেলেকে ও দুই বধূকে গ্রহণ করে নেয়, এই ভাবেই দাউদের কাব্যটি শেষ হয়েছে।

অন্যদিকে দৌলত কাজির ‘লোরচন্দ্রাণী’ অংশটিতে একদিকে লোরক ও ময়না অন্যদিকে বামন ও চন্দ্রাণীর দাম্পত্য জীবনের কথা জানা যায়। একসময় স্ত্রীকে ছেড়ে লোরক সৈন্য সামন্ত নিয়ে বনবিহারে রওনা দেয়। পতিবিরহে ময়না বিলাপ করতে থাকে।

হাহা মোর পতি            দুর্লভ অতি

বিনোদ লোর রাজ্যেশ্বর। (পৃ.১৬)

ইতিমধ্যে এক জটাধারী যোগী রাজা লোরক এর কাছে গোহারি রাজ্যের বর্ণনা করতে থাকে। সেই রাজ্যের রাজা মোহরার রূপবতী কন্যা চন্দ্রাণী নপুংসক স্বামী বামন এর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ। চন্দ্রাণীর নিজের জীবনের এই পরিণতির জন্য দুঃখ কষ্টের শেষ নেয়।

হাহা বিধি কি করিমু কাকে দিমু দোষ।

মোর কর্মফলে পতি খর্ব কাপুরুষ।। (পৃ.২৯)

এক যোগীর মুখে চন্দ্রাণীর রূপের প্রশংসা শুনে লোরক চন্দ্রাণীর দর্শন পেতে গোহারি রাজ্যে উপস্থিত হয়। দাসী বুদ্ধিশিখার সহযোগিতায় অনেক চেষ্টার পর এক মন্দিরে দুজনের সাক্ষাৎ হয়। দুজনের মধ্যে প্রণয়সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবশেষে গোহারি দেশ ত্যাগ করে দুজনেই পালিয়ে যায়।

লোকে দোষ শুনি করিবেত্ত পরাভব।।

সেই ভাল তুম্বি আক্ষি যাই দেশান্তর। (পৃ.৭১)

বামন সমস্ত ঘটনা শুনে লোরকের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে চন্দ্রাণীকে ফিরে পেতে। বামন পরাজিত হয়ে হেরে গেছে। শেষপর্যন্ত লোরক চন্দ্রাণীকে নিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করেছে গোহারিতে। এইভাবেই কাব্য শেষ হয়েছে। দুটি কাব্যের কাহিনি মোটামুটি

একই। কিন্তু চরিত্র নামের বদল ঘটেছে বেশ কিছু ক্ষেত্রে, আবার কিছু চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে।

চন্দায়ন	লোরচন্দ্রাণী
লোরক	লোর/লোরক
মৈনা	ময়না
চান্দা	চন্দ্রাণী/চান্দা
বাবন	বামন
বাজির (সাধু)	নেই
মিত্রকণ্ঠ (সারথি)	নেই
বিদ্যাদনী (প্রতারক)	নেই
বৃহস্পতি (ধাই/দাসী)	বুদ্ধিশিখা (ধাই/দাসী)
রূপ চান্দ/রূপচাঁদ (রাজা)	নেই
কঁবরু/কবুর (মৈনার ভাই)	নেই
অজয়ী (লোরের ভাই)	নেই

চরিত্র নাম ছাড়াও কাহিনির কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন হয়েছে।

১. মওলানা দাউদের কাব্য শেষ হয়েছে লোরক ও তাঁর দুই স্ত্রী (মৈনা-চান্দা)কে নিয়ে নতুন করে সংসার শুরু করার মধ্য দিয়ে কিন্তু দৌলত কাজি তাঁর কাব্যমধ্যে এইরকম বর্ণনা করেননি। লোরক চন্দ্রাণীকে নিয়ে গোহারী রাজ্যে থেকে যায়।

২. দাউদের কাব্যটিতে চান্দার রূপের বর্ণনা শুরুতেই করেছেন তবে এই রূপ বর্ণনা একটু বিক্ষিপ্ত। এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন। চান্দার সীমন্তের বর্ণনা করেছেন এইভাবে-

পহলে মাঁগ ক কহউঁ সোহাগু।  
 জাঁহিঁ রাতা জগ খেলৈ ফাগু।।  
 মাঁগ চীর সর সেংদুর পূরা।  
 রেংগ চলা জনু কানকেজুরা।।<sup>৪</sup>

অন্যদিকে দৌলত কাজির কাব্যে ময়নার রূপের বর্ণনা আগে পাওয়া যায়।

শরীরের প্রতিটি অঙ্গের সুন্দরভাবে বিবরণ তুলে ধরেছেন।

চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপলগঞ্জ।

দৃগাঞ্জন শরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জ।। (পৃ.১২)

৩. 'চন্দায়ন' কাব্যে চান্দাকে পেতে লোরকে (রূপচাঁদ, বাবন, বিদ্যাদানী ও টুঁটা যোগী)র সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্যে লোরক চন্দ্রাণীকে পেতে কেবলমাত্র বামন এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত বামনকে পরাজিত করে লোর জয়ী হয়েছে।

৪. দাউদের কাব্যে চান্দাকে সর্পদংশন করে তিনবার কিন্তু দৌলত কাজি তাঁর কাব্যে একবার চন্দ্রাণীর সর্পদংশন এর উল্লেখ করেছেন এবং চন্দ্রাণীর জীবন ফিরে পেতে মহাভারতের স্বর্ণস্তম্ভ উপাখ্যানের বর্ণনা করেছেন, যা দাউদের কাব্যে নেই।

৫. 'চন্দায়ন' কাব্যে ময়নার অষ্টমাসী বিরহ বর্ণনা করেছেন, শ্রাবণ মাস থেকে শুরু করে চৈত্র মাস পর্যন্ত ময়নার বিরহ জীবনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন, যা দৌলত কাজির 'লোরচন্দ্রাণী' অংশে নেই। তবে কাব্যে ময়নার বারমাসী বিরহ প্রসঙ্গ আছে।

**সতীময়না ও মৈনাসৎ:** দৌলত কাজি রচিত কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডটির নাম 'সতীময়না'। এই অংশের কাহিনি হিন্দি কবি মিয়া সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্যের অনুসরণে লিখিত। মিয়া সাধন রচিত 'মৈনাসৎ' কাব্যে বরণাপুরীর লালনশাহ নামে মহাজনের কথা জানা যায়। এই লালনশাহ মৈনার সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে লিপ্ত। একসময় বাণিজ্যসূত্রে লালনশাহ পারাদ্বীপে যাত্রা করে স্ত্রীকে ঘরে রেখে। লালনশাহ একবছর পর ফিরে আসবে এই সংকল্পে অটল থেকে মৈনা স্বামী বিরহে জীবনযাপন করতে থাকে। ইতিমধ্যেই এক কুমার (সতন) মৈনার রূপে মুগ্ধ হয় এবং মৈনাকে পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকে। রত্না মালিনী নামে এক ধাই মৈনাকে সতনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা জানায়। কিন্তু মৈনা এই প্রস্তাবে নারাজ। এরপর মৈনার বারমাসী বর্ণনার কথা জানা যায়। শেষপর্যন্ত লালনশাহ ফিরে এলে মৈনা মালিনীকে শাস্তি দেয়।

অপরদিকে ‘সতীময়না’ কাব্যের প্রথমেই চন্দ্রাণী ও লোরকের প্রণয় সম্পর্কের কথা জানা যায়। তারা গোহারী রাজ্যে সুখে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। অন্যদিকে পতিবিরহে ময়না দিনের পর দিন বিলাপে মগ্ন থেকেছে। এই অবস্থায় রত্না মালিনী (ধাই) রাজার ছেলে ছাতনকুমার এর কথা ময়নাকে জানায়। বিভিন্নভাবে ময়নাকে প্ররোচিত করে। কিন্তু ময়না স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে দীর্ঘসময় বিরহ জীবনযাপন করেছে। ময়নার বারমাসী বর্ণনার মধ্য দিয়ে কাব্যটি শেষ হয়েছে। আষাঢ় মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস এই দীর্ঘ সময়ের দুঃখ যন্ত্রণার কথা ফুটে উঠেছে এই বারমাসী বর্ণনায়।

প্রথম বারিষা দেখ প্রবেশে আষাঢ়।

বিরহিণী বিরহ বাড়ায় অতি গাঢ়।। (পৃ.১১০)

আমরা কাব্যপাঠে দেখতে পাই ময়না স্বামীর সঙ্গে পরলোকে মিলনের কথা ভেবেছে। আসলে স্বামীর প্রতি যে অবিচল নিষ্ঠা, পরমভক্তি, নিগূঢ় প্রেম তার সবকিছুর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ময়না চরিত্রের মধ্য দিয়ে। দীর্ঘসময় অপেক্ষার পরেও স্বামীর দর্শন না পেয়ে পরলোকে মিলনের কথা ভাবতে থেকেছে ময়না। আমরা এই কাব্য অংশে দুই নারীর রূপ দেখতে পাই, এক নারী সামাজিক বেড়াজাল অতিক্রম করে প্রেমিকের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে আর এক নারী স্বামীকে দীর্ঘদিন না পেয়ে তার প্রতি যে ভালোবাসার চিহ্নকে ঐঁকেছেন তা সত্যিই কাব্যের মূল্য অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। দুটি কাব্যের কাহিনি আপাতভাবে এক হলেও অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও সংযোজন লক্ষ করা যায়। কাব্যমধ্যে চরিত্র নামের পার্থক্য দেখা যায়।

মৈনাসং	সতীময়না
লালনশাহ	লোরক
মৈনা	সতীময়না/ময়নাবতী
সতন	ছাতন
রতনা মালিনী	রত্না মালিনী
নেই	চন্দ্রাণী
নেই	রাজা মোহরা

দুটি কাব্যের ক্ষেত্রে বেশকিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়-

১. মিয়া সাধন তাঁর কাব্যের শুরুতেই সৃষ্টিকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন যা দৌলত কাজির কাব্যের এই খণ্ডে নেই।
২. 'মৈনাসৎ' কাব্যে লালনশাহ ও মৈনার জীবনের কথা এসেছে কিন্তু সতীময়নাতে ময়না, লোরক, চন্দ্রাণীর ত্রিকোণ সম্পর্কের কথা জানা যায়।
৩. একদিকে লালনশাহ মহাজন অন্যদিকে লোরক রাজা এই পরিচয় পাচ্ছি।
৪. লালনশাহ একবছর পর ফিরে আসার কথা মৈনাকে জানালেও 'সতীময়না' অংশে লোরক এমন কোনও কথা ময়নাকে বলেনি।
৫. সাধনের কাব্যে পত্রবাহক এর উল্লেখ এসেছে যা দৌলতের কাব্যে নেই।

দৌলত কাজি দুজন কবির কাব্যের কাহিনি কথাকে একসঙ্গে যুক্ত করে 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' কাব্যটি রচনা করেন। অনুবাদমূলক সাহিত্যকর্ম রচনায় দৌলত কাজি এগিয়ে এলেও কোনও কাব্যেরই হুবহু অনুবাদ করেননি। নিজস্ব চিন্তা ভাবনার প্রতিফলনের চিত্র কাব্যে ধরা পড়েছে। সুকুমার সেন 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' কাব্য নিয়ে মতামত প্রকাশ করে বলেন-

"The story had been adopted in folk-song and dance, and the mention of 'Lorik Dance' in an early fourteenth century Maithil work indicates that it was a popular amusement in North Bihar in the fourteenth century. The Lorik song is now popular in South Bihar (where the story has assumed the form of a saga), especially among the Ahirs. But the story of Lorik as now current in South is not its original form. The story was probably not very well known in Bengal. Daulat Kazi took it from the old Rajasthani poem by sadhan, manuscript of which have come to light recently."<sup>৫</sup>

দৌলত কাজি সপ্তদশ শতাব্দীর এমন একজন কবি যিনি কাব্যমধ্যে একসঙ্গে অনেক কথার বুনন রচনা করে গেছেন। কাব্যপাঠে মনে হয়েছে সময় সম্পর্কে বেশি সচেতন। কাব্যে কালিদাস, জয়দেব প্রমুখ কবিদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে রামায়ণ, মহাভারত প্রসঙ্গ এসেছে। এছাড়াও ইসলাম ধর্মসম্পর্কিত ভাবনা মাথায় রেখে

গোটা কাব্যটি রচনা করেছেন। কবি কাব্যটিকে দুটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন ঠিকই কিন্তু নিজের ভাবনার জগৎ থেকে সরে আসতে পারেননি। লক্ষ করা যায় ‘সতীময়না’ অংশের প্রথমেই চন্দ্রাণী ও লোরকের গোহারি রাজ্যে সুখে দিনযাপনের কথা এসেছে। পুরো কাব্যটিকে একই কাহিনির সূত্র ধরে বর্ণনা করে গেছেন। কাব্য রচনায় দৌলত কাজি এককভাবে কোনও একজন কবির দ্বারা প্রভাবিত হননি। শুধুমাত্র অনুবাদের ক্ষেত্রে কাহিনির কাঠামোকে অনুসরণ করেছেন, বাকি অংশে নিজের বৈদগ্ধ্য ভাবনা এবং কলা-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

### পদ্মাবতী (আলাওল)

সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের মধ্যে আলাওল এর নাম উঠে আসে। বিশেষভাবে আরাকান রাজসভার সাহিত্য এঁদের হাতেই অনন্য মাত্রায় ভরে ওঠে। মালিক মুহম্মদ জায়সীর অবধী-হিন্দি ভাষার কাব্য ‘পদ্মাবতী’, এই কাব্যের বিষয়বস্তুকে মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল বাংলায় অনুবাদ করেন। ‘পদ্মাবতী’ কাব্যটির রচনাকাল (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রিঃ)।

**কাহিনি সংক্ষেপ:** আলাওল রচিত ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে দুটি কাহিনির সমাবেশ ঘটেছে। একদিকে বর্ণিত হয়েছে নাগমতি-পদ্মাবতী-রত্নসেনের প্রেমকাহিনি। অন্যদিকে প্রেমের উপাখ্যান নির্মিত হলেও রত্নসেন-আলাউদ্দীন-পদ্মাবতীর জীবনকে ঘিরে তৈরি হয়েছে যুদ্ধের পরিবেশ। এই কাব্যটিতে নারী-পুরুষের প্রেমের স্বরূপ কতখানি নির্মাণ করে গেছেন আলাওল সেই দিকটিকেই মূলত আলোচনা করা হয়েছে। জায়সীর কাব্যের প্রসঙ্গ কাব্য-বর্ণনায় এসেছে কিন্তু এই অধ্যায়ে আলাদা করে দুজন সাহিত্যিকের কাব্যের তুলনামূলক বিচারের দিকটিতে অগ্রসর না হয়ে রোমান্টিক প্রেমের আখ্যানকে তুলে ধরা হয়েছে। মোট ৫৬টি খণ্ডের মধ্য দিয়ে কাব্যের পুরো কাহিনিকে নির্মাণ করেছেন নিজস্ব মুগ্ধিয়ানায়। প্রত্যেকটি খণ্ডের আলাদা আলাদা নামকরণ করেছেন।



কাব্যের শুরুতেই 'স্তুতি খণ্ড' অংশে আল্লাহ'র বন্দনা এবং জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে রচনাকারের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত হয়েছে। সৃষ্টির প্রথমে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কেমন ছিল, কিভাবে বিশ্ব চরাচরে সবকিছু তৈরি হচ্ছে তার ধারণা আমরা এই কাব্যে পাই।

বিছমিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথমে।  
আদ্য মূল শির সেই শোভিত উত্তমে।।  
সৃজিলেক দিবাকর শশি দিবারাতি।  
সৃজিলেক নক্ষত্র নির্মল পাতি পাতি।।  
সৃজিলেক শীত গ্রীষ্ম রৌদ্র ছায়া আর।  
করিলা মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চর।। (পৃ.১)

এই সময়ের সাহিত্যিকদের ঈশ্বর সম্পর্কিত একইরকম মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই স্রষ্টা। ঈশ্বরকে নিরঞ্জন স্বরূপ ধারণায় গেঁথেছেন। আলাওল কাব্য রচনায় প্রাণপুরুষ হজরত মোহাম্মদ, সিদ্দিক পীর, উমর, ওসমান, হজরত আলি সহ সকলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। 'কবি পরিচয়' এই অংশে জাইস নগরে বসবাসকারী বংশপরম্পরার কথা উঠে এসেছে। সিদ্দিক, সৈয়দ আশরফ, হাজি শেখ, শেখ কামাল, শেখ মবারক, শেখ বোরহান, শেখ এলাদাদ, সৈয়দ মহাম্মদ এর নাম পরম্পরাসূত্রে জানা যায়। 'রোসাঙ্গ বর্ণনা' অংশের মধ্য দিয়ে জানা যায় সাদ উমংদার বা খদোমিস্তার এর রাজত্বকাল পর্বে (১৬৪৫-১৬৫২) আলাওল কাব্য রচনা সম্পন্ন করেন। পাশাপাশি রোসাঙ্গ রাজ্যের প্রসঙ্গ তুলে এই রাজ্যে নানা দেশের মানুষের সমাগমের কথা জানিয়েছেন।

নানা দেশী নানা লোক            শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ  
আইসেস্ত নৃপ ছায়াতল।  
আরবী মিসরী শামী            তুরকী হাবশী রুমী  
খোরাসনী উজবেগী সকল।। (পৃ.১৩)

আলাওল 'মাগন প্রশস্তি' অংশে মাগন ঠাকুরের প্রশংসা করেছেন। তাঁর সুন্দর দৈহিক কাঠামোর বর্ণনা আমরা এই অংশেই পেয়ে থাকি। 'আত্ম-পরিচয়' অংশের মধ্য

দিয়ে আলাওল নিজের জন্মস্থান, রোসাঙ্গ দেশে বসবাসকারী মানুষের উপযোগ্য করে ‘পদ্মাবতী’ কাব্য রচনার কথা বলেন।

এহি পদ্মাবতী রসে রচ রসকথা।  
হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিয়াছে পোথা।।  
রোসাঙ্গত অনেকে না বুঝে এই ভাষা।  
পয়ার রচিলে পুরে সভানের আশা।। (পৃ.২১)

এই কাব্যের প্রথম কাহিনি অংশ ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্ককে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। সিংহল দ্বীপের রাজা গন্ধর্বসেন ও রানি চম্পাবতীর কন্যা পদ্মাবতী। রূপে গুণে দ্বীপের সকলের প্রিয় এই কন্যা। পদ্মাবতীর প্রিয় শুকপাখি (হীরামণি) কিশোরী বয়সে তাকে প্রেমের রসকথা শোনাতে থাকে।

নিত্য শুকসঙ্গে রসকথা সুমধুর।  
হৃদয়ে জন্মিল কিছু প্রেমের অঙ্কুর।। (পৃ.৪২)

শুকপাখির আচরণে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে এই পাখিকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেয়। এই পরিস্থিতিতে শুকপাখি নায়িকাকে ছেড়ে বনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বনের ভিতর ব্যাধের পঞ্চবাণ নিক্ষেপে শুকপাখি জ্ঞান হারায়। অন্যদিকে চিতোর দুর্গের চিত্রসেন রাজার পুত্র রত্নসেন, নানা শাস্ত্র, গুণে ও রূপে মহাভাগ্যবন্ত বীর। ভাগ্যক্রমে এই দুর্গের এক ব্রাহ্মণ বণিক সিংহল দ্বীপে বাণিজ্যযাত্রায় যায়। এই দ্বীপের হাটে শুকপাখিকে ব্যাধ বিক্রির জন্য আসে। চতুর ব্রাহ্মণ সেই শুকপাখিকে কিনে নিয়ে চিতোর দুর্গে হাজির হয়। একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রায় এই পাখিকে রত্নসেন কিনে নেয়। এরপর কাহিনি অন্যদিকে মোড় নেয়। শুকপাখির মুখে পদ্মাবতীর রূপের বর্ণনায় রত্নসেন অস্থির হয়ে ওঠে। অন্যদিকে রত্নসেনের স্ত্রী (নাগমতী) বিলাপ শুরু করে স্বামীকে হারানোর ভয়ে। দুর্গের দাসী, ধাই সকলকে ডেকে শুকপাখিকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে।

হলাইল বিষাক্তুর মোর হৈল পাখী।  
সর্বসুখ ভ্রষ্ট হৈব যদি তাকে রাখি।। (পৃ.৬২)

এক বুদ্ধিমতী ধাই শুকপাখিকে হত্যা না করে নাগমতীর আড়ালে এই পাখিকে লুকিয়ে রাখে। ঘটনাপরম্পরায় রত্নসেন শুকপাখির মুখে পদ্মাবতীর রূপের পুঞ্জানুপুঞ্জ বর্ণনা শুনে তার প্রেমে অস্থির হয়ে ওঠে।

শুনিয়া কন্যার রূপ নৃপ উল্লসিত।

প্রেমভাবে শরীর হইল পুলকিত।। (পৃ.৬৬)

এই কাব্যে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা অংশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। ‘নখ-শিখ-বর্ণন’ এই রীতিতে রূপের বিস্তর বিবরণ আছে। শেষপর্যন্ত রত্নসেন প্রায় প্রেম উন্মাদনায় অস্থির জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। নিজের প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে সিংহল দ্বীপে পাড়ি দেয়। এই দ্বীপে রত্নসেন পোঁছে পদ্মাবতীকে দেখার ইচ্ছায় বিভিন্ন শাস্তির সম্মুখীন হয়। কিন্তু কোনও বাঁধা তাকে আটকে রাখতে পারেনি। পুনরায় শুকপাখি সিংহল দ্বীপে ফিরে এসে পদ্মাবতীকে চিতোর দুর্গের রাজা রত্নসেনের কথা জানায়। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে রাজা রত্নসেন পদ্মাবতীকে বিয়ে করে। সমস্ত ভেট সহযোগে পদ্মাবতীকে নিয়ে সিংহল দ্বীপ পরিত্যাগ করে রত্নসেন চিতোরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

স্বামী বিরহে নাগমতী দীর্ঘ বারোমাস বিরহ জীবনযাপন করে। এই কাব্যে নাগমতীর বারমাসী বর্ণনার সুন্দর চিত্র নির্মাণ করেছেন। পদ্মাবতীকে নিয়ে রত্নসেন চিতোরে প্রবেশ করলে নাগমতী অভিমানে স্বামীকে তিরস্কার বাণে বিদ্ধ করে। শেষে দুই সতিনের মিলনের মধ্য দিয়ে এই কাব্যের একটা পর্ব শেষ হচ্ছে।

দুই সতিনের মধ্যে বাড়িল পিরীত।

স্বামী সেবা করে দোহ হইয়া একচিত।। (পৃ.২৬২)

দ্বিতীয় কাহিনি অংশটিতে প্রেমকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। চিতোর দুর্গে রাঘব চেতন (ব্রাহ্মণ) রত্নসেনসহ সকলকে ছলচাতুরী করে মায়াচাঁদ দেখায়। শাস্তিস্বরূপ এই দুর্গ থেকে ব্রাহ্মণকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পদ্মাবতী সেই ব্রাহ্মণকে প্রাপ্য দানটুকু মিটিয়ে দেয়। অন্যদিকে দিল্লির সুলতান আলাউদ্দীন এর সঙ্গে রাঘব চেতনের সাক্ষাৎ হয়। পদ্মাবতীর রূপগুণের কথা ব্রাহ্মণ আলাউদ্দীনকে জানায়।

সুলতান আলাউদ্দীন পদ্মাবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনরত্ন দান করে। সুলতান নিজের রাজ্য থেকে এক বিপ্রকে পত্র প্রেরণে পাঠায় চিতোর দুর্গে। পত্র পেয়ে রত্নসেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং প্রত্যাগরে তাকে নানাভাবে তিরস্কার করে। আলাউদ্দীন পদ্মাবতীকে না পেয়ে অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করে এবং চিতোর দুর্গে প্রবেশ করে। রত্নসেনকে বন্দি করে সুলতান রাজধানীতে ফিরে আসে। স্বামীর চরম দুর্দশার কথা জানতে পেরে পদ্মাবতী-নাগমতী বিলাপ করে।

আহা প্রভু প্রাণেশ্বর            মোরে কৈলা একেশ্বর  
নানামতে প্রেম বাড়াইয়া।  
কেমতে ধরাইমু হিয়া            তুমি প্রভু না দেখিয়া  
কোথা গেলা নিদয় হইয়া।। (পৃ.৩২৩)

শেষপর্যন্ত পদ্মাবতীর অনুরোধে গোরা ও বাদল সেনাপতিদ্বয় কৌশল করে রত্নসেনকে উদ্ধার করে। রত্নসেন পুনরায় দুর্গে ফিরে আসে। কিন্তু পদ্মাবতীর মুখে দেবপালের কূটনীতির কথা শুনে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে রত্নসেন আহত হয় এবং দেবপাল নিহত হয়। এই ঘটনায় আহত হয়ে রত্নসেন বেশিদিন বেঁচে থাকেনি। ইতিমধ্যেই পদ্মাবতীর গর্ভে দুই পুত্র (চন্দ্রসেন, ইন্দ্রসেন) সন্তানের জন্ম হয়। পিতার নির্দেশমতো দুই পুত্র সুলতান আলাউদ্দীনের বশ্যতা স্বীকার করে কিন্তু আলাউদ্দীন তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেয়। পুরো কাব্যটিতে প্রেমের কথাই প্রধান সারবস্তু থেকেছে। প্রেমের ভিতর দিয়ে নর-নারীর জীবনের কথা উঠে এসেছে। পুরুষের যে দীর্ঘযাত্রা নারীকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে তা রত্নসেনের ভিতর দেখা যায়। এই কাব্যটির মধ্য দিয়ে প্রেমের প্লট যেমন নির্মাণ করেছেন পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ও সমন্বয়ের দিকটিও প্রকট হয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার আলাওল সম্পর্কে বলেন-

“Many have discovered in the Bengali poems of the famous poet Alaol the bound of union between the two communities, simply on the ground that he wrote his poems in Bengali.”<sup>৬</sup>

ইউছফ জোলেখা বা মোহাব্বাতনামা  
(মুসী শাহ গরীবুল্লাহ)

প্রণেতা: মুসী শাহ গরীবুল্লাহ।

প্রকাশক: আলিমি লাইব্রেরী, চক বাজার, ঢাকা, সন ১৩৬৯ সাল, বাংলা।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮২

মূল্য: ৫০ পয়সা

গরীবুল্লাহ এই নাম নিয়ে নানা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে পাঠকবর্গকে। আনিসুজ্জামান জানান হুগলি জেলার বালিয়া পরগণার অন্তর্গত হাফিজপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন ফকির গরীবুল্লাহ, যাঁর পিতার নাম শাহ দুন্দী। এই শাহ দুন্দী ছিলেন আল্লাহ'র ফকির, তাঁদের পরিবার পীরের খানদান ছিল, সেই সূত্রে কবি নিজেকে ফকির বলে খ্যাত করেছেন কাব্যমধ্যে।<sup>১</sup> 'ইউছফ জোলেখা' কাব্যে গরীবুল্লাহ বড় খাঁ গাজির উল্লেখ করেছেন, এই তথ্য থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি এই কাব্যের রচয়িতা ফকির গরীবুল্লাহ, যিনি কাব্যের ভণিতায় এই ভাবেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এই কাব্যখানি পুথি প্রকাশকদের কারসাজিতে মুসী শাহ গরীবুল্লাহ নামে প্রচলিত। ফকির গরীবুল্লাহ ও মুসী শাহ গরীবুল্লাহ দুজনে একই ব্যক্তি। অন্যদিকে গরীবুল্লাহ নামে আর একজন কবির পরিচয় পাওয়া যায় যিনি ঢাকার নিকটবর্তী রহমতগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন।

**কাহিনি সংক্ষেপ:** ফকির গরীবুল্লাহ রচিত কাব্যটির নাম 'ইউছফ জোলেখা বা মোহাব্বাতনামা', রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ইউসুফ এবং জোলেখার যে প্রণয়ের সম্পর্ক সেই মর্মকথাকে নিজের ভাবনার গভীরতায়, কলাকুশলীতে, বৈদগ্ধ্য কাব্যের ভিতরে ভরিয়ে তুলেছেন। ধর্মগ্রন্থ 'কোরান' ও 'বাইবেল' এর সারবস্তুকে উপজীব্য করে যে কাব্য বাংলা সাহিত্যের কাছে উপহার দিয়েছেন তা অনবদ্য। কেনান শহরের অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি এয়াকুব নবির কথা জানা যায়। নবির প্রথম স্ত্রীর দশপুত্রের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী রাহিলা বিবির কোনও সন্তান ছিল না। সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় আল্লাহ'র কাছে রাতদিন প্রার্থনা করে। শেষে পরমকরণাময় আল্লাহতালার

কুপায় রাহিলা গর্ভবতী হয় এবং ইউসুফ নামে পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। ইউসুফ এর রূপ দেখে সকলেই মুগ্ধ।

আছমানের চাঁদ যেন যায় গড়াগড়ি।।

ইউছুফে লইয়া সবে করে ছড়াছড়ি। (পৃ.৪)

শেষে ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে পাঁচ সালের ব্যবধানে জন্ম নেওয়া দুই পুত্রকে (ইউসুফ, ইয়ামিন) রেখে রাহিলা বিবির মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুতে এয়াকুব নবির অসহায় অবস্থায় তাঁর আত্মীয়স্বজন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। রাহিলার নিজের বোন ছোট পুত্র ইয়ামিনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এয়াকুবের বড় বোন স্নেহের পুত্র ইউসুফের দায়িত্ব নেয়। ইউসুফকে ছেড়ে পিতার মন সর্বদাই কাঁদতে থাকে, তার অনুপস্থিতিতে এয়াকুব অস্থির হয়ে ওঠে, সারাবাড়িময় পুত্রের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেখে নিজের বেদনা বাড়তে থাকে। শেষে এয়াকুবের বোনের মৃত্যু হলে নিজের পুত্রকে গৃহে ফিরিয়ে আনে।

ইউসুফ স্বপ্নে নিজের ভাগ্যের অবস্থার কথা পিতাকে জানায় (স্বপ্নে ইউসুফ দেখে আকাশের সমস্ত চন্দ্র-তারা তাঁর পায়ে নতজানু করছে)। সেই স্বপ্নের কথা অন্য ব্যক্তিদের না বলতে অনুরোধ করে কিন্তু চাকর অগোচরে তাদের কথোপকথন শুনতে পায়। ইউসুফের দশভাই হিংসায়, ক্রোধে বশবর্তী হয়ে একরকম ফন্দি আঁটে। পিতাকে বহুভাবে বোঝানোর পর একপ্রকার অনুমতি পেয়ে দশভাই মিলে ইউসুফকে নিয়ে মাঠে ছাগল চড়াতে বেড়িয়ে পড়ে। ইউসুফকে একা পেয়ে দশভাই মিলে ছড়ি দিয়ে প্রহার করতে থাকে এবং তাকে বেহুশ করে মাটিতে ফেলে রাখে। ইউসুফের এই দশা দেখে বনের পক্ষী, পশু সব বিরহ করতে থাকে।

ইউছুফে দেখিয়া পক্ষ, বনে কান্দে লক্ষ লক্ষ, পশুগণ কুঞ্জ অধিকার।।

নেউল ভালুক কান্দে, কেহ নাহি প্রাণ বান্ধে, গাভী কান্দে ছাড়িয়া আহর।

আকাশ জমিন কান্দে, সূর্য্য তারা আর চান্দে, ফেরেস্তু ও কান্দে হ্র পরী।।

(পৃ.১২)

শেষে দশভাই মিলে ইউসুফকে কুয়ায় নিক্ষেপ করে বাড়ি ফিরে জানায় স্নেহের পুত্রকে বনের বাঘ শিকার করেছে। এই মিথ্যা অভিযোগে ভুলিয়ে রাখে কিন্তু পিতার মন কিছুতেই মানতে নারাজ। শেষপর্যন্ত জিবরাইল মুখে এয়াকুব সমস্ত সত্য ঘটনা জানতে পারে। মালেক নামধারী এক সওদাগর পথ হারিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং জলপানের জন্য কুয়ার ভিতর লোটাতে জলসংগ্রহের সময় ইউসুফ উঠে আসে। সেই উজ্জ্বল বর্ণের পুরুষকে দেখে সে বিমোহিত হয়ে পড়ে। ইউসুফের দশভাই সওদাগরের কাছে গোলাম হিসাবে ইউসুফকে বিক্রি করে দেয়, ইউসুফকে নিয়ে সওদাগর মিশর দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।<sup>৮</sup>

পশ্চিম মুলুকে তৈমুছ বাদশার কন্যা জোলেখা স্বপ্নে আজিজ মেছেরের কথা জানতে পারে এবং তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে বিবাহের জন্য পিতাকে জানায়। আজিজের সন্মানে বাদশা লোক পাঠায় এবং আজিজ নিজেও বিবাহে রাজি এই কথা বাদশাকে জানায়। নানা রঙ্গে, নানা বেশে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে জোলেখা বিবাহ এর জন্য প্রস্তুত করে তোলে। সমস্ত আনন্দ-উল্লাসের মাঝে জোলেখা নিজের মাতৃসম দাইকে জানায় তার পরিহিত বোরখা উঠিয়ে দিতে তৎক্ষণাৎ জোলেখা আজিজের রূপ দেখে। কিন্তু স্বপ্নে দেখা পুরুষের সঙ্গে আজিজের মিল না পেয়ে জোলেখা দুঃখপ্রকাশ করে।

জোলেখা কহেন বাত, মারিয়া কপালে হাত, শুন দাই বলি তোমায়।।

জহর খাইয়া মরি, নহে গলে দিব ছুরি, প্রাণ না রাখিব দুনিয়ায়। (পৃ:২৭)

নাচ, গান, বাজনা সহযোগে বিবাহের সমস্ত আয়োজন যেখানে সেই পরিস্থিতিতে জোলেখা ও আজিজ নিজেদের জীবন থেকে দূরে চলে যায়। স্ত্রী রূপে জোলেখাকে গ্রহণ করার মূহুর্তে আজিজ জোলেখার মধ্যে নিজের মাতৃরূপ দেখে জ্ঞান হারায়। এই অবস্থায় দুজনেই সিদ্ধান্ত নেয় তারা আলাদাভাবে নিজেদের মতো জীবন অতিবাহিত করবে। এইভাবে দিনযাপনের মধ্যে একদিন জোলেখা জঙ্গলের মধ্যে শিকারে বার হয় এবং নিজের স্বপ্নের প্রাণপুরুষকে খুঁজতে থাকে। ইতিমধ্যেই মেছের শহরে ইউসুফকে বিক্রির জন্য সওদাগর নিয়ে আসে। মেছের দেশের রাজা ভাটের মুখে ইউসুফের রূপের বর্ণনা শোনে এবং ইউসুফকে তার দরবারে হাজির করার অনুমতি দেয়। মালেক

সওদাগর বাদশার নিকট এসে পৌঁছায় সেইস্থানে শহরের সকল মানুষ ইউসুফের রূপ দেখে মোহিত হয়। মেছের শহরের সকল ব্যক্তি গোলাম (ইউসুফ) কিনতে ছড়োছড়ি করে। তৎক্ষণাৎ জোলেখা জঙ্গল থেকে শহরে ফিরে ইউসুফের কথা জানতে পারে এবং ধাইকে সঙ্গে নিয়ে সেইস্থানে হাজির হয়ে বোরখা খুলে ইউসুফের রূপদর্শনের মধ্যে দিয়ে নিজের স্বপ্নের প্রাণনাথকে চিনে নেয়। জোলেখা নিজের জীবনের কথা ভেবে নানা রকমভাবে দুঃখ করতে থাকে। জোলেখা ইউসুফকে কিনতে আজিজ (স্বামী) এর কাছে খত লেখে এবং আজিজ সেই গোলামকে কিনে জোলেখার হাতে সুপে দিল। নিজের প্রাণনাথকে এতদিন পর নিজের কাছে পেয়ে জোলেখা আনন্দিত হয়ে ওঠে এবং ইউসুফকে লালন-পালনের সমস্ত দায়ভার নিজের হাতে তুলে নেয়। জোলেখা স্বপ্নে দেখা প্রাণপুরুষের প্রেমে আসক্ত কিন্তু ইউসুফের মনোভাবে প্রেমের আভাস লক্ষ করা যায়নি। জোলেখা নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত ইউসুফের নিকট প্রকাশ করে কিন্তু তার কোনও সুরাহা মেলেনি।

ইউসুফ কোনোভাবেই জোলেখার প্রতি আসক্ত নয়, এই দোলাচলের মধ্যে শহরের এক চিত্রকর বুড়ি জোলেখার কাছে এসে পৌঁছায় এবং সেই বুড়ি ‘হপ্তমখানা’ বানানোর নির্দেশ দেয়। সুন্দর সুন্দর চিত্রপটে সাতখানি ঘর সাজিয়ে তোলে প্রতিটি ঘরের কারুকার্য হয়েছে জোলেখা ও ইউসুফের বিভিন্ন রোমান্টিক মূহুর্তের ছবি দিয়ে। বিভিন্নরকম চিত্রে সজ্জিত হপ্তমখানায় জোলেখা ইউসুফকে নিজের বাসনা পূরণের জন্য নিয়ে যায় কিন্তু সেখানেও জোলেখা বঞ্চিত হয় প্রেমের বাসনা থেকে। ইউসুফকে শাস্তি দিতে জোলেখা মিথ্যা অপমানের দায় প্রকাশ করে আজিজের কাছে।

গোলাম কিনিয়া দিলে আমাকে পুষিতে।।

আখেরে মরন হইল গোলামের হাতে।

মানুষ করিলাম আমি পালিয়া পুসিয়া।।

আমাকে ভজিতে চাহে গোলাম হইয়া। (পৃ.৫০)

ইউসুফের রূপে মুগ্ধ হয়ে সর্বদাই জোলেখা অস্থির হয়ে ওঠে, প্রাণপুরুষের কাছে প্রেমের সাড়া না মেলায় জোলেখা আজিজকে আদেশ করে ইউসুফকে কারাগারে



নিষ্ক্ষেপের জন্য, সেই কথামতো ইউসুফ সাতবছর বন্দিজীবন কাটায়। অন্যদিকে জোলেখা প্রাণনাথকে সামনে দেখতে না পেয়ে হাহুতাশ করে।

আহা মরি প্রাণনাথ তোমার লাগিয়া।।

অভাগির মরন দশা মরি দগধাইয়া। (পৃ.৫৭)

বন্দিজীবনদশায় ইউসুফ দুই বন্দিয়ানকে (ছাকি, বাকি) নিজের স্বপ্নের কথা এবং তাঁর জীবনের করুণ পরিস্থিতির সবটাই জানায়। রায়হান সাহা (মেহের দেশের বাদশা) তিনি দেশের দুর্দশা অবস্থার স্বপ্ন দেখে চমকে ওঠে। ছাকি ও বাকির মারফত বাদশা ইউসুফের কথা জানতে পারে এবং বাদশার হুকুমে ইউসুফ রায়হান সাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। দেশের কঠিনতম অবস্থায় আনাজকড়ি জমা রাখার নির্দেশ দেয়। ইউসুফ উজির পদে আসীন হয়ে সবকিছু সামলানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে এরইমাঝে আজিজ (মেহের দেশের বাদশা) এর জীবনাবসান ঘটে। পুনরায় নতুন করে মেহের এর বাদশা পদে ইউসুফ নবি অভিসিক্ত হয়। ইতিমধ্যেই জোলেখা নিজের যৌবন হারিয়ে প্রেমের হাহাকারে পথের পাশে আশ্রয় গ্রহণ করে। সারাজীবন প্রেমের কাছে নিজেকে আত্মবলিদান দিয়ে গেছে জোলেখা কিন্তু ইউসুফ তার প্রেমের আর্তনাদে সাড়া দেয়নি। কাহিনি অন্যদিকে মোড় নেয়, প্রেমের উৎকর্ষতাকে তুলে ধরতে ইউসুফকে এরপর প্রধান নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। জোলেখার করুণ অবস্থা দেখে ইউসুফ তার প্রতি সদয় হয় এবং ধীরে ধীরে জোলেখার প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। বয়স্ক জোলেখা আগের মতো রূপ ফিরে পায়, সেই রূপের প্রতি ইউসুফ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

চন্দের সমান রূপ দিল জেলেখারে।

হুর পরি জিন রূপ দিলেন খোদায়।।

ইউছুফ আসক হইল দেখে জেলেখায়।

ইউছুফ দেখিয়া তবে বিবি জেলেখারে।। (পৃ.৬৪)

জোলেখা স্বপ্নের প্রাণপুরুষ (ইউসুফ) যার রূপে মুগ্ধ থেকেছে চিরকাল, সেই প্রাণপুরুষকে নিজের মতো করে ফিরে পাচ্ছে। কাব্যের একদম শেষ অংশে জোলেখা ও ইউসুফের বিয়ের প্রসঙ্গ এসেছে।

ইউসুফ জেলেখা নেকা হৈল দুইজন।

দুইজনে একসাথে গোজরান করিতে।।

জোলেখা খোসাল মনে লাগিল হাসিতে। (পৃ.৬৫)

আজিজের মৃত্যুর পর নতুন করে মেছের দেশের বাদশা রূপে ইউসুফ পরিচিতি লাভ করে এবং তাঁর নতুন নাম হয় আজিজ মেছের। ইউসুফ প্রথম জীবনের অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সামলে শেষপর্যন্ত বাদশা রূপে নিজের আত্মপরিচয় খুঁজে পায়। অন্যদিকে ইউসুফের দশ ভাই মেছের শহরে চরম দুর্দশার সময় আনাজ কিনতে যায় এবং সেখানে বাদশা রূপে ইউসুফকে দেখে বিস্মিত হয়। দশভাই দেশে ফিরে এয়াকুবকে পুত্র ইউসুফের কথা জানায় এবং পিতা-পুত্রের পুনরায় সাক্ষাৎ হয় দীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাতের পর। নিজের স্নেহের একমাত্র ভাই ইয়ামিনের সঙ্গেও ইউসুফের পরিচয় হয় এবং মেছের দেশে এসে চোর অপবাদে চিহ্নিত ইয়ামিনকে আসন্ন বিপদের মুখ থেকে ইউসুফ রক্ষা করে। দুই ভাইয়ের স্নেহের চিত্র বেশ প্রকট ভাবে ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে রায়হান সাহা কলেমা পড়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে নিচ্ছে। পাশাপাশি ইউসুফ বাদশা হয়ে ক্ষমতার গুরু দায়িত্ব সামলাচ্ছে। এইভাবেই ইউসুফ ও জোলেখার কাহিনি শেষ হয়ে যাচ্ছে।

গরীবুল্লাহ রচিত ইউসুফ-জোলেখার কাহিনি বর্ণনায় অনেক জায়গায় অসঙ্গতি এসেছে, এতে কাব্যমূল্য অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে একথা স্বীকার করার মতো। আসলে গল্পের কাহিনি নির্বাচন সঠিক হলেও উপস্থাপনা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই প্রসঙ্গ ধরে পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের দিকে আলোকপাত করা যেতে পারে, ইউসুফ-জোলেখার কাহিনি নিয়ে কাব্যরচনা করেছেন শাহ মহম্মদ সগীর (পঞ্চদশ শতাব্দীর সাহিত্যিক), রচিত কাব্যের নাম 'ইউসুফ-জোলেখা'। এই কাব্যের পুরো বিষয়বস্তু আলোচনা না করে বেশকিছু দিককে তুলে ধরা হয়েছে যে অংশগুলোকে আলাদা করে গরীবুল্লাহ'র কাব্যের থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যাবে খুব সহজেই। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনার ধারাকে অবলম্বন করে মধ্যযুগের মুসলমান সাহিত্যিকরা কাব্য রচনা করেছেন এবং প্রত্যেকের লেখার মধ্যে আলাদা আলাদা নিজস্বতা ফুটে উঠেছে। সগীরের কাব্যরচনার স্টাইল, রীতি অনেকগুণে সমৃদ্ধ হয়েছে যা কাব্যমূল্যকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়।

মুন্সী শাহ গরিবুল্লাহ রচিত ইউছফ জোলেখা বা মোহাম্মদ নামা	শাহ মহম্মদ সগীর রচিত ইউসুফ-জোলেখা
ক. এই কাব্যে শুরুতেই পীর বড়খাঁ গাজির নাম উল্লেখ করেছেন। আলাদা করে বন্দনা অংশের কথা বলেননি।	ক. শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্যে ‘আল্লাহ ও রসুল বন্দনা’ এই অংশে পরমকরণাময় আল্লাহ এবং মোহাম্মদ এর কথা বলেছেন।
খ. এই কাব্যের প্রথমেই এয়াকুব নবির দশপুত্র এবং স্নেহের ইউসুফের জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে। ইউসুফের সুন্দর রূপের বর্ণনা পাই।	খ. এই কাব্যের কাহিনি বর্ণনায় জোলেখার জন্ম-বৃত্তান্ত আগে এসেছে। জোলেখা তার নারী রূপের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে নানারকম প্রসাধনী ব্যবহারে।
গ. গরিবুল্লাহ তাঁর কাব্যে জোলেখার নারীজীবনের যে দুঃখ-যন্ত্রণা তার সুন্দর বর্ণনা করেছেন কিন্তু আলাদা করে তেমন কোন বারমাসী প্রসঙ্গ নেই। এই পর্বে এসে রোমান্টিক কাব্যরচনার ধারা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, দুই সাহিত্যিকের মধ্যে লেখার পার্থক্য চিহ্নিত হচ্ছে। গরিবুল্লাহ যে ধারাকে বহন করেছেন লেখার মধ্যে তা একদম সাবলীল যেন কোন এক গ্রাম্যজীবনের মানুষের প্রতিচ্ছবির কথা। যার গুরুগম্ভীরতা নেই।	গ. নিঃসঙ্গ জোলেখার বারমাসী বর্ণনা এই কাব্যের কাব্যগুণকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে, মধ্যযুগের ধারায় এই বারমাসী প্রসঙ্গকে তুলে এনেছেন নারীজীবনের দুঃখ-কষ্টকে বোঝাতে। জোলেখার জীবনের যে গভীর যন্ত্রণা সেই মর্মকথাকে গেঁথেছেন লেখার মধ্যে দিয়ে- ‘মাঘ হৈল পরকাশ কানন কুসুম হাস/ শুভ ছিরি পঞ্চমী প্রকাশ। মউলিত পুষ্পবন মদন মোহন ঘন’। বারমাসী বর্ণনা মধ্যযুগের সাহিত্যের লেখার এক স্টাইল, যা এখানে বিদ্যমান।
ঘ. এই কাব্যে সওদাগরের নাম মালেক।	ঘ. এখানে সওদাগর পরিচিতি থেকেছে মণিরু নামে।
ঙ. এই কাব্যে শুধুমাত্র ইউসুফের নিজের সহোদরা ভাই ইয়ামিন এর কথা জানতে পারি, বিধুপ্রভা প্রসঙ্গ নেই।	ঙ. বিধুপ্রভা ও ইবন আমীনের প্রসঙ্গ আছে এবং দুজনের বিবাহ পরিণতির কথা জানা যায়।
চ. মেহের দেশ এর উল্লেখ আছে।	চ. মিশর দেশকে বুঝিয়েছেন।

মুন্সী শাহ গরিবুল্লাহ রচিত কাব্যের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি এসেছে কিন্তু শাহ মহম্মদ সগীর তাঁর কাব্যের বর্ণনায় অনেক নিখুঁত চিত্রকে তুলে এনেছেন যা কাব্য মূল্যকে বাড়িয়ে দেয়। এইখানেই দুজন লেখকের মধ্যে ফারাক ঘটে গেছে। বারমাসী

প্রসঙ্গ মধ্যযুগের কম-বেশি কাব্যের বর্ণনায় এসেছে, এদিক দিয়ে সগীর সেই বহমানতাকে অক্ষুন্ন রেখেছেন তাঁর রচিত কাব্যে।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান আলোচনারসূত্রে নির্বাচিত সময়ের বাইরেও পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী শতাব্দীর সাহিত্য সম্পর্কেও অবগত থাকব কারণ সময়ের হাত ধরে যেকোনও সাহিত্যই যেমন এগিয়ে চলে তেমনই বেশকিছু লেখার ধরনে ফারাক ঘটে। দৌলত উজীর বাহরম্ খান রচিত ‘লায়লী-মজনু’ রোমান্টিক কাব্যধারার আর একটি ফসল। কাব্যটি ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দের পর রচিত। দৌলত উজীর তাঁর কাব্যে ‘হাম্দ’ ও ‘নাত’ অংশে আল্লাহ, মোহাম্মদের গুণকীর্তন করেছেন। পাশাপাশি আসহাব-প্রশস্তি, রাজ-প্রশস্তি, পীর-স্তুতি, কবির বংশ পরিচয় এবং গ্রন্থোৎপত্তির কারণ এই সমস্ত বিষয়গুলির আলোচনা করে কাব্যের বিষয়বস্তুর প্রতি আলোকপাত করেছেন।

এই কাব্যটিতে মূলত মজনু ও লায়লীর যে গভীর প্রেমের অন্তরঙ্গতা তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কাহিনির গতানুগতিক আলোচনা না করে প্রেমের কাব্য হিসাবে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে সেটাই দেখার। মজনুর জন্ম, বড় হয়ে ওঠার কাহিনি এখানে এসেছে। সুন্দরী লায়লীর রূপ বর্ণনায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন।

ভুরুর নিকটে তিল                      অড়ুতে যে দেখিল  
কোন জন করিব প্রত্যয়।  
বায়স ধনুর সনে                      রহিছে আনন্দ মনে  
নয়ান বাণের নাহি ভয়।। (পৃ.২২)

নায়ক-নায়িকার প্রেম নিবেদনের ক্ষেত্রে সখী প্রসঙ্গ একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। সুন্দরী লায়লী কমলমুখী নামে সখীকে সঙ্গে নিয়ে প্রেমের অভিলাষে বার হচ্ছে। প্রেমের জন্য একজন প্রেমিক পুরুষের কতখানি আত্মত্যাগ তাও এই কাব্যে দেখতে পাই, অন্ধ ভিক্ষুকবেশে মজনু নিজেকে পরিচয় দিয়েছে লায়লীর সম্মুখে।

দুই আখি মুদিলেস্ত আঁধল আকৃতি।  
করে দন্ড ধরিয়া চলিলা মন্দ গতি।। (পৃ.৪১)

প্রেমিক (মজনু) প্রেমের বন্ধনে এতটাই বিভোর থেকেছে সে তাঁর আত্মীয়-পরিজন সকলকে ভুলে লায়লীকে পাবার ইচ্ছায় অস্থির হয়ে উঠেছে।

পিতাক চিনিতে নারে বিভোল বিশেষে ॥

জিজ্ঞাসিলা তোমার কি নাম মহাশয় ॥ (পৃ.৪৯)

প্রেমিক হৃদয়ের এই টুকরো টুকরো চিত্র অঙ্কন করে কবি রোমান্টিক কাব্যের উপাদান হিসাবে কাব্যকে ভরিয়ে তুলেছেন। ‘যোগীবরের নিকট মজনুর সঙ্কল্প জ্ঞাপন’ এই অংশের বর্ণনায় মধ্যযুগের ঘরানার বাঁধাকে যেন ভেঙে বেড়িয়ে এসেছেন একথা বলা যায়। লায়লীর দেহত্যাগ এবং সেই কথা শুনে মজনুর শোকপ্রকাশের যে বহিঃপ্রকাশ তাতে একজন পুরুষ প্রেমিকের প্রেমের আকুলতাকে অঙ্কন করেছেন কবি তাঁর এই কাব্যের মধ্যে আর এইভাবেই কাব্যটি শেষ হচ্ছে।

প্রাণেশ্বরী একেশ্বরী

কেমতে রহিলা গোর মাজ।

নিশ্চয় জানিছি আমি আমার জীবন তুমি

তুমি বিনু আমার বিনাশ।

জথ হৈল পরমাদ জীবনে নাহিক সাধ

অন্তরে মিলিব তোমা পাশ ॥ (পৃ.১৬২)

রোমান্টিক কাব্যগুলিতে ‘মানবপ্রেম’ এর সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে, প্রতিটি কাব্যের চরিত্রগুলি একদম মানব জীবনের প্রেমের যে আকুলতা, যে অস্থিরতা, যে উন্মাদনা তার কথাই বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা লক্ষ করি-

প্রতিজ্ঞা করিল দুই যাবত জীবন।

অন্যে অন্যে প্রেমাকুর করিব পালন ॥

(লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না, পৃ.৬৯)

অন্যদিকে ‘সৌন্দর্য’ বর্ণনায় সাহিত্যিকরা শাস্ত্রের ‘নখ-শিখ-বর্ণন’ পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছেন। নারী শরীরের বর্ণনায় প্রতিটি অঙ্গের পুঞ্জানুপুঞ্জ বিবরণ দিয়েছেন। নারীর সাজসজ্জা-অলংকার ইত্যাদি বর্ণনায় দৃষ্টান্তও রেখেছেন। ‘যুদ্ধ প্রসঙ্গ’ এই দিকটির কথাও রোমান্টিক কাব্য রচনায় এসেছে, প্রেমিক পুরুষ প্রেমের বশবর্তী হয়ে

নায়িকাকে পাওয়ার অভিলাষ থেকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে প্রতিপক্ষের সঙ্গে। এই উপাদানগুলি ছাড়া ‘অলৌকিকতা’ বিরাট আকারে মধ্যযুগের রোমান্টিক সাহিত্যে এসেছে, সাহিত্যে অবাস্তব ঘটনা বা দৃশ্যগুলো পাঠককুলকে ভাবতে শেখায়, বাস্তব জগতের সব কিছুর উর্দে গিয়ে এমন চিত্র অঙ্কন করেছেন যা সাধারণ জনজীবনের সঙ্গে অনেক পার্থক্য ঘটে যায়। এছাড়া ‘আধ্যাত্মিকতা’ বিষয়ের মধ্যে সুফিতত্ত্বের নিগূঢ় আদর্শ উঠে এসেছে, আমরা সুফিবাদ নিয়ে আলোচনার সময় এই বিষয়টি আরও বিস্তারিত জানব। নায়ক-নায়িকার প্রেমের স্বরূপ সুফিবাদের আশুক-মাশুক সম্পর্কের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নির্ভেজাল কাম ও বিশুদ্ধপ্রেম কাহিনির উত্তরাধিকার নিয়ে মধ্যযুগের সাহিত্যিকরা আবির্ভূত হয়েছেন। প্রণয়কাব্যে নারী-পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে প্রেমের জন্য আত্মবলিদানে তৎপর হতে দেখি। সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত নারী-পুরুষের মিলনই এদের প্রেমের শেষকথা।

#### খ. ধর্মীয় ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক রচনা

এই ধারায় ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক যে কাব্যগুলি সংগ্রহের তালিকায় এসেছে সেগুলির বিষয়বস্তু আলোচনা করা হয়েছে।

খায়রুল হাশার

(সেখ কমরুদ্দিন)

প্রণেতা: মরহুম সেখ কমরুদ্দিন সাহেব।

প্রকাশক: ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ৩৮ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৬৪

মূল্য: ১০০ টাকা মাত্র

**কাহিনি সংক্ষেপ:** কমরুদ্দিন রচিত এই কাব্যটিতে ইসলাম জাতির ইতিহাসে সৃষ্টির প্রথম আদিম দম্পতি (আদম-হাওয়া) সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইসলামের গড়ে ওঠার ইতিহাস এই কাব্যের বর্ণনা অংশে তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য মুসলমান সাহিত্যিকদের মতোই পয়ার, ত্রিপদী এবং চৌপদী ছন্দে এই কাব্য বর্ণনা করেছেন।

প্রথমেই ‘হামদ’ ও নাআ’ত অংশের মধ্য দিয়ে আল্লাহ’র বন্দনা করেছেন। আদম ও হাওয়া বিবির বেহেশত থেকে দুনিয়াতে আবির্ভাব এর ইতিহাস সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাবীল ও কাবীলের জন্মকথা, কাফেরদের অত্যাচার, বিবি হাজেরার বনবাস, হাজেরা বিবির গর্ভে ইসমাইল নবির জন্ম, কাফেরদের ধ্বংস এই বিষয়গুলি কবি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া হজরত মোহাম্মদ, ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইমাম মাহদী এবং ঈসার কথা আলোচনাসূত্রে এসেছে। নবি হজরতের খাদিজার সঙ্গে বিবাহ, নবিজির মেয়ারাজের কথা, বায়াতুল মোকাদ্দাসের প্রসঙ্গ, নবির হিজরতের বয়ান এবং ওফাত সম্পর্কিত আলোচনা এই কাব্যের বর্ণনায় এসেছে। ইহুদি জাতি মুসলমান শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং কাফেরদের ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা জানা যায়। এছাড়া হাশরের দিনের কথা পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

### কালন্নবি (শ্রীমনিরদিন আহাম্মদ)

প্রণেতা: মুনসি তাজদ্দিন মহাম্মদ মরহুমের ভ্রাতৃপুত্র শ্রীমনিরদিন আহাম্মদ।

প্রকাশক: নুরিয়া প্রেস, বিডন ইন্সটিটিউট রামচাঁদ ঘোষের লেন, ১৯ নম্বর ভবন, সন ১২৯১।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৪

**কাহিনি সংক্ষেপ:** এই কাব্যটির মূল উৎস ছুফি আব্দুল করিম রচিত ফারসি কাব্য ‘লবাবল আখবার’। পরবর্তীতে মুনসি তাজদ্দিন মহাম্মদ ফারসি থেকে এই কাব্যটি উর্দুতে অনুবাদ করেন এবং শেষে তাজদ্দিন এর ভ্রাতৃপুত্র মনিরদিন আহাম্মদ এই কাব্যটি বাংলায় তরজমা করেন ‘কালন্নবি’ এই নামে। পুরো কাব্যটি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বর্ণিত হয়েছে। নামাজ, ওজু, আজান, জমাত, রোজা, দরুদ, জেকের, তছবি গোনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নবি হজরত মোহাম্মদের নির্দেশ এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। মূলত হাদিসের কথাগুলো এখানে বিভিন্ন পরিসরে আলোচনায় উঠে এসেছে। ইসলামি জীবনধারণের সঙ্গে যুক্ত যে আচার-রীতি সেই প্রসঙ্গগুলি মূলত বর্ণনায় এসেছে।

## গ. জঙ্গনামা

গবেষণা অভিসন্দর্ভে যে সময়পর্বকে আমরা বেছে নিয়েছি এই সময়ে মুসলমান সাহিত্যিকরা কতধরনের রচনাকর্মে নিয়োজিত থেকেছেন তা বুঝে নিতে পারি। যুদ্ধ কাব্যের বিষয় এবং এই কাব্যের মধ্য দিয়ে রচনাকারেরা ঠিক কোন বিষয়কে ধরতে চেয়েছেন সেই ধারণা পেতেই আমরা এর পরিচিতি লাভ করেছি। এছাড়া অন্যান্য ধারার পাশাপাশি জঙ্গনামা সাহিত্য পাঠকবর্গ কতটা আস্থা দান করতে পেরেছে সেইটিও দেখার।

### জঙ্গনামা

(শাহ্ গরীবুল্লাহ)

প্রণেতা: শাহ্ গরীবুল্লাহ।

সম্পাদিত: ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল।

প্রকাশক: বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০, জানুয়ারী ১৯৯১।

কাহিনি সংক্ষেপ: শাহ্ গরীবুল্লাহ বিরচিত 'জঙ্গনামা' কাব্যটি ফারসি গ্রন্থ 'মুক্তাল হোসেন' অবলম্বনে রচিত। তবে পুরোপুরি অনুবাদ করেননি, নিজের প্রতিভা ক্ষমতায় আপন মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন কাব্যের মধ্যে। এই কাব্যে হাসান-হোসেনের জীবনের চরম ট্রাজেডির চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। কাব্যটি শুরু হয়েছে 'বন্দনা' অংশের অবতারণা করে, আল্লাহ'র গুণগান, ফেরেস্তার কথা এবং পীর বড়খাঁ গাজির নাম উল্লেখ করেছেন। ভগিতায় কবি নিজেকে অধীন ফকির বলেছেন। হজরত মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমার দুই পুত্র হাসান ও হোসেন। মোহাম্মদ পবিত্র ঈদের উৎসবে নামাজ পড়ে কন্যা ফাতেমাকে দেখতে গিয়ে জানতে পারে নিজের পুত্রদের (হাসান-হোসেন) নতুন জামা হয়নি বলে তাঁর মন ভারাক্রান্ত। এই কথা শুনে ফাতেমাকে জানায় ঘরের ভিতর সিন্দুকে জীবাইল জামা রেখেছে। দুই পুত্র সেই জামা পরিধান করতে নারাজ, রঙিন জামা তাদের পছন্দ। জীবাইল এর কথা মতো জামার উপর পানি ছিটিয়ে দেয় এবং



যথারীতি রঙিন জামা পেয়ে তারা দুই ভাই খুশি হয়, হাসান সবুজ জামা ও হোসেন লাল জামা পায়।

জিবাইল মারফত মোহাম্মদ জানতে পারে কারবালায় ইমাম হোসেন শহিদ হবে কাফেরের হাতে এবং হাসান বিষপানে মৃত্যুবরণ করবে। মোহাম্মদের বন্ধু হজরত মাবিয়ার পুত্র এজিদের হাতে হাসান হোসেনের মৃত্যু হবে। এই কথা জানার পর মাবিয়া সারাজীবন অবিবাহিত থাকার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে তা রক্ষিত হয়নি। হঠাৎ মাবিয়া বিচ্ছুর কামড়ে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে, জিবাইল কর্তৃক বাণী আসে মাবিয়ার সমস্ত যন্ত্রণা নিরসন হবে বিবাহের পর। শেষপর্যন্ত মাবিয়া এক বয়স্কা মহিলাকে বিবাহ করে নিজের কষ্ট দূর করতে কিন্তু বৃদ্ধার সঙ্গে প্রথম মিলনেই বৃদ্ধা সুন্দরী যুবতীতে রূপান্তরিত হয়। এরপর তাদের এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, নাম রাখা হয় এজিদ। মোহাম্মদের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আসীন হবার জন্য আবুবকর, তারপর ওমর ও উসমানকে মনোনীত করা হয়। উসমান বাদশা হিসাবে মনোনীত হবার পর আরববাসী তা মেনে নেয়নি, তাকে অল্পদিনের মধ্যেই নিহত হতে হয়। শেষপর্যন্ত বাদশা রূপে সিংহাসন দখল করে হাসান। অন্যদিকে দামেস্ক শহরে মাবিয়া তার রাজত্ব চালায়, ইতিমধ্যেই পুত্র এজিদ বড় হয়ে ওঠে। মাবিয়ার পুত্র (এজিদ) সুন্দরী রূপবতী জয়নাব বিবির রূপে মুগ্ধ হয় (জব্বারের পত্নী জয়নাব)। জব্বার অর্থলোভে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিতে প্রস্তুত, স্বামীর এরূপ আচরণে স্ত্রী বিলাপ করে।

কান্দিয়া হয়রান বিবি বলে হয় হয়।

কেন না মউত তার দিলেক খোদায়।।

দরিয়ায় ভাসাইয়া খসম আমার।

কিনারা নাহি দেখি না জানি সাতার।। (পৃ.১৪৪)

মাবিয়া নিজের পুত্রের বিবাহের জন্য মুসা আনসারীকে (ঘটক) নিয়োগ করে। সুন্দরী জয়নাবের কাছে পৌঁছানোর আগেই মুসার সহিত আককাছ এবং ইমাম হাসানের দেখা হয়। মুসা আনসারী জয়নাবের কাছে এই তিনজনের কথা বলে এবং সুন্দরী জয়নাব আখেরের কথা ভেবে হাসানকে বিবাহের সম্মতি জানায়। হাসানের সঙ্গে

জয়নাবের নিকা মিটে গেলে সেই সংবাদ আনসারী দামেস্কে এসে মাবিয়াকে জানায়। হজরত মাবিয়া এবং তার পুত্র এজিদ এই কথা শুনে ইমাম হাসানকে হত্যার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। বহু ষড়যন্ত্রের পর হাসান সর্দারকে (ওলিদা) জানায় মাবিয়া তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুক কিন্তু তাতে সে নারাজ। শেষপর্যন্ত ইমাম হাসান যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়, যুদ্ধক্ষেত্রে কোনোভাবেই হাসানকে পরাজিত করা সম্ভব নয় একথা উজীর (মেরওয়া) মাবিয়াকে জানায়। ইমাম হাসানকে বিষপানে হত্যার পরিকল্পনা করে। এই অসৎকর্মের জন্য মদিনার মায়মুনা নামে কুটনী বুড়ির শরণাপন্ন হয়, এই বুড়ি ইমামের মহলে কদবানু বিবির (হাসানের স্ত্রী) সহিত সাক্ষাৎ করতে আসে এবং বিবাহিত স্ত্রী ছেড়ে হাসান অন্য নারীর প্রতি আসক্ত এই কথা জেনে কদবানুকে কু-পরামর্শ দেয়। স্বামীকে (হাসান) শরবতের সঙ্গে দারু (বিষমিশ্রিত) মিশিয়ে খাওয়াতে বলে, বুড়ির কথা মতো কদবানু হাসানকে ঠান্ডা পানির পরিবর্তে শরবত খেতে দেয়। বিবির তৈরি শরবত খেয়ে হাসান কাতর হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। হাসানের মৃত্যুশোকে নিজের একমাত্র পুত্র কাসেম এবং স্নেহের ভ্রাতা হোসেন গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়।

মাবিয়া এবং তার পুত্র শুধুমাত্র হাসানকে হত্যা করেই ক্ষান্ত নয় পিতা-পুত্রের চক্রান্তের শিকার হয় ইমাম হোসেন। কুফার শহরের আবদুল্লাহ জেয়াদ ইমাম হোসেনকে পত্র মারফত জানায় মোহাম্মদ স্বপ্নে তাঁকে নিয়ে কুফারে একসঙ্গে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। জেয়াদের কথা শুনে হোসেন মোসলেমকে কুফার শহরে প্রেরণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত পেতে, জেয়াদের কোনোরকম চতুরতা মোসলেমের দৃষ্টিগোচর হয়নি। মোসলেমের নির্দেশমতো ইমাম হোসেন আত্মীয় পরিজন নিয়ে কুফারে যাত্রা করে, যাত্রাপথে বেরিয়ে অনেকটা পথ অতিক্রম করার পর হোসেন রাস্তা ভুলে কারবালায় পৌঁছায়। মোসলেম কুফারদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে এবং কুফারদের সঙ্গে তিন প্রহর বেলা লড়াই করেও মোসলেম কুফারদের হাতে শহীদ হয়। অন্যদিকে ইমাম হোসেন কারবালা ময়দানে পৌঁছায় মহরম মাসের দ্বিতীয় চাঁদে। ময়দান মাঝে ইমাম হোসেন কুফারদের সঙ্গে লড়াই এ প্রবৃত্ত হয়, নিজের পরিবার-পরিজনকে কুফারের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। নিজের আপন শিশু কুফারদের তীরের আঘাতে

প্রাণত্যাগ করে এবং স্ত্রী সহরবানুর সম্মান রক্ষা করতে পারেনি। হোসেনের উপর চারিদিক থেকে তীর নিষ্ফিণ্ড হতে থাকে, তার বুক, পিঠ, ঘাড় তীরের আঘাতে বিদ্ধ হলে হোসেন ময়দানে লুটিয়ে পড়ে, পাষাণ সীমার হোসেনের উপর চেপে বসে তার গলায় খঞ্জর চালাতে থাকে। এজিদের হাতেই হাসান ও হোসেন নিহত হয় কিন্তু গল্প এখানেই থেমে থাকেনি।

কুফাররা হোসেনের কাটা শির নিয়ে দামেস্কে ফিরে যাওয়ার পথে এক ব্রাহ্মণ (চন্দ্রভান) পরিবারে আশ্রয় নেয়, ব্রাহ্মণ এবং তার স্ত্রী দুজনেই ইমামের শিরের দিকে তাকিয়ে চিনতে পেরে সালাম দিতে থাকে এবং নিজেরা কলেমা পড়ে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ পরদিন কুফারদের হাতে নিজের বড়পুত্র উদয়ভান এর শির তুলে দিলে তারা তা নেয়নি এবং পরপর নিজের বাকি পুত্রদের শির কেটে হাতে দিলেও তারা গ্রহণ করেনি। চন্দ্রভান এবং তাঁর স্ত্রী দুজনে কুফারদের সঙ্গে লড়াই করেও পরাজিত হয় এবং প্রাণত্যাগ করে।

কুফাররা দামেস্কে ফিরে এজিদের কাছে ইমাম হোসেনের কাটা শির দেয় এবং এই দেখে কুফার এজিদ অত্যন্ত খুশি হয়। এজিদ ইমাম হোসেনের কন্যা ফাতেমাকে নিজের পিতার কাটা শির উপহার দেয় খোরমা হিসাবে খাওয়ার জন্য। ইমাম কন্যা এজিদের এইরকম নিষ্ঠুর কর্মের জন্য ধিক্কার জানায় এবং নিজের পিতার শির দেখে শোকপ্রকাশ করে।

কি দোষে কাটিল শির বাপের আমার।

কেমনে কাটিল শির দয়া নাই তার।। (পৃ.২৫৬)

অন্যদিকে হোসেন পুত্র জয়নাল আবেদীন পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা জানালে এজিদ ভয়ে ত্রস্ত হয়। একসময় হজরত আলি আয্বাজ শহরে কুফার নিধন করতে যায়। সেই শহরে দুর্দান্ত প্রভাবশালী নারী বিবি হনুফার সঙ্গে আলি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, যুদ্ধের শর্ত অনুযায়ী শেষপর্যন্ত পরাজিত হয়ে হনুফা বিবি হজরত আলির বান্দিতে পরিণত হয়। এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই হনুফা হানিফা নামে পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। পরবর্তীতে কুফারদের বন্দি জীবন থেকে জয়নাল আবেদীনকে হনুফা উদ্ধার করে এবং

মদিনায় পৌঁছে পুত্র হানিফা কুফার জাতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়ে ওঠে। পুনরায় এজিদের নির্দেশমতো সীমার যাত্রা করে মদিনার দিকে কিন্তু তাঁর শেষ রক্ষা হয়নি তাঁরের আঘাতে সীমার মৃত্যুবরণ করে। একে একে কুফারদের সকলেই নিহিত হয়, এজিদ নিজের কর্মফলেই কূপের মধ্যে অগ্নিরশ্মি উৎসারিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। জয়নাল আবেদীন নতুন করে বাদশা রূপে রাজত্ব ফিরে পায়। এইভাবেই কাব্যটি শেষ হয়েছে।

## গরীব গদাই

(অধীন তৈয়ব, জয়রাম দাস, অধীন বালক)

**পুঁথি পরিচয়:** শ্রীপঞ্চগনন মণ্ডল সম্পাদিত ‘পুঁথি-পরিচয়’ (চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থে এই পুঁথিটির কথা জানা যায়। এই পুঁথিটি কোনও একক লেখকের হাতে বদ্ধ থাকেনি, ভগিতা অংশে এর উল্লেখ আছে।

এই পুঁথিটি অখণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়, বিশ্বভারতী ক্যাটালগে পুঁথিসংখ্যা-১৫৪২, পত্রসংখ্যা-৮৩। আকার  $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{২}$  ইঞ্চি। আধার তুলটে লেখা, লিপিকাল আনুমানিক ১২০১ সাল। বীরভূমের রাজনগর এলাকায় হরিশপুর গ্রামে হরসতুল্লার পুত্র বদর উল ইসলামের বাড়ি থেকে অধ্যাপক সুমঙ্গল রাণা এই পুঁথিটি সংগ্রহ করেন।

**কাহিনি সংক্ষেপ:** অধীন তৈয়ব, জয়রাম দাস, অধীন বালক রচিত ‘গরীব গদাই’ পুঁথিটিকে জঙ্গনামা সাহিত্যের পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লেখা হয়েছে। হজরত রসুল তাঁর জামাতা হজরত আলি এবং তাঁর দুই পুত্র ইমাম হাসান ও হোসেনের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। মূলত কাফের জাতির সঙ্গে মদিনাবাসীর যুদ্ধের যে ঘটনা, রসুলের প্রতি কুফার জাতির যে উদাসীনতা-বর্বর আচরণ তা এখানে কবির বক্তব্যে স্পষ্ট।

জোনমাত শহরের নামকরা বাদশা গরীব গদাই (কুফার জাতি), সে আল্লাহতাল্লা এবং রসুলের কোনরকম আদর্শকে মানে না। শহরের সমস্ত মানুষ যেন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে সেই চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে একধরনের ভীতির সঞ্চার করে।

মোছলমান হএগা বলিবেক আল্লা রছুল।  
জানবার্চা মারিএগা তার করিব নিরমুল।।  
হিন্দু হএগা ভজিবেক জেবা নৈরেকার।  
আমার কহরে পড়িলে নাইখ নিস্তার।।  
খেতে ষুতে মেরা নাম নিবেক সদাই।  
সোবার বেলায় বলিবেক গরিব গদাই।। (পৃ.১৩৭)

আল্লাহতালার হুকুমমতো জিবাইল জোলমাত শহরে পৌঁছে বাদশার পালঙ্গ উল্টে দেয় এবং বাদশাকে মৃত্যুর কথা শোনায়। শহরের বহু গুণী মানুষজনের কাছে বাদশা জানতে চাই কীভাবে এবং কার দ্বারা সে নিহত হবে। এই কথা শুনে হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মুসলমান মোল্লা সকলেই চিন্তিত। কিছুদিন পর সকলে মিলে একত্রিত হয়ে বাদশাকে জানায় হজরত আলির হাতে তার মৃত্যু হবে।

আরবদেশে হজরত আলির বাসস্থান, সে একাই নিজ শক্তিবলে বাদশাকে হত্যা করবে। এই কথা শুনে বাদশা আলিকে মারার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে এবং আরব দেশে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়। অন্যদিকে হজরত আলি নিজেও তৈরি হয় কুফার জাতির সঙ্গে লড়াই করতে, কিন্তু রসুলের কথা অমান্য করে যুদ্ধে যেতে পারেনি। আল্লাহ এইরকম দৃশ্য দেখে নিজেই ফকির বেশে হাজির হয় রসুলের কাছে এবং ফকির ভিক্ষার পরিবর্তে নিজের গুদড়ি বহনের জন্য একজন চাকর দেওয়ার কথা জানায়। আবুবক্কর, ওমর, ওসমান কেউ ফকিরের সঙ্গে যেতে রাজি হয়নি কিন্তু রসুলের নির্দেশ পেয়ে হজরত আলি ফকিরের সঙ্গে নেয়। ফকির আলিকে সঙ্গে নিয়ে ষোলো ক্রোশ পথ অতিক্রম করে জোনমাত শহরে পৌঁছায় এবং আলির নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম হয় নগুখরিদ। এই শহরে আজাজিল নামে এক ধনবান সওদাগরের সঙ্গে ফকিরের আলাপ হয়, ফকির সওদাগরকে জানায় চরম দুর্দশার জন্য সে নিজের পুত্র (আলি)কে বেঁচে দিতে চাই। সওদাগর নয় লাখের বিনিময়ে হজরত আলিকে কিনে নেয়। আজাজিল সওদাগর আলিকে নফর হিসাবে নিয়োগ করে যেকোনও কাজের জন্য। ইতিমধ্যেই বাদশা গরিব গদাই আমির ওমরাদের মুখে হজরত আলির কথা জানতে পারে। বাদশা দশ লাখ টাকার বিনিময়ে আলিকে কিনে নেয় পুনরায়। বাদশার

কথা মতো একে একে আশ্চর্যজনক কাজ করতে থাকে হজরত আলি। একসময় বাদশার প্রতাপ বিনষ্ট করতে হজরত আলি গরিব গদাই এর সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং গরিব গদাই নিহত হয়। জোনমাত শহরবাসী আলিকে বাদশা রূপে প্রশংসিত করে। এইভাবে কাব্যটি শেষ হচ্ছে। মানুষের শান্তির কথা ভেবে কাফের জাতির ধ্বংসের জন্য ফকির হজরত আলিকে সাহায্য করেছে। এই কাব্যে পুরোপুরি যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হয়েছে যা কাব্যকে অনেকখানি তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।

### ওফাতনামা (অনন্দি নাগর)

**পুঁথি পরিচয়:** শ্রীপঞ্চগনন মণ্ডল সম্পাদিত ‘পুঁথি-পরিচয়’ (চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থে এই পুঁথিটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুঁথিটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়, বিশ্বভারতী ক্যাটালগে পুঁথিসংখ্যা ১৫৩৯। লিপিকাল আনুমানিক ১২০১ সাল, আকার  $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{২}$  ইঞ্চি। পুঁথিটি আধার তুলটে লেখা হয়েছে এবং মোট প্রাপ্ত পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০ টি।

**কাহিনি সংক্ষেপ:** অনন্দি নাগর রচিত পুঁথিটি জঙ্গনামা জাতীয় কাব্য। কাব্যের প্রথমেই ‘বন্দনা’ অংশের কথা জানা যায়।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছল্লল্লা আলেহে ছল্লাম।

বিছমিল্লা হেররাহ মানের রহিম।। (পৃ.৫৫)

ইসলামি রীতি অনুযায়ী মূলত নবিজি এবং তাঁর ওলিদের মৃত্যুর দিনযাপনের ক্ষেত্রে ‘ওফাত’<sup>৯</sup> কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। মোহাম্মদের মৃত্যু এবং কারবালার ময়দানে ইমাম হাসান ও হোসেনের মৃত্যুর কথাকে স্মরণ করেই এই কাব্যের সারবস্তুকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। জিবাইল মারফত নবি নিজের মৃত্যুর কথা জানতে পারে। এছাড়া রসুল স্বপ্নের মধ্যেই জানতে পারে ফাতেমা এবং হজরত আলির দুই পুত্র হাসান ও হোসেনের শহিদ হওয়ার কথা। আমরা সম্পাদকের সংগৃহীত পুঁথি থেকে এই অংশটুকুর পরিচয় পাচ্ছি।

এই পুথিটি ছাড়াও রাধাচরণ গোপ রচিত ‘আফৎনামা’ কাব্যের কথা জানতে পারি। এই পুথিটি শ্রীপঞ্চগনন মণ্ডলের সম্পাদনায় ‘পুঁথি-পরিচয়’ (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই পুথিটি খণ্ডিত। বিশ্বভারতী ক্যাটালগে পুথি সংখ্যা- ৬৮২। আকার ১৩×৭½ ইঞ্চি, আনুমানিক লিপিকাল ১২৩৪ সাল। বোলপুর-শ্রীনিকেতনের সন্নিহিত লোহাগুড়ি গ্রামে পাওয়া যায়। এই কাব্যটির বিষয়সংক্ষেপ খুব বেশি জানা সম্ভব হয়নি, এখানে যতটুকু পাওয়া গেছে তাতে বর্ণিত হয়েছে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে কারবালার ময়দানে ইমাম হোসেনের মাথার শির কাটা যায় এবং সেই শির ফেরেস্তা ফারফত কিভাবে দাফন হয়।

মুসলমান সাহিত্যিক ছাড়াও বেশ কিছু হিন্দু সাহিত্যিক যাঁরা ইসলাম ধর্মের মিথগুলোকে নিয়ে নিজেদের মতো কাব্য রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের লেখকরা কারবালার ময়দানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করেছেন অন্যদিকে মুসলমান শক্তির কাছে অন্যান্য জনজাতির পরাক্রমশীলতাকে তুলে ধরেছেন।

### ঘ. নীতিশাস্ত্রমূলক রচনা

মুসলমান সাহিত্যিকরা ইসলাম ধর্মের নানারকম শাস্ত্রকথাকে নিজেদের ভাবনায় প্রসারিত করে বহু ধরনের সাহিত্য রচনা করেছেন। এই ধরনের রচনা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে লেখকদের হাতে।

#### ফকির বিলাস ও মারফতি সওয়াল জওয়াব

(এনাতুল্লাহ সরকার)

প্রণেতা: মরহুম এনাতুল্লাহ সরকার সাহেব।

প্রকাশক: জি. কে. প্রকাশনী, ৩০, মদনমোহন বর্মন স্ট্রীট, কলকাতা- ৭, সন ১৪০৩।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৫

মূল্য: ১৫.০০ টাকা মাত্র

ইসলামি শাস্ত্র বিষয়ক অনেক তথ্য উঠে এসেছে এই কাব্যে। মুরিদের সওয়াল ও পীরের জওয়াব নিয়ে রচিত কাহিনি। মুসলমান সমাজে কিছু সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন

যাঁদের ভক্তিতে নিবেদিত থেকেছে মুরশিদ বা গুরুর কথা। এই কাব্যটি সেই গূঢ়তত্ত্বে  
ভরপুর। কাব্যটির রচনাকাল ১২৯৩ সাল।

**কাহিনি সংক্ষেপ:** কাব্যের প্রথমেই সৃষ্ট জগত সম্পর্কে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

সকলি করিলে সৃষ্টি নীত নিরাঞ্জন।

আপনার নুর দিয়া সৃজিল রছুল।। (পৃ.১)

পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত নীতিশাস্ত্রের কথা এখানে বর্ণনা  
করেছেন। ইসলামের প্রবর্তক স্রষ্টা রসুলের কথা বলেছেন এবং তাঁর হাতেই পবিত্র  
'কোরান' তৈরি সেই বিষয়ে ধারণা দেন। পবিত্র কোরানের কত অক্ষর, কতগুলি আয়াত  
এবং কত কলেমার সমাহার তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। মুসলমান সমাজের মানুষ  
নামাজের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম মেনে চলবে তার কথাও এখানে বলা হয়েছে। হাদিসের  
মধ্যে মুসলমানদের অনেক নিয়ম-নীতি প্রচারিত হয়েছে, সেই বিষয়ে এখানে অনেক  
তথ্য উঠে এসেছে। একজন মুরিদ তার মুরশিদের কাছে কোরান শরীফের ব্যাখ্যা শুনতে  
চাই। পবিত্র কোরান এ কোন সুরা কি কি ভাবে পরিবেশিত হয়েছে সেই সম্পর্কিত  
ব্যাখ্যা জানা যাচ্ছে। পীর বা ফকিরদের নিয়ে বহু কথা আলোচিত হয়েছে, হিন্দু-  
মুসলমান নির্বিশেষ পীরদের ভক্তির কথা আমরা জানতে পারি। প্রথম ফকির হিসাবে  
নিরাঞ্জনের কথা পাচ্ছি, দ্বিতীয় ফকির হলেন নবি রসুলুল্লাহ, তৃতীয় ফকির আলী  
করমুল্লা এছাড়া চতুর্থ খাজা মঈনুদ্দিন। জগত সংসারের গুরু হিসাবে কাকে মেনে  
চলবে তা মুরিদের প্রশ্নে উঠে আসে। নাছুত, লাহুত, মালকুত এবং জবরুত বিষয়ক  
আলোচনা এসেছে। এই চারটি স্তরে সুফি তত্ত্বের সাধনা চলে, যিনি বা যে সবগুলি  
স্তরেই সিদ্ধি লাভ করেন তিনিই মুরশিদ। গুরু (মুরশিদ) এবং শিষ্যের (মুরিদ) সম্পর্ক  
কেমন হওয়া উচিত এছাড়া শরীরের নানা প্রসঙ্গের কথা আছে। জন্ম-মৃত্যু রহস্য, স্বর্গ-  
মর্ত্য ধারণা, বেহেস্ত-দোজখ ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যের ভিতর দিয়ে  
আসলে মুসলমান সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে তাঁদের ধর্মের নীতি, আদর্শ ও জীবনে  
চলার পথকে নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে।



ছহি আবুসামা  
(জয়নাল আবেদীন)

প্রণেতা: মরহুম জয়নাল আবেদীন সাহেব প্রণীত।

প্রকাশক: ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ৩০ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, সন ১৩৯৩  
সাল।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২০

মূল্য: ৬.০০ টাকা

জয়নাল আবেদীন এই পুথি রচনা করেন আবুশামা নামে এক বান্দার জীবনকে কেন্দ্র করে। আবুশামার ঘটনা ইসলাম জগতে একটি অন্যতম কাহিনি। হজরত মোহাম্মদের জীবনকালের একটি ঘটনা। হযরত ওমর ফারুক এর পুত্র এই আবুশামা।<sup>১</sup>

**কাহিনি সংক্ষেপ:** কাজির পুত্র আবুশামা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে যেভাবে জীবনত্যাগ করে তারই কাহিনি নিয়ে এই কাব্য। আবুশামা নবির আদেশ মতো মসজিদে গিয়ে কোরান পাঠ করে। শহরের সমস্ত লোকজন আবুশামার কোরান পাঠ শুনতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আবুশামা প্রথমেই ‘বিসমিল্লা’ বলে ‘আলেফলাম’ এই ভাবে কোরান পাঠ শুরু করে। সমস্ত লোকজন আবুশামার কোরান পাঠ শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে। কোরান পাঠের পড় আবুশামা জ্বরে জর্জরিত হয়, এই সময় থেকেই শয়তান তাকে নানারকমভাবে প্ররোচনা দিতে শুরু করে। জ্বরের ঔষধ হিসাবে সরাব (মদ্য জাতীয় পানীয়) খেতে পরামর্শ দেয়। এই কথা শুনে আবুশামা কানে হাত দিয়ে ‘তওবা অস্তাগফার’ বলে ওঠে। সে জানে সরাব পান করলে তার ফলশ্রুতি কি হতে পারে।

শরাব পিইলে আল্লাহ হুকুম হবে রদ।

রোজ কেয়ামতে বেজার হবেন মোহাম্মদ। (পৃ.৫)

আবুশামার এইধরনের কথা শুনে শয়তান মনে মনে নিজের মতো ফন্দি আঁটতে ব্যস্ত যেভাবেই হোক আবুশামাকে দিয়ে তাঁর স্বার্থ চরিতার্থ করবে। শয়তান কুমতির রূপ ধরে আওল মুছল্লি সেজে আবুশামার কাছে উপস্থিত হয়। আবুশামাকে কোরান পাঠ করতে আদেশ করে এবং জমজমার পানি খেতে দেয়। আবুশামা বিসমিল্লা উচ্চারণ না

করেই ভুলবশত সেই পানি পান করে। আবুশামা পরমুহূর্তেই অচেতন হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আবুশামা বেগম নামে এক বুড়ির বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

ঝড়ের সময় আবুশামা বেগমের বাড়ি গিয়ে দেখে বুড়ি হাতে গেছে, মেয়ে পিজ্জিরা (১৪ বছর বয়স) ঘরে একা বসে আছে। আবুশামাকে দেখে পিজ্জিরা লজ্জা পেয়ে ঘরের কোণে আশ্রয় নেয়। পিজ্জিরাকে শয়তান কাম-বাণ মারে, তারফলে পিজ্জিরার সমস্ত লজ্জা দূর হয়ে যায়, প্রেমের সাগরে সে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। পিজ্জিরা আবুশামাকে নিজের বাড়িতে ডেকে অতিথি সেবা করতে থাকে। পিজ্জিরা নিজের যৌবনের কথা আবুশামাকে বলে। কিন্তু আবুশামা তার গৃহ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কথা জানায়। শয়তান বাঘের রূপ ধরে আবুশামাকে ভয় দেখায়, শেষে আবুশামা পিজ্জিরার বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নেয়। পিজ্জিরা হাত ধরে আবুশামাকে খাটে বসায়, সমস্ত কিছু ভুলে আবুশামা পিজ্জিরার রূপে মুগ্ধ হয়ে শারীরিক মিলনে লিপ্ত হয়। বুড়ি হাট থেকে ফিরে দেখে আবুশামা ও পিজ্জিরা একসঙ্গে শুয়ে আছে। আবুশামার উদ্দেশ্যে বলে- 'আইবুড় বেটি মোর খেলি জাতপাত। কুল গেল কলঙ্কের ডালি হৈল হাত।' (পৃ.১০)

পিজ্জিরা গর্ভবতী অবস্থায় যথাসময়ে বেগম বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে কাজির দরবারে উপস্থিত হয় বিচারের জন্য। সমস্ত ঘটনা শোনার পর কাজির আদেশমতো চারজন পিয়াদা আবুশামাকে ধরে আনে। কাজি 'কোরান' এর ফরমান মেনে আবুশামার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার কথা জানায়। চারশো জন মোল্লা 'কোরান' খুলে শাস্তির উপায়স্বরূপ একশো (১০০) ঘা প্রহারের আদেশ দেয়। আঘাতে জর্জরিত হয়ে আবুশামা মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। আশি দোররা আঘাত খেয়ে আবুশামা মারা যায়, কাজির আদেশ মতো বাকি দোররা আবুশামার কবরের উপর মারা হয়। এইভাবেই আবুশামার পুঁথি শেষ হচ্ছে।

ইসলামি নীতিশাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাব্য, শাস্ত্র অনুযায়ী বিচারব্যবস্থা কত কঠোর তা এই কাব্যের বর্ণনায় উঠে এসেছে।

**ছহি বড় ছায়েত নামা**

**(আবদুল ওয়াহাব)**

প্রণেতা: মরহুম আবদুল ওয়াহাব সাহেব।

প্রকাশক: জি. কে. প্রকাশনী, ৩০, মদন মোহন বর্মণ স্ট্রীট, কলকাতা-৭, সন ১৪১৭।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৪

মূল্য: ৫০ টাকা

মুসলমান সাহিত্যিকদের হাতে এই ধরনের রচনা সম্পূর্ণভাবেই ইসলাম ধর্মের রীতি-নীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়। এই কাব্যে মানুষের জীবনধারণের ক্ষেত্রে অনেক শাস্ত্রকথার উল্লেখ আছে এবং এর মধ্য দিয়েই ইসলামি সংস্কৃতির দিকগুলি বেশ স্পষ্ট হয়। চাঁদ ওঠার সময় নির্ধারণ করেছেন এবং কোন চাঁদে কি কি কাজ করলে সুফল পাওয়া যাবে সেই সম্পর্কিত তথ্য জানা যাচ্ছে। মহরম মাসের চাঁদ দেখা এবং এই চাঁদে ঘর বানাতে, বিবাহ করলে তার কুফল সম্পর্কে জানা যায়। ইসলামের প্রতিটি মাসের বর্ণনা এখানে পাওয়া যায়। ছফরের চাঁদ, রবিয়ল আউয়ল চাঁদ, জেলকদ মাসের চাঁদ ইত্যাদি মাসগুলির বিবরণ আছে। এই কাব্যে জকিনামা (এক ধরনের আমল) বিষয়ক আলোচনা করেছেন। প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিটি দিন মানুষের জীবনে কিভাবে অতিবাহিত হবে সেই দিনগুলির (শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার) কথা আলোচিত হয়েছে। সাধারণত ইংরেজি হিসেবে ২৪ ঘন্টায় দিন-রাত হয় কিন্তু ইসলামিক সময়ের গণনায় ৬৪ ঘড়িতে রাত-দিন হয়। এছাড়া এই কাব্যে পুরুষ ও নারীর আলাদা আলাদা ভাবে রাশি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে অনেক চিত্রকে সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

**ছহী তেলেছমাত্ ছোলেমানী**

**(হাকিম মোহাম্মদ মোয়াজ্জম)**

প্রণেতা: হাকিম মোহাম্মদ মোয়াজ্জম মরহুম।

প্রকাশক: ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ৩০ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, সন ১৩৯৩

সাল।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৮০

মূল্য: ৬০ টাকা

এই কাব্যটিতে ইসলামি নীতিশিক্ষা ও ইসলামি জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা জানা যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের রাশির ফলাফল সম্পর্কে জানা যাচ্ছে এবং তা নারী-পুরুষ উভয়ের জীবনে আলাদা আলাদা বার্তা বহন করছে। বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে শাস্ত্রের কথাকে তুলে বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

মৌলদ দীল পিজির  
(মাওলানা নুরুল ইসলাম)

প্রণেতা: মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেব।

প্রকাশক: ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ৩০ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, সন ১৩৯৩  
সাল।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৪

মূল্য: ১৫ টাকা

মাওলানা নুরুল ইসলাম রচিত এই কাব্যটিতে পুরোপুরি ইসলামি রীতি-নীতির কথা বলা হয়েছে। মিলাদ শুরু, গজল, রাওয়াজেত নজম, তাওলুদ শরীফ, হজরতের প্রশংসা বাণী এছাড়া আল্লাহ'র নিকট মোনাজত এর বিভিন্ন নিয়ম এই কাব্যে জানা যাচ্ছে।

### ঙ. পীরকেন্দ্রিক সাহিত্য

মুসলমান সাহিত্যিকরা যে সময়পর্বে কলম ধরেছেন, এই সময়ে গোটা বঙ্গদেশের চালচিত্রে সামাজিকতায় বিরাট বদল ঘটে। বঙ্গে ইসলাম আগমনের পর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের সেতু তৈরি হয়। আর এর মধ্য দিয়েই পীর সাহিত্যের বিকাশ ঘটে, পীর কাব্য রচিত হতে শুরু করে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে। কথিত আছে মুসলিম শাসনের পর থেকে হিন্দুর বহু দেব-দেবী মুসলমানের হাতে প্রতিপক্ষ দেবতার আসনে লিপ্ত হয়। যেমন-সত্যনারায়ণ সত্যপীরে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র সত্যপীর নয়, মানিকপীরের মাহাত্ম্যের কথাও এ প্রসঙ্গে উঠে আসে। গিরীন্দ্রনাথ দাসের বক্তব্যে জানা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ফকিরবেশী ধর্ম ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণে মিশে গেছে।<sup>১১</sup>

পীর সাহিত্যকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্বিশেষে যে সংস্কৃতির ভাব-মূর্তি তৈরি হয় তা সাধারণ মানুষ খুব সহজেই গ্রহণ করে নিতে পারে। আমরা এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র পীর সাহিত্যগুলো সম্পর্কে ধারণা নেব, পরবর্তী অধ্যায়ে পীর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির যে মিলন ক্ষেত্র সামাজিক জনমানসে তৈরি হচ্ছে সেই কথা জানব। মধ্যযুগের পুথির পাতায় আমরা অনেক রচনা পাই গরীবুল্লাহ রচিত ‘সত্যপীরের পুঁথি’, ফৈজুল্লা রচিত ‘সত্যপীরের পাঁচালী’, আরও লক্ষণীয় মুসলমান সাহিত্যিকদের লেখাতেই কেবলমাত্র পীরদের কথা জানতে পারছি এমনটা নয়, মুসলমান সাহিত্যিক ছাড়াও সত্যপীরের কাহিনিকে বিষয়বস্তু করে লিখেছেন কৃষ্ণহরি দাস গ্রন্থের নাম ‘বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথি’, এই রচনাগুলি ছাড়া শঙ্কর আচার্য্য এবং ভারতচন্দ্র রায় সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য বিষয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ বিষয়ে সুমন্ত ব্যানার্জী বলেন-

“Bharatchandra Ray of Vidya-Sundar fame wrote a long poem on Satyapeer- a very popular godhead who appeared to have emerged from the fusion of an old Hindu god, Satyanarayan, and a Muslim peer.”<sup>১২</sup>

### গীত মদন গুড়িয়া (গরীব তৈয়ব)

**পুঁথি পরিচয়:** শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ‘পুঁথি-পরিচয়’ (চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থে এই পুঁথিটির পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যখানি মুদ্রিত। মুদ্রিত পুঁথিতে গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়- ‘গীত মদন গুড়িয়া’। বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুঁথিসংখ্যা- ১৫৪৩। পত্রসংখ্যা ৫৩টি। পুঁথিটি অখণ্ডিত। আকার  $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{২}$ , আধার তুলটে লেখা, লিপিকাল আনুমানিক ১২০১ সাল। ছন্দ: নাচাড়ি এবং ত্রিপদী। প্রথম পংক্তির শেষে এক দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে দুই দাঁড়ি এইভাবে পুঁথি লেখা হয়েছে। ভণিতা অংশে কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন যেভাবে- ‘অধিন তৈয়বে দেখ এই রস গায়।’

**কাহিনি সংক্ষেপ:** গরীব তৈয়ব রচিত ‘গীত মদন গুড়িয়া’ কাব্যটিতে সত্যপীরের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর ‘বন্দনা’ দিয়ে কাব্য শুরু হয়েছে-

আল্লার কউসে এখন নোঙাঐঃঐঃ মাথা। (পৃ.১৬৪)

পীর সাহিত্যগুলো অধিকাংশই পাঁচালির ঢঙে পঠিত হত, গরীব তৈয়ব নিজেও সেই পথের পথিক হয়েছেন। সিদ্ধবিষ্ক শহরে মদন ও তাঁর স্ত্রী গুড়িয়া প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী এবং তাঁদের সাত পুত্র ও সাত পুত্রবধূ নিয়ে সুখের সংসার। একদিন সত্যপীর ফকির বেশে মদন-গুড়িয়ার গৃহে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করে এবং বাড়ির ছোট পুত্রবধূ রত্নাবতি ফকিরের আওয়াজ পেয়ে একমুঠো চাল আঁচলে নিয়ে বাইরে আসে। কিন্তু ফকির চাল ফিরিয়ে দিয়ে ভাত রেঁধে খাওয়ানোর কথা বলে কারণ ক্ষুধায় তার অন্তর জ্বলে যাচ্ছে।

খির্দ্রায় অন্তর আমার জেছে গ পুড়িঞা।

মোর অন্তস ঠাভা কর থোড়া অর্ন দিঞা।। (পৃ.১৬৫)

ফকিরের কথা শুনে রত্নাবতি হাঁড়ির ভাত কলসিতে ভরে পুকুরের ঘাটে নিয়ে যায়। সেখানে অপেক্ষারত ফকিরকে ভাত দেবে এমন সময় হাজির হয় রত্নাবতির ননদ। বাড়ির বধূর এই আচরণ তাঁর ননদের দৃষ্টিতে খুবই খারাপ ভাবে ধরা দেয় এবং পরিবারের সমস্ত লোকজনদের ঘটনার কথা জানায়।

ননদিনি ঘরকে জেঞা বলে দৌড়াদৌড়ি।

আজি তোমার ছোট বৌ হেষ্ট করেছে দাড়ি।।

কোথাকার জবন ফকির ছিড়েকাঁথা গায়।

তাখে ভাত দেয় গা পুখুরগাবায়।। (পৃ.১৬৫-১৬৬)

এইকথা শুনে মদন নিজের পুত্রবধূকে প্রহার করে এবং নিজের পুত্র জানকীকে আদেশ করে তাকে বনবাস দেওয়ার জন্য। রত্নাবতি নিজেও একরাশ দুঃখ নিয়ে বনবাসের জন্য প্রস্তুত।

গুরুর ভজন বিনে      নাই কীছু মোর মনে      তবে কেনে এত অবিচার।।

সমুর সাষুড়ি ঘরে      সেবা কৈলাম বহুতরে      পতিসেবা কৈলাম রাত্রিদিনে।।

ডরে ডরাইঞা ঘরে      সেবা কৈলাম বহুতরে      তবে বিধি বাম হৈল কেনে।।

(পৃ.১৬৭)

গভীর অরণ্যমধ্যে ঘোর অন্ধকারে একা রত্নাবতিকে ছেড়ে যেতে জানকীর মন কাঁদে, অস্থির মন নিয়ে শেষপর্যন্ত জানকী সত্যপীরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। সত্যপীরের আদেশে বনের ভিতর বিশ্বকর্মা সোনার মন্দির বানিয়ে দেয় রত্নাবতির থাকার জন্য, এইভাবে দিনের পর দিন তাঁর জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। শুধুমাত্র রত্নাবতি নিজে একা এই কষ্টের সম্মুখীন তা নয়, গর্ভজাত সন্তান পেটে নিয়েই এক অনিশ্চয়তার মধ্যেই জীবনধারণ করেছে। সত্যপীর নিজের কেলামতি দেখিয়ে সমস্ত মানুষের মনের মধ্যে এক বিশ্বাসের জায়গা তৈরি করে নেয়, যা এই কাব্যেও আমরা দেখতে পাই। রত্নাবতির দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে সত্যপীর তাঁর পরিবারকে স্বপ্নে আদেশ দেয় রত্নাবতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। গভীর অরণ্যমধ্যে পরিবারের সকলে উপস্থিত হয় রত্নাবতিকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশায় কিন্তু রত্নাবতি অভিমানের সুরে কথা বলে সকলকে মর্মান্বিত করে।

কলঙ্কিনি কন্যা আমি জগতে জান গো তুমি কেমনে লঞা যাবে ঘর।।

(পৃ.১৭৫)

সমস্ত আত্মীয়পরিজন রত্নাবতিকে অগ্নিপরীক্ষা দেওয়ার কথা জানায়, এইকথা শুনে রত্নাবতি আগুনের মধ্যে বসে সত্যপীরের নাম উচ্চারণ করে। সত্যপীরের কৃপায় রত্নাবতি জীবন ফিরে পায় কিন্তু নিজের স্বামীর দৃষ্টিতে সে অপরাধী, বনবাসের সময় রত্নাবতি তিনমাসের গর্ভের কথা জানকীকে জানালেও দীর্ঘদিনের টানাপোড়েনে সে কথা তাঁর স্বামী স্বীকার করতে বাধ্য নয়। রাগের বশবর্তী হয়ে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়, স্ত্রীর মাথা দুখণ্ড করে দিতে চায় অস্ত্র দিয়ে। যখনই জানকী স্ত্রীর মাথায় অস্ত্রের আঘাত করে ঠিক সেই সময়েই সত্যপীর বধূর মাথায় অবস্থান করে তাকে স্বামীর হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলে এবং জানকীকে শূন্যে তুলে নেয়। সমস্ত জ্ঞাতি-কুটুম্ব এবং পরিবারের লোকজন হায় হায় করতে থাকে পুত্রের এমন অবস্থা দেখে। সকলে একত্রিত হয়ে জানকীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ। শূন্য থেকে সত্যপীর সকলের উদ্দেশ্যে বাণী ঘোষণা করে সেই পীরকে শিরনি<sup>১০</sup> দেওয়ার জন্য।

সন্যে থেকে বলেন পির ষুন আমার বানি।

একীন করিঞা দাও গা পিরের সিরিনি।। (পৃ.১৭৯)

শেষপর্যন্ত কুবুদ্ধি মদনের সুবুদ্ধি ফিরে আসে নিজের পুত্রের শুভকামনায় সে ভক্তিভাবে পীরের কাছে শিরনি মানে। মদন ছাড়াও পরিবারের বাকি লোকজন, আত্মীয়পরিজন প্রতিবেশী সকলে মিলে সত্যপীরের শিরনি মানে, সকলেই সত্যপীরকে সন্তুষ্ট করতে আটা, গুড়, দুধ, কলা সহযোগে পূজা করে। সকলের ভক্তিতে খুশি হয়ে সত্যপীর জানকীর জীবন ফিরিয়ে দেয়। এইভাবেই কাব্যটি শেষ হচ্ছে। আসলে সত্যপীর নিজে সমস্ত ধরনের মানুষের থেকে পূজা আদায়ের জন্য বারে বারে নিজের মহিমা প্রকাশ করেছে এই কাব্যে আমরা তারই চিত্র দেখতে পাই। পুরো কাব্যটিতে একটি পারিবারিক জীবনের ঘটনাকে তুলে ধরে সত্যপীরের অলৌকিক ক্ষমতা এবং মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

**সত্যনারায়ণের পুথি**

**(শ্রীকবিবল্লভ)**

প্রণেতা: শ্রীকবিবল্লভ।

সম্পাদক: শ্রীযুক্ত মুঙ্গী আব্দুল করিম।

প্রকাশক: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা, ২৪৩/১ নং অপার সার্কুলার রোড,

সন ১৩২২।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫০

মূল্য: ১০ পয়সা

মুসলমান সাহিত্যিক ছাড়াও পীর কেন্দ্রিক সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে শ্রীকবিবল্লভের নাম উঠে আসে, কাব্যের নাম 'সত্যনারায়ণের পুথি'। মূল পুথিটি লেখা হয়েছে বাংলায় ১১৬২ সালের ১৮ই বৈশাখ। মধ্যযুগের সমস্ত কাব্যের শুরুতেই 'বন্দনা' অংশের বিস্তার বিবরণ পাওয়া যায়, যা এই কাব্যের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। গ্রন্থ শুরুতেই 'রাধাকৃষ্ণ' নামের উল্লেখ আছে।



কাহিনি সংক্ষেপ: শ্রীকবিবল্লভ তাঁর কাব্যে মূলত সত্যপীরের যে মাহাত্ম্য সেই গাঁথা রচনা করেছেন। পুরো কাব্যজুড়ে সত্যপীর যেভাবে সাধারণ মানুষের জীবনে পরিব্রাণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে সেইদিক থেকে এই কাব্য বেশ সার্বজনীতার জায়গা তৈরি করে নেয়। হিন্দুর সত্যনারায়ণ মুসলমানের সত্যপীর হয়ে উঠেছে কিভাবে এই কাব্যে সেই দিকটিও পরিস্ফুট হয়েছে। একদম ঘরোয়া জীবনের পরিসরে এই কাব্যের কাহিনি রচিত। রাজার আদেশে দুই ভাই (সদানন্দ, বিনোদ) সওদাগিরিতে বার হয় মধুকর ডিঙা সাজিয়ে। দুই স্ত্রীকে (সুমতি-কুমতি) আপন সহোদরা স্নেহের ভ্রাতার কাছে দায়িত্বভার দেয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। নিজেদের স্বামীর কাছে স্ত্রীরা আবদারবশত বিভিন্ন অলংকার আনার নির্দেশ দেয় দূরদেশ থেকে।

সমুদ্রপথে যাত্রায় দুই সওদাগর বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হয়। পাথরের গোর অর্থাৎ কবর মাঝ দরিয়ায় ভাসতে দেখে দুইভাই বিস্মিত হয় এবং সেই দৃশ্যের কথা সকলের শ্রবণগত হয়। বর্ষেশ্বর নৃপতি এই ঘটনার কথা শুনে কোটালকে আদেশ করে তাদের দুইভাইকে রাজদরবারে হাজির করার জন্য। এই ঘটনার সত্যতা জানতে চাই রাজা দুজনের থেকে।

রাজা বলে জদি সত্য তোমার বচন।

তুরঙ্গ বারণ দিব চামর চন্দন।।

মিথ্যা হইলে গাঠ্যার গাবরে দিব যুলী।

তোমারে কাটিয়া সাধু পুজিব বায়ুলী।। (পৃ.৫)

দুই ভাই ব্যর্থ হয় এবং রাজার আদেশমতো কোটাল সেই দুইভাইকে বন্দি করে কারাগারে তাদের নিষ্ক্ষেপ করে। এইভাবে বারো বছর বন্দিজীবন কাটাতে থাকে দুই ভাই অন্যদিকে সুমতি-কুমতি স্বামী চিন্তায় বিরহে জীবন কাটাতে থাকে। স্বামীদের ঘরে ফিরে না আসায় তাদের শুভকামনায় দুই স্ত্রী নিত্যদিন গঙ্গাস্নান করে পূজা করতে থাকে। দুই স্ত্রীর নিত্যদিনের পরিচর্যার মাঝে হঠাৎ গঙ্গার তীরে সত্যপীর তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। কাব্যমধ্যে সত্যপীর 'ফকির' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। গঙ্গার তীরে ফকিরকে দেখে সুমতি-কুমতি শিব ভেবে এগিয়ে আসে এবং সেই ঈশ্বরের

নিকট নিজেদের বর চাওয়ার কথা ভাবতে থাকে কিন্তু ফকিরের মূর্তি দেখে দুজনেই বিস্মিত হয়। সেই ফকির দুজনকেই পুত্রবতি হবার জন্য বর প্রদান করে, অসহায় নারীত্বের জ্বালা তখনও ফকিরের কাছে তারা কিছু জানায়নি কিন্তু ফকিরের বর দানের কথা শুনে দুই স্ত্রী তাদের স্বামীদের করুণ অবস্থার কথা জানায়। ফকির স্ত্রীগণকে সত্যপীরের শিরনি দিতে আদেশ করে। হিন্দু সমাজের কুলবধু হয়ে মুসলমানের পীরের ভক্তি শুনে তারা অবাক হয়।

দুজন স্ত্রী নিজেদের জাতিকুল হারিয়ে পীরের কাছে মাথা নত করতে নারাজ তৎক্ষণাৎ সত্যপীর তাদের সামনে শিবের মূর্তি ধারণ করে এবং ফকিরের এমন দৃশ্য দেখে ভক্তিসহকারে পূজা করতে থাকে। আসলে সত্যপীর সমস্ত দেবতার রূপ ধারণ করার ক্ষমতা রাখে এই কাব্যে সেই একই দৃশ্যের পরিণতি। সত্যপীরের কৃপায় দুই স্ত্রী ‘ডাকিনী মন্ত্র’ লাভ করে এবং স্বামীদের উদ্দেশ্যে দূরদেশে পাড়ি দেয়। ভদ্রাবতির তীরে ভদ্রসিল রাজার কন্যা কুন্তলার বিবাহের জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন হয়েছে, সেই বিবাহ বাসরে একশত পুরুষ বরবেশে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু সত্যপীরের কেরামতিতে কুন্তলা শেষপর্যন্ত স্বয়ম্বর সভায় কাউকে মনের মতো না পেয়ে মদনকে বরমাল্য দান করে। রাজসভার সমস্ত পরিজনেরা নানা বাক্যবাণে তাকে বিদ্ব ক করে।

অঙ্গনা সকল নিন্দে মদন সুন্দরে।

চক্ষু খায়্যা হেন কন্যা মালা দিল তারে।। (পৃ.১৯)

বিবাহের সমস্ত আয়োজন মিটে গেলে কুন্তলা ও মদন রাজসভায় ফিরে আসে সেই মুহূর্তে মদন তার ক্ষুধার কথা কুন্তলাকে জানায়। নিজের স্বামীর জন্য রন্ধনের সমস্ত আয়োজন কুন্তলা করতে থাকে। এরইমধ্যে সুমতি-কুমতি খাবারে বিষাক্ত মিশিয়ে মদনকে হত্যা করার কথা ভাবে। এই পরিস্থিতিতে সত্যপীর মদনের প্রতি সহায় থেকেছে, মদন সুবর্ণের থালায় বিষের পরিবর্তে ঔষধ মিশ্রিত খাবার খেয়ে পিঞ্জর (পাখি) হয়ে শূন্যে উড়ে যায়। অন্যদিকে সদানন্দ-বিনোদ দুইভাই দেশে প্রত্যাবর্তন করে নিজের নিজের স্ত্রীদের পছন্দের সামগ্রী নিয়ে। কিন্তু ছোটভাই মদনকে দেখতে না পেয়ে জানতে পারে ছয়মাস আগে মদন মারা গেছে। কুন্তলাকে সকলের কাছে খারাপ

প্রতিপন্ন করতে সুমতি ও কুমতি ছলনা করেছে। শেষপর্যন্ত সত্যপীরের কৃপায় অসহায় কুন্তলা নিজের স্বামীকে ফিরে পায় এইভাবে কাহিনি শেষ হচ্ছে। এই কাব্যের মধ্য দিয়ে সত্যনারায়ণের প্রতিরূপ যে সত্যপীর তা প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফুটে উঠেছে। উভয়ধর্মের মানুষের কাছে এই পীর কিভাবে পূজিত হচ্ছে তার চিত্রও স্পষ্ট।

নমো নমো সত্যপীর নোঙাইয়া সির।  
আহা কি অপূর্ব কলি যুগেতে জাহির।।  
সুনহ সকল লোক অপূর্ব কথন।  
সত্যপীর ব্রতকথা তুল্য নারায়ণ।। (পৃ.২৪)

সত্যনারায়ণ যে সত্যপীরেরই আর এক রূপ তা এই কাব্যের বর্ণনায় তুলে ধরেছেন। সত্যপীর উভয় সমাজের মানুষের কাছে পূজিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ড. তৃপ্তি ব্রহ্ম বলেছেন-

“সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর পূজার্চনা-উপাসনা ভারতের বিভিন্ন অংশে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি জেলায় এই পূজার প্রচলন দেখা যায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে। অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান সবাই এ দেবতার পূজা করে থাকেন। যেমন হিন্দুরা বলে ঈশ্বর, আর মুসলমান বলে আল্লা, ঠিক তেমনই এই পূজাও দেবতার ব্যাপারে হিন্দুরা বলে সত্যনারায়ণের পূজা এবং মুসলমানেরা বলে থাকেন সত্যপীরের পূজা।”<sup>১৪</sup>

সত্যপীরের পাশাপাশি গাজি পীরের কাহিনি নিয়ে বিভিন্ন কাব্য রচিত হয়েছে। এই পীর সমাজে কিভাবে প্রতিপত্তি স্থাপন করে তা বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে।

গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথী  
(আবদুর রহিম)

প্রণেতা: আবদুর রহিম।

প্রকাশক: শ্রী আবদুল করিম দ্বারা প্রকাশিত, রহমানিয়া পুস্তকালয়, সাং গলাচিপা, পোঃ  
আঃ হোসেনপুর, জিঃ ময়মনসিংহ, সন ১৯১৯ সাল।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৬

মূল্য: ১১ ০ আনা মাত্র

আবদুর রহিম ১২৬০ সালে (১৮৫৩ খ্রিঃ) ‘গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথী’ রচনা করেন। ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপা গ্রামে কবির জন্ম এমন তথ্য কাব্যমধ্যেই পাওয়া যায়।

**কাহিনি সংক্ষেপ:** কাব্যের প্রথমেই ‘শ্রী শ্রী হকনাম’ এই কথাটি ব্যবহার করেছেন, এর মধ্য দিয়েই কবির উদার সামাজিকতার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এছাড়া ‘বন্দনা’ অংশের অবতারণা করে মোহাম্মদ এর গুণকীর্তন করেছেন। পুরো কাব্যটি ত্রিপদী এবং পয়ার ছন্দে রচনা করেছেন। বৈরাট নগরের রাজা (ছেকান্দর সাহা) বলি রাজার কন্যা অজুপা সুন্দরীকে বিবাহ করে। অজুপার কোল আলো করে পুত্র জুলহাসের জন্ম হয়, চাঁদের সমান রূপ দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়। জুলহাস ১২ বছর বয়সে শিকারের জন্য এক গভীর কাননে উপস্থিত হয়। এই কাননে এক মায়াবী হরিণের পিছু ধাওয়া করে চলতে চলতে জুলহাস পাতাল পুরীতে প্রবেশ করে। পাতালপুরীর জঙ্গ রাজা জুলহাসকে দেখে তাকে পুত্রের ন্যায় ম্লেহ করে এবং নিজের পরমা সুন্দরী কন্যা পাঁচতোলার সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়ার মনস্থির করে। অন্যদিকে পুত্র জুলহাসের শোকে পিতা-মাতা এবং শহরবাসী সকলের মধ্যে হাহাকার রব ওঠে।

অজুপা সুন্দরী কান্দে লুটিয়া ধুলায়।।

দাস দাসী সবে কান্দে করি হয় হয়। (পৃ.৩)

অজুপা পুত্রশোকে কাতর হয়ে সাগরের তীরে যায় এবং সেখানে সিন্দুকের মধ্যে ছয় মাসের এক পুত্র সন্তানকে পেয়ে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা কিছুটা ভুলে থাকে। এই পোষ্যপুত্রের আদর করে নাম রাখে কালু। পুনরায় অজুপা গাজি নামে আর এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। ছেকান্দর রাজ্যের সমস্ত দায়িত্বভার গাজিকে দিয়ে সিংহাসনে বসাতে চায় কিন্তু গাজির রাজত্ব পরিচালনা করার অভিলাষ ছিল না। সংসার জীবন ত্যাগ করে গাজি ফকিরবেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং কালু তাকে গুরু মেনে তার সঙ্গী হতে চায়। ছেকান্দর পুত্রের এমন ইচ্ছার বিরোধিতা করতে

থাকে এবং তাকে শাস্তিস্বরূপ অনেক কষ্ট দেওয়া হয়। নিজের পুত্রকে হত্যা করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। মাছতের আঘাত, অগ্নিকুণ্ড, সাগরে নিক্ষেপ, দশমণ শিলার দ্বারাও নিজের পুত্রের হত্যায় ব্যর্থ হয়। শেষপর্যন্ত গাজি সংসারের মায়া ত্যাগ করে ভাই কালুকে সঙ্গে নিয়ে গৃহত্যাগ করে ফকিরবেশে।

পাগড়ি মানিক গাঁথা তাহার উপরে।  
জরির দলক আর পরিলেন গলে।।  
লক্ষ লক্ষ রত্ন তাতে সূর্য্য যিনি জলে।  
শোনার জিজির দিয়া কোমর বান্দিল।।  
সুবর্নের আসা আর হাতেতে লইল।  
পায়েতে দিলেন গাজি খড়ম শোনার।।  
কান্দেতে লইল ঝোলা হাতে মালা আর। (পৃ.৯-১০)

গাজি সুন্দরবন এলাকায় নিজের বসতি গড়ে তোলে এবং সেই অঞ্চলের লোক গাজিকে পীর হিসাবে সেবা করে। পথে-ঘাটে ঘুরে একসময় গাজি ও কালু ছাপাই নগরে শ্রীরাম রাজার নগরে উপস্থিত হয় এবং যবনের ঘরের সন্তান হওয়ার জন্য রাজা তাদের তিরস্কার করে অন্ন না দিয়ে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেয়। চরম অপমানিত হয়ে ফিরে এসে দুই ভাই জানতে পারে ছাপাই নগরে আঙনের শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীরাম রাজা নিজের রাজ্য ফিরে পেতে দুই ভাইয়ের কাছে ক্ষমাভিক্ষা প্রার্থনা করে এবং তাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। দুই ভাইকে রথে করে এনে নিজের রাজ্যে অতিথি হিসাবে বরণ করে এবং তাদের নানারকম দ্রব্য সামগ্রীর দ্বারা সেবা করে। গাজি ও কালু ছাপাই রাজ্য ছেড়ে অন্য পথের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সাত কাঠুরিয়ার সঙ্গে আলাপ হয় এবং তাদের দুঃখী জীবনের অবসান ঘটিয়ে সুখের রাজ্য তৈরি করে। জঙ্গলের মধ্যে নির্মিত এই রাজ্যের নামকরণ করে শোনাপুর, গাজি ও কালু দুই ভাই মসজিদ বানিয়ে নিজেদের মতো করে দিনযাপন করতে থাকে এবং সকলকে কৃপা করতে থাকে।

কোকাকফ দেশের পরিগণ দ্বারা গাজি একদিকে যেমন অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে অন্যদিকে সুন্দরী কন্যার দর্শন পায়। গাজির সুন্দর রূপে মুগ্ধ হয়ে পরিগণ তাকে উড়িয়ে নিয়ে আসে ব্রাহ্মণা নগরের মটুক রাজার কন্যা চাম্পাবতির গৃহে। সুন্দরী কন্যা গাজির রূপে মোহিত হয়ে তাকে নিজের পতি রূপে পেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে অন্যদিকে গাজিও কন্যা চাম্পার রূপে বিহ্বল। নিজেদের ইচ্ছায় দুজনেই মিলনে আবদ্ধ হয় এবং চাম্পা গাজিকে বিবাহ করে ফকিনী হতে চায়। দুজনেই নিজেদের আংটি বদল করে এবং একে অপরকে সঙ্গী ভেবে সুখের ঘুমে আচ্ছন্ন হয় কিন্তু পরিদের দ্বারা গাজি পুনরায় নিজের রাজ্যে ফিরে আসে। ঘুমাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে পুনরায় জেগে ওঠে চাম্পা গাজির দর্শন না পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে এবং রাজ্যের দাসীগণ তার আচরণে অবাক হয়ে যায়। নিজের মাতার কাছে চাম্পা যৌবনের উন্মাদনায় গাজির জন্য বিলাপ করতে থাকে।

কোথারে প্রাণের গাজি প্রাণের দোসর।।

অভাগিনী চাম্পা ডাকে হইয়া কাতর।

একবার দেখা দিয়ে শান্ত কর মন।।

নহেত তোমার সোগে ত্যজিব জীবণ। (পৃ.৩৮)

অন্যদিকে গাজি শোনাপুর রাজ্যে ফিরে চাম্পার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং ভাই কালুকে সব বৃত্তান্ত জানায়। দুই ভাই শোনাপুর রাজ্য ছেড়ে চাম্পার উদ্দেশ্যে বার হয় এবং পথ-ঘাট অতিক্রান্ত করে দক্ষিণ দেশে ব্রাহ্মণা নগরে এসে পৌঁছায়। চাম্পাবতি ফেরেস্তার স্বপ্নাদেশ পেয়ে নদীতে স্নান করতে যায় এবং নদীর অপরপারে গাজি ও কালু দুই ভাইয়ের দর্শন পায়। গাজির নির্দেশে কালু ব্রাহ্মণা নগরে চাম্পার পিতার কাছে দুজনের প্রণয় সম্পর্কের পরিণতি স্বরূপ বিবাহের কথা জানায় কিন্তু মটুক রাজা ক্রোধান্বিত হয়ে কোটালকে আদেশ করে কালুকে কারাগারে বন্দি করার জন্য। কারাগারে বন্দি জীবদ্দশায় কালু নিজের ভাই গাজিকে স্মরণ করে, গাজি ভাইকে উদ্ধারের জন্য সঙ্গী হিসাবে বাঘেদের দলে নেয়।

ব্রাহ্মণা নগরে মটুক রাজার গোসাই হিসাবে নিয়োজিত থেকেছে দক্ষিণ রায়। রাজা দক্ষিণ রায়ের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং গাজিকে পরাস্ত করতে বলে কিন্তু দক্ষিণ রায় গাজির সঙ্গে লড়াই এ নেমে পরাজিত হয় এবং তার সেবক হয়ে থাকার কথা জানায়। মটুক রাজার সমস্ত অভিসন্ধি বিফলে যায় শেষপর্যন্ত নিজের কন্যা চাম্পাকে গাজির সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয়। গাজি ও চাম্পা অনেক বাধা-বিপত্তি ঠেলে নিজেদের প্রেমের সার্থকতা খুঁজে পায়। অন্যদিকে ভাই কালু নারী জাতির মায়া ত্যাগ করার কথা জানায় গাজিকে কিন্তু চাম্পাবতি গাজিকে ছাড়া জীবনে চলার কথা ভাবতে পারেনা। গাজি চাম্পাকে আল্লাহ'র নাম স্মরণের মধ্যে বেঁচে থাকার কথা বলে এবং ভাই কালুকে নিয়ে গাজি পুনরায় পথে বার হয়। এইভাবে পথে চলতে চলতে গাজি ও কালু পাতালপুরীতে জঙ্গ রাজার দেশে গিয়ে হাজির হয়, সেখানে ভাই জুলহাসের হৃদিশ পায় এবং তিন ভাইয়ের পরিচয় ঘটে। তিন ভাই আহ্লাদিত হয়ে পরম আনন্দে নিজের নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বৈরাট নগরে ফিরে আসে। পিতা ছেকান্দর এবং মাতা অজুপা সবাইকে পরম স্নেহে ভরিয়ে দেয়।

কাব্যের শেষে শ্রীহট্ট জেলার গোবিন্দ রাজার কথা তুলে ধরেছেন। এই রাজা যবনের ঘরে গরুর মাংস দেখে এক ব্যক্তি এবং তার পুত্রকে শাস্তি দেয়। এই করুণ পরিস্থিতির জন্য জালাল পীর সহ গাজি পীর, নিজাম পীর, বদর পীর সকলে মিলে গোবিন্দ রাজাকে হত্যা করে। এই কাব্যে পীরদের যে অলৌকিক ক্ষমতা, যে বলীয়নতা তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এছাড়া দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে পীরের যে সম্পর্ক তার একটা জায়গা এখানে তৈরি হয়েছে।

এই গাজি পীরকে নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর একদম শেষের দিকে কাব্য রচনা করেন খোদা বখশ, কাব্যের নাম 'গায়ী কালু ও চম্পাবতী', রচনাকাল ১২০৫ সাল (১৭৯৮ খ্রিঃ)।<sup>১৫</sup> এছাড়া এই আলোচনা প্রসঙ্গে আরও জেনে নেওয়া দরকার কৃষ্ণরাম দাস রচিত 'রায়মঙ্গল' কাব্য সম্পর্কে, রচনাকাল ১৬০৮ সাল (১৬৮৬ খ্রিঃ)।<sup>১৬</sup> গাজি পীরের সঙ্গে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের সম্পর্ক ঠিক কিভাবে স্থাপিত হয়েছে এবং একে অপরের পরিপূরক কিভাবে হয়ে উঠেছে সেই বিষয়টি আলোচনার।

গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথী	গায়ী কালু ও চাম্পাবতী	রায়মঙ্গল
<p>আবদুর রহিম এই কাব্যে গাজি পীরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন এবং এর সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধ প্রসঙ্গ এনে শেষে তাদের মিলনের দিকটি আলোচনা করেছেন। পুরো কাব্যটির গল্পকে ধাপে ধাপে বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন গানের কথাকেও এখানে তুলে ধরেছেন। এই কাব্যের ভিতর দিয়ে আসলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের অবসান হয়েছে। গাজি ও চাম্পার প্রণয় সম্পর্ক সামাজিক বিভেদ ভুলে এক অন্য চিত্র নির্মাণ করেছে। কোনও কোনও রাজা সাম্রাজ্য অধিকারের জন্য অথবা নিজের ক্ষমতার প্রভাব বিস্তারে গাজি ও কালু পীরের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।</p>	<p>খোদা বখশ তাঁর কাব্যের বর্ণনায় পুরো বিষয়বস্তুটিকে ৫৮টি পালায় বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি পালার অংশ ত্রিপদী, পাঁচালি এবং লাচাড়ী ছন্দে বর্ণনা করেছেন, এছাড়া কিছু পালায় ‘দিসা’ নামে টুকরো অংশের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। আবদুর রহিমের কাব্যের সঙ্গে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অনেকটাই মিল আছে কিন্তু বেশকিছু জায়গায় পরিবর্তন এবং পরিবর্তন লক্ষ করার মতো। চরিত্র নামের বদল হয়েছে অজুপা-ওসমা। মালিনী প্রসঙ্গ এসেছে, কালুর প্রণয়সঙ্গিনী ভানুমতির কথা এখানে এসেছে। কবি তাঁর কাব্যে গাজির ‘বারমাসী’ বর্ণনা করেছেন, সাধারণত আমরা মধ্যযুগে নারীদের বারমাসী বর্ণনার কথা জেনেছি কিন্তু এখানে পুরুষের বারমাসীর কথা জানতে পারি, বৈশাখ মাস থেকে শুরু করে চৈত্র মাস অবধি গাজির জীবনের দুঃখ বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যের মধ্যে গাজির মাহাত্ম্যই বেশি করে দেখিয়েছেন, মানুষ কিভাবে তার কৃপালাভ করেছে সেই বিষয়টিরও উল্লেখ আছে।</p>	<p>কৃষ্ণরাম দাস ৫৪ টি পরিচ্ছেদে ‘রায়মঙ্গল’ কাব্যটি আলোচনা করেছেন। মূলত মঙ্গলকাব্যের মতো করেই বলা যায় একভাবে ব্যাঘ্র দেবতার মঙ্গল অর্থাৎ যা কিছু শুভ বা যা মানুষের মঙ্গলদায়ক। এই কাব্যে আমরা দেখতে পাই দক্ষিণ রায় সাধারণ মানুষের জীবনে কতটা কৃপা করেছে। এছাড়া আরও লক্ষণীয় দক্ষিণ রায় এর সঙ্গে বড়খাঁ গাজির সম্পর্কের ইতিহাস। দক্ষিণ রায়ের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ কিভাবে গাজির পূজা করতেন এবং তাতে ভক্তনিবেদিত প্রাণ থেকেছেন তা দেখা যায়। পুষ্পদত্ত বণিক নিজের পিতাকে উদ্ধারের জন্য দক্ষিণ রায়ের স্তব করেছে অন্যদিকে পীরের মোকাম দেখে কর্ণধারের কাছে বড়খাঁ গাজির কথা জানতে চেয়েছে এবং গাজিকে ভক্তিভরে মিনতি করে।</p>



সত্যপীর বাংলার জনমানসে যে সংস্কৃতির জন্ম দেয় তা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এক মিলনের সেতুবন্ধন রচনা করে দিয়েছে। সত্যপীরের পাশাপাশি বড়খাঁ গাজি এই পীরের মধ্য দিয়েও বাংলা তথা পার্শ্ববর্তী সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের কাছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের জায়গা তৈরি হয়েছে। আসলে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের প্রতিপক্ষ শক্তি হিসাবে এই গাজি পীরের অলৌকিক ক্ষমতাকে বিভিন্ন কাব্যের মধ্য দিয়ে লেখকরা তুলে ধরেছেন। সুমন্ত ব্যানার্জী এ বিষয়ে জানান-

“A Seventeenth century Hindu poet, Krishnaram Das, composed a ballad in praise of Kalu Gazi, a Muslim peer worshipped by all for protection from tiger.”<sup>১৭</sup>

শ্রীপঞ্চগনন মণ্ডল সম্পাদিত ‘পুঁথি-পরিচয়’ (দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থে বেশ কিছু সত্যপীর কাহিনি কেন্দ্রিক পুঁথির কথা আমরা জানতে পারি। এই পুঁথিগুলির সামগ্রিক বিবরণ তুলে ধরা হল। এখানেও আমরা লক্ষ করব শুধুমাত্র মুসলমান সাহিত্যিকরাই সত্যপীরের কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনায় প্রয়াস দেখাননি, হিন্দু সাহিত্যিকরাও এই ধারণাকে নিজেদের লেখা কাব্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

কবির নাম	কাব্যনাম	পুঁথি সংখ্যা	পত্র সংখ্যা	আকার	লিপিকাল	খণ্ডিত/ অখণ্ডিত
দ্বিজ রামনারায়ণ	সত্যনারায়ণের পুঁথি	১৬৫৩	৬	$৭\frac{১}{২} \times ৩$ ইঞ্চি	আনুমানিক ১৭০ বছরের পুরাতন	খণ্ডিত
ভগীরথদাস	সত্যপীরপাঁচালী	১৮৩৫	১	$১৩\frac{১}{২} \times ৪\frac{১}{২}$ ইঞ্চি	১৫০ বছরের পুরাতন	খণ্ডিত
সেখ ফয়জুল্লা	সত্যপীরপাঁচালী	১৯০৫	৪	$১৩ \times ৫$ ইঞ্চি	১৫০ বছরের পুরাতন	খণ্ডিত
গোহর ফকির	সত্যপীরের পুঁথি	১৬৪৬	১৫	$১০ \times ৭$ ইঞ্চি	১৫০ বছরের পুরাতন	খণ্ডিত
অসিতাচরণ, দ্বিজগঙ্গাধর	সত্যনারায়ণের পুঁথি	১৬৬৫	৩০	$১৪\frac{১}{২} \times ৩\frac{১}{২}$ ইঞ্চি	১৭৫২ শকাব্দ	অখণ্ডিত

কবিবল্লভ	মর্দগাজীপালা	১৫৫৩	১২	১৩ × ৪ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি	২০০ বছরের পুরাতন	অখণ্ডিত
রামভদ্র	সত্যনারায়ণ পাঁচালী	১০২০	২০	৬ $\frac{১}{২}$ × ৩ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি	কোন তথ্য এখানে নেই	খণ্ডিত
খোকনরাম দাস	সত্যপীরের পাঁচালী	১০৮৭	১	১৩ × ৪ $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি	কোন উল্লেখ নেই	খণ্ডিত
অযোধ্যারাম	সত্যনারায়ণপাঁচালী	১৩১৬	১৭	১১ × ৪ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি	বসু বেদ ঋতু শশী শকের গণনা	খণ্ডিত
হৃদয়রাম	পীরের কালাম	৯৩৮	১	১৪ $\frac{১}{২}$ × ৫ ইঞ্চি	১৫০ বছরের পুরাতন	খণ্ডিত
শঙ্কর	পীরের গীত	৯৯৪	৬	১১ × ৪ ইঞ্চি	১৫০ বছর পুরাতন	খণ্ডিত
দ্বিজ গুণনিধি	সত্যপীর পাঁচালী	৭২২	৬	১৩ $\frac{১}{২}$ × ৩ ইঞ্চি	১৭৫ বছরের পুরাতন	খণ্ডিত
লালমোহন	সত্যপীর পাঁচালী (চন্দ্রকেতু পালা)	৭৪০	১৬	১৩ $\frac{১}{২}$ × ৫ ইঞ্চি	১২৫৭ সাল	অখণ্ডিত
শ্রীদয়াল	সত্যপীর পাঁচালী (শঙ্করগুড়্যা পালা)	৭৮৪	৪	১৪ $\frac{১}{২}$ × ৪ ইঞ্চি	১৫০ বছরের পুরাতন	খণ্ডিত
বল্লভদাস	সত্যপীর পাঁচালী (মদনসুন্দর পালা)	৯৪৫	২	১৪ $\frac{১}{২}$ × ৫ ইঞ্চি	১৫০ বছরের পুরানো	খণ্ডিত

সূত্র: শ্রীপঞ্চগনন মণ্ডল সম্পাদিত গ্রন্থ ‘পুঁথি-পরিচয়’ (দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড)।

এছাড়া লেঙ্গট্যা ফকির এর ‘সত্যপীরের পাঁচালী’ নামে একটি পুথির কথা আমরা জানতে পারি।<sup>১৮</sup> সত্যপীর, গাজি পীরের কাহিনি ছাড়াও আমরা মানিক পীরের মাহাত্ম্যের কথা জানতে পারি। মানিক পীরকে কেন্দ্র করে অনেক সাহিত্যিক কাব্য রচনা করেন। ‘মানিক’ শব্দটি ‘মানিকী’ (Manichce) শব্দ থেকে এসেছে। এটি গ্রিক (Manikhaios) থেকে এসেছে।<sup>১৯</sup> এই মানিক পীর সমাজের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজিত হতেন।

“As the mixture of Hindu and Muslim names suggests, they were worshipped by members of both the Communities, as well as by people from all castes.”<sup>২০</sup>

## মানিকপীরের জহুরানাма

(জয়রদ্দি)

**পুথি পরিচয়:** শ্রীপঞ্চনন মণ্ডল সম্পাদিত ‘পুঁথি-পরিচয়’ (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে এই পুথিটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুথির লিপিকাল আনুমানিক ১২২৪ সাল, খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী ক্যাটালগে পুথিসংখ্যা- ৯৩৬, পত্র সংখ্যা- ১২২, আকার- ১৪x ৫ ইঞ্চি। এই পুথিতে গুঞ্জর ফকিরের ভণিতায় দুটি গান আছে। কথিত আছে মুসলিম মানিক পীরের প্রতিরূপ হিন্দুর ধর্মঠাকুর (স্বরূপনারান)।

**কাহিনি সংক্ষেপ:** আল্লাহর দরগায় বদর মাথা নত করে জানায় সে ফকিরের বেশে দুনিয়ায় অবতীর্ণ হবে। আল্লাহতালার আদেশমতো বদর ফকিরের সাজে কাঁধে ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে যাত্রাপথে। দিল্লির লাহোর শহরে সুলতান বাদশার সঙ্গে দেখা করার জন্য বদর উপস্থিত হয়, এবং বদরের কথা শুনে বাদশা রাগান্বিত হয়ে তাঁকে বন্দি করার আদেশ করে।

বাদশার মেয়েকে (দুদবিবী) পালঙ্গে শুয়ে থাকতে দেখে বদর তার রূপে মুগ্ধ হয় এবং দুদবিবীর নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার পর সে বদরকে দেখে তার মধ্যে চতুর্ভুজ রূপ দেখতে চাই। বদর নিজের কেলামতিতে বিবির সামনে নিজের বেশ ত্যাগ করে রাম রূপে অবতীর্ণ হয়। বাদশার অনুমতি না পেয়ে বদর এবং দুদবিবী দুজনেই বনের মধ্যে রাম-সীতা হয়ে বহুদিন জীবন কাটায়। গন্ধর্ববিবাহ রীতিতে দুজনেই বিয়ে করে এবং নিজের স্ত্রীকে ১২ বছরের জন্য ছেড়ে বদর চাটিগাঁ যায়। ইতিমধ্যেই দুদবিবী গর্ভবতী হয় এবং মদু নামে মালিনির বাড়ি সে সাধ ভক্ষণ করে। নয়মাস পরিপূর্ণ হলে বিবি অন্ধকার নিশিযোগে হিরা দাইয়ের সহযোগিতায় মানিক পুত্রের জন্ম দেয়। মানিকচন্দ্র ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু করে অন্যদিকে তার পিতার বহুদিন পর বিবির কথা মনে আসে, তৎক্ষণাৎ সে তপস্যা ছেড়ে গৃহে ফিরে আসার কথা ভাবে। বাদশার অন্তরমহলে বদর

ফকিরবেশে প্রবেশ করে এবং মালিনির কাছে বিবি ফকিরের পরিচয় জানতে চাইলে নিজেই ফকিরের মধ্যে বদরের রূপ দেখে চিনতে পারে। পূর্বকথা অনুযায়ী দীর্ঘ ১২ বছর পর দুজনের দেখা হয়। এইভাবেই কাব্যটি শেষ হচ্ছে। এই কাব্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে মানিকপীরের জন্মকথার মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন এবং দিল্লির সুলতান-বাদশাহের দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধনের দিকটিও প্রকট হয়েছে।

হিন্দু দেবতা সত্যনারায়ণের কাহিনি যে মুসলমান লেখকের হাতে সত্যপীরের গল্পের আকার নেয় তা আমরা দেখতে পাই। মুসলমান সাধক বা ফকির তারা লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান গেয়ে ঈশ্বরের বা আল্লাহ'র গুণকীর্তন গায় এবং হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সেই পীরের দোয়া গ্রহণ করে। তাদের আশীর্বাদ দেওয়া এখানে ধর্মের কাছে সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান তাদের কিন্তু কোন বিরোধের জায়গা ছিল না, সবাই সমান আগ্রহে সেই ধর্মের নিষ্ঠাকে মাথায় পেতে নিত। ফলে হিন্দু সমাজে এবং মুসলমান সমাজের মধ্যে কোনও বিচারের জায়গা ছিল না। ধর্ম যে নিরপেক্ষতা নয়, ধর্ম সম্মিলনের একটা জায়গা এটা এই পীরদের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে। তাই সত্যপীরের কাহিনি মুসলমানদের তরফ থেকে তাদের একটা সম্মিলনের প্রচেষ্টা আর সত্যনারায়ণের কাহিনি হিন্দুদের তরফ থেকে হিন্দু-মুসলমানের আর এক জায়গা। সমাজের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় রক্ষণশীল ধর্মের রক্ষক যাঁরা তাদের মধ্যে এ ধরনের বিরোধ তৈরি হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু সেই বিরোধটা ছিল না, সত্যপীরের কাহিনি পড়লেই বোঝা যায় বা কাব্যের জনপ্রিয়তা দেখলে আমরা এগুলো বুঝতে পারি। সাধারণ মানুষ কীভাবে পীরের কাছে নত হয়ে যাচ্ছে যেখানে ধর্মের কোনও বালাই থাকছে না। কাব্যগুলোর ক্ষেত্রেও দেখি সাধারণ মানুষের সঙ্গে পীরদের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। মানুষকে বিপদের কবল থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে বারে বারে কৃপা করেছেন এই পীররা। সত্যপীর সমাজের একদম গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে এবং সেই পরিবারের মধ্য থেকে ঘটনার বিবর্তন ঘটিয়ে কিভাবে নিজের পূজা আদায় করেছে বা প্রতিপত্তি স্থাপন করেছে এই কাহিনিগুলি তার চিত্রকে তুলে ধরে।

সমাজের সব শ্রেণির মানুষ মিলে পীরের পূজা করছে নানা দ্রব্য-সামগ্রী দিয়ে, এখানে সামাজিকতার একটা জায়গা তৈরি হচ্ছে।

সত্যপীরের মধ্য দিয়ে যেমন সংস্কৃতির মিলনের জায়গা তৈরি হয়েছে ঠিক তেমন ভাবেই হিন্দু দেবতা দক্ষিণ রায় (ব্যগ্র দেবতা) এর প্রতিপক্ষ হিসাবে এসেছে বড়খাঁ গাজি (পীর)। এই পীরের মধ্য দিয়ে সামাজিক জনমানসের কতখানি বদল ঘটেছে তা আমরা দেখতে পাই। জনশ্রুতি আছে গাজি পীরের পুরো নাম শাহ গাজি বা বড়খাঁ গাজি, সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের মনে এই পীরের ভক্তি আজও। অন্যদিকে দক্ষিণ রায় ভাটি অঞ্চলের মানুষের কাছে পূজ্য, সাধারণত মউল্যা, মলঙ্গী, কাঠুরিয়া, শিকারী, নৌজীবি প্রভৃতি মানুষজনদের মধ্যে তিনি পূজিত। এই ধারণা থেকে সাহিত্যিকরা কাব্য রচনা করেন একের পর এক। দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে প্রথম দিকে গাজির বিরোধ দেখানো হলেও পরে গাজির কাছে বশ্যতা মেনেছেন দক্ষিণ রায় এমন তথ্য পায়। আবার অন্যদিকে মানিক পীরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। সর্বোপরি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই পীরের একটা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়েছিল।

মধ্যযুগে হিন্দু সাহিত্যিকদের হাতে ‘মঙ্গলকাব্য’ রচিত হয়েছে, বিভিন্ন দেব-দেবীর কথা সেই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। এই কাব্যগুলি শুনলে মানুষের মঙ্গল হবে, এছাড়া মঙ্গলবারে পঠিত হত বলেই নাকি একে একভাবে মঙ্গলকাব্য বলা হয়ে থাকে। আমরা মুসলমান সাহিত্যিক রচিত এই পীর কাব্যগুলোকেও একভাবে বিচার করে মঙ্গলকাব্য বলতেই পারি। এই কাব্যগুলোকে শ্রেণি বিচারের দিক থেকে মঙ্গল বলা নয়, আসলে সত্যপীর, গাজি পীর ও মানিক পীরের সান্নিধ্যে এসে সাধারণ মানুষ ধর্ম নির্বিশেষে কৃপা লাভ করছেন প্রত্যেকের এক এক রকম বিশ্বাস থেকে, সেই বিশ্বাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে সম্প্রীতির বার্তা যা অনেকদূর ভাবায় আমাদেরকে। সেই অর্থে এই কাব্যও ‘মঙ্গল’ দায়ক কাব্য, বিপদের কবল থেকে মানুষকে উদ্ধার করে নতুন জীবন দান করে সেই বিশেষ অর্থ বোঝাতেই ‘মঙ্গল’ কথাটি আমরা ব্যবহার করছি। স্কন্দপুরাণে সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্যের কথা ‘রেবাখণ্ডে’ বর্ণিত হয়েছে-

“ইতি বঃ কথিতং বিপ্রাঃ সত্যনারায়ণব্রতম্। যৎকৃতা সৰ্বদুঃখেভ্যো  
মুক্তো ভবতি মানবঃ।।১৪।। বিশেষতঃ কলিযুগে সত্যপূজা মহাফলা।  
সত্যনারায়ণং কেচিৎ সত্যদেবং তথাপরে।।১৫।। নানা রূপধরো ভূত্বা  
সৰ্বেষামীক্ষিতপ্রদঃ। ভবিষ্যতি কলৌ সত্যব্রতরূপী সনাতনঃ।।১৬।। য  
ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতি মুনিসত্তমাঃ। তস্য নশ্যন্তি পাপানি  
সত্যদেবপ্রসাদতঃ।।১৭।।”<sup>২১</sup>

## চ. কিসসা/কেচ্ছা সাহিত্য

### ছহি নেক বিবির কেচ্ছা

(শেখ কামরুদ্দিন)

প্রণেতা: মরহুম শেখ কামরুদ্দিন সাহেব।

প্রকাশক: ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ৩০ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, সন ১৪০৯ সাল।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩২

মূল্য: ১০.০০ টাকা

কামরুদ্দিন রচিত ‘ছহি নেক বিবির কেচ্ছা’ এক ধরনের কেচ্ছা কাহিনি। নেক অর্থ নেকি বা পুণ্যলাভ, কেচ্ছা অর্থ কাহিনি, বিবি অর্থে নারীদের বিশেষত বিবাহিত নারীদের বোঝানো হয়েছে। ইসলামে পুণ্যবান নারীদের কথা নিয়েই এই কেচ্ছা রচিত হয়েছে। পয়ার এবং ত্রিপদী এই দুই ছন্দে এই কাব্যের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ কতগুলি শিরোনামে এই কেচ্ছার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আনিসুজ্জামান জানান ‘নেক বিবির কেচ্ছা’ জয়নাল আবেদীনের নামে প্রচলিত আছে। এছাড়া এই কেচ্ছা কাহিনির মূল উৎস হিসাবে ‘তস্বিয়তনেসা’ উর্দু কাব্যের উল্লেখ করেন।<sup>২২</sup>

**কাহিনি সংক্ষেপ:** কাব্যের শুরুতেই ‘হামদ ও না’আত’ অংশে আল্লার নাম স্মরণ করেছেন-

আল্লা আল্লা বল বান্দা নবী কর সার। (পৃ.১)

কামরুদ্দিন মূলত নারীদের প্রসঙ্গ নিয়ে বলেছেন, বিবাহিতা নারীদের স্বামীদের ভক্তি সেবায় নিমগ্ন থাকার কথা এই কাব্যে জানা যাচ্ছে। হজরত আলির আদেশে

ফাতেমা কাঠুরিয়ার বাড়ি তার জরুর (স্ত্রী) সঙ্গে দেখা করতে যায়। স্বামীর আদেশ ছাড়া কাঠুরিয়া জরু (স্ত্রী) ফাতেমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়নি। পরে কাঠুরিয়া জরু স্বামীর কাছে ফাতেমার পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারে। তৃতীয়বার কাঠুরিয়া গৃহে ফাতেমা পৌঁছানো মাত্রই কাঠুরিয়া বিবি দরজা খুলে দেয় এবং নিজের ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। ফাতেমা বলে-

সেই বড় নেকি যে খছম জাতে রাজি। (পৃ.৩)

এইকথা শুনে কাঠুরিয়া জরু ফাতেমাকে সেবা করতে থাকে। এরইমাঝে কাঠুরিয়া গৃহে ফিরে এলে স্ত্রী স্বামীর সেবায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। স্বামীকে পানি দিয়ে পা ধুইয়ে দেওয়া, নিজের চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দেওয়া, বিছানা (পাটি) পেতে পাখা দিয়ে হাওয়া করা, এছাড়া একটা বেত এনে রেখে দেয়। স্ত্রী জাতির স্বামীর প্রতি ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

অন্যদিকে বাগদাদ শহরে হজরত আলির দুই মেয়ে বড় ইমানদার, নামাজ, কোরান পড়ে সর্বদাই। শহরের সমস্ত লোক এই দুই বোনকে খুব মান্য করে। পিতার মৃত্যুর পর ছোট বোন নিজের বিয়ের জন্য বড় বোনকে অনুরোধ করে। শেষে নিজের ইচ্ছায় এক ফকিরকে বিয়ে করে অন্যদেশে চলে যায়। এই কাহিনি বর্ণনার মধ্য দিয়েও নারীর পতি সেবার চিত্র সামনে উঠে আসে।

আর এক ইমানদার নেক বিবির কথা জানা যায়। এক বিবির স্বামী বড় নেশাখোর, দিনরাত নেশা করে দিনযাপন করে। সংসারের এই বেহাল অবস্থায় বিবি চাকরি করে নিজের কর্তব্য পালন করে। পাশাপাশি সেই নারী কোরান তেলাপাত ও নামাজ পড়তে ব্যস্ত থেকেছে। একদিন স্বামী নেশা করে গৃহে ফিরে বিবিকে এক গেলাস পানি দিতে বলে। পানি না খেয়ে অচৈতন্য অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকে। সারারাত ভোরের আজান অবধি বিবি সেই পানি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বামীর প্রতি অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে।

এছাড়া শা-ফরিদ নামে এক ব্যক্তি নেক বিবির কাছে কিভাবে নিজের কর্মের ফল ভোগ করে তার বর্ণনা উঠে এসেছে। শা-ফরিদ একদিন রাহাদিয়া যায়। একটি পাখি গাছের উপর থেকে তার গায়ে মলত্যাগ করে, এই ঘটনায় সমস্ত পাখিদের মৃত্যু কামনা করে। একসময় শা-ফরিদ জল পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে, বোরখা পরিহিত এক বিবির নিকট পানি খেতে চাইলে সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া পানি দেবে না জানায়। একজন স্ত্রীর স্বামীর প্রতি এই নিষ্ঠা তাকে অনেকখানি মুগ্ধ করে।

আর এক নেক বিবির কথা বর্ণিত হয়েছে। এই বিবির স্বামী বিদেশে ব্যবসা করতে গিয়ে মারা যায়। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সংসারে অভাবের জন্য এক কামারের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় বিনা সংকোচে। অন্যদিকে কামার জানায় বিবাহে রাজি হলে তবেই একশো টাকা দেবে। নিজের সংসারের খারাপ পরিস্থিতির কথা সমস্তই কামারের কাছে বলে তাতে কোন ফল না পেয়ে শেষপর্যন্ত নিজেদের জীবন বাঁচাতে, পেটের ক্ষুধা মেটাতে কামারের কথায় রাজি হয়ে। নিজের অসহায় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ নেক বিবি আল্লার কাছে হাত তুলে দোওয়া ভিক্ষা করে। এই বিবির কাছে পাপ-পুণ্য সম্পর্কিত অনেক কথা শোনার পর কামার বেহুশ হয়ে পড়ে, পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাঁদতে থাকে এবং নেক বিবিকে নিজের ঘরে ফিরে যেতে আদেশ করে।

হজরত আইউব নবি ও রহিমা বিবির কথা এই কেছা কাহিনিতে উঠে এসেছে। হজরত আইউব এক মহা ব্যাধিতে আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে রহিমা বিবি ভিক্ষা করতে এক গৃহস্থের বাড়ি উপস্থিত হয়, গৃহস্থের বাড়ির লোকজন বিবিকে বিনা কারণবশত খাবার দিতে রাজি হয়নি। কিছু ধান থেকে চাল বার করে দেওয়ার কথা জানায় রহিমা বিবি সেইমতো কাজ করে দেয়। শেষে এক কুনকি চাল পেয়ে রহিমা বিবি স্বামীকে খাবার তৈরি করে দেয়। নারীর কঠোর সংগ্রামের কথা এই কাব্যে এসেছে।

এখানে আর এক ইমানদার বিবির কথা জানতে পারি আমরা। এই বিবি স্বামীর আদেশ পালন করতে অটল থেকেছে। মেছের শহরের এক সওদাগর ছন্দবাদে



সওদাগিরি করার কথা বিবিকে জানায়। বিবি সম্মতি জানালে সওদাগর সফরের জন্য তৈরি হয়। স্বামী সওদাগিরিতে চলে যাওয়ার পর বিবি নিজের পিতার মৃত্যু সময়েও উপস্থিত হতে পারেনি। একজন স্ত্রীর স্বামীর প্রতি এতখানি আনুগত্য স্বীকার এই সময়ে ইসলামি নারীদের মধ্যে চোখে পড়ার মতো বিষয়।

এছাড়াও এই কেছায় দুই সতিনের গল্প, কলিকালের আওরাতের কথা জানা যাচ্ছে। পুরুষের সমস্ত কিছু মেনে নিয়েই বিবিদের সংসার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এই কেছায় জানা যাচ্ছে সতিন নিয়ে ঘর করা সুনত। সতিনের সঙ্গে সুমধুর আলাপচারিতা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কতখানি সম্ভব এই ব্যবস্থাপনা মেনে নেওয়া? এই প্রশ্ন আমাদের ভাবায়। সতিন জ্বালার প্রকট চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে।

কেহ সতিনের ঝালে পতি ছেড়ে দেয়।।

গলে দড়ি দিয়ে কেহ রসাতলে যায়।

কেহ সতিনের ঝালে করিয়া আহাদ পতি সঙ্গে কভু নাহি মিটায় পতি সাদ। (পৃ.৩০)

কলিকালের আওরাতের আচরণও জানা যাচ্ছে। নারীদের মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করার মতো। বিবির আবদার না মেটাতে পেরে স্বামীকে কতখানি অপমানিত হতে হচ্ছে সেই কথাও উঠে এসেছে এই কাব্যে।

ওর রুজি রোজ গারে, আগুন লাগুক ওরে, চুরি করে পড়ে জেন ধরা।

তবে মোর মন খুসি, জেওর পিন্দে দাঁতে মিসি, বাহার করে ফিরি সব ঠাঁই।। (পৃ.৩২)

নারীরা পুনরায় নিজেদের বিয়ের কথা ভাবছে যা আগে তাদের ভাবনার বাইরে ছিল। এই গোটা কেছা কাহিনি জুড়ে নারীদের কথা জানা যাচ্ছে। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় নারী-পুরুষ কিভাবে জীবন অতিবাহিত করছে তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিয়েই এই ‘নেক বিবির কেছা’। নারীরা স্বামীর প্রতি কতখানি ভক্তি, পতিসেবায় মগ্ন তা যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি তেমনই এই নারীরা কলিকালে এসে স্বামীকে কতটা তিরস্কারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তাও দেখার। এছাড়া কলিকালে নারীদের আচার-আচরণে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব ফুটে ওঠে।<sup>২০</sup>

আনিসুজ্জামান বলেছেন মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র তাঁদের কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা বর্ণনা করেছেন কিন্তু নারীদের নিন্দা করেননি। কিন্তু এই কাব্যে কলিকালের নারীর নিন্দা প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। মহিলাদের নিন্দা করাই নাকি এই কবির উদ্দেশ্য বাস্তবতার তাগিদ থেকে এই রচনা করেননি।<sup>২৪</sup> তবে আমরা বলতে পারি নারীর পতিভক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ‘কলিকালের আওরতের বয়ান’ এই অংশে নারীর নিন্দাভাষণে কলম ধরেছেন।

**বোন বিবী জহুরা নামা**  
**নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা**  
**(মোহাম্মদ খাতের)**

প্রণেতা: মোহাম্মদ খাতের সাহেব প্রণীত।

প্রকাশক: জি. কে. প্রকাশনী, ৩০, মদন মোহন বর্মণ স্ট্রীট, মেছুয়া বাজার, কলিকাতা-  
৭, সন ১৪১৬ সাল।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০

মূল্য: ৩০টাকা

**পুথি রচনার কারণ:** মোহাম্মদ খাতের পূর্বদেশ বাদাবন থেকে আগত বহুলোকের অনুরোধে এই পুথি রচনা করেন।

**কাহিনি সংক্ষেপ:** এই কেচ্ছা নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা দিয়ে শুরু হয়েছে। ত্রিপদী ও পয়ার এই দুই ছন্দে আলাদা আলাদা কতগুলি শিরোনামে পুথির বয়ান মোহাম্মদ খাতের তুলে ধরেছেন। ‘জহুরা’ শব্দটির অর্থ মাহাত্ম্য। এই কেচ্ছায় বোন বিবির মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

বোন বিবি ও শাজঙ্গলী দুই ভাই-বোনের বেহেস্ত থেকে দুনিয়াতে অবতীর্ণ হওয়ার কাহিনি দিয়েই কেচ্ছা শুরু। মক্কা শহরে বেরাহিম নামে ফকিরের স্ত্রী ফুল বিবি। নিঃসন্তান ফুল বিবি দিনরাত দুঃখে কাতর হয়ে থাকে। ফুল বিবি জানতে পারে সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা সে হারিয়েছে। সন্তানের ইচ্ছায় পুনরায় বিবাহের অনুমতি দেয় স্বামীকে। মক্কা শহরে শাহা জলিল নামে এক ফকিরের ১৪ বছর বয়সী কন্যা গোলাল

এর সঙ্গে বেরাহিম দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। দুই স্ত্রীকে নিয়ে বেরাহিম সংসার জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। আল্লাহতলার অসীম কৃপায় গোলাল বিবি গর্ভবতী হয়। ফুল বিবির কথামতো গর্ভবতী অবস্থায় গোলাল বিবিকে বনবাসে পাঠানো হয়।

গোলাল বিবীকে তুমি দেহ বনবাস। (পৃ.৬)

বেরাহিম সমস্ত মায়া ত্যাগ করে গোলাল বিবিকে একা বনের মধ্যে রেখে বাড়ি ফিরে আসে। নিদ্রাভঙ্গের পর গোলাল বিবি চারিদিকে নিজের প্রাণপ্রিয়াকে খুঁজতে থাকে। গর্ভবতী অবস্থায় স্বামীর আচরণে সে অসহায় হয়ে পড়ে।

কেমনে এমন হালে দিলে মোরে বন।।

জানিলাম নিদারুণ পুরুষের মন।

আসিলে সময় কাল বড়ই এগানা।।

অসময়ে ভুলে তাহা হইলে বেগানা।

বুঝি নি দুনিয়াতে সব ফেরবের ঠাই।। (পৃ.৭)

দশমাস গর্ভবতী হওয়ার পর গোলাল বিবি ছর পরিদের সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত বোন বিবি ও শাজঙ্গলী নামে দুই সন্তানের জন্ম দেয়। এইভাবে দীর্ঘ সাত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বেরাহিম নিজের ভুলের কথা বুঝতে পারে এবং সন্তানদের জন্য চিন্তাও করতে থাকে। জঙ্গলের মধ্যে চারিদিকে তল্লাশির পর এক গাছের তলায় গোলাল বিবিকে দেখতে পেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। গোলাল বিবি অভিমানের সুরে কথা বলে।

বিবী বলে মিছে কেন কর আলাপন।।

আমি খুব জানিয়া লিয়াছি তেরা মন।

খছম হইয়া বনে দিয়া আওরতেরে।।

খুশি হালে আপনি যাইয়া রহ ঘরে।

হামেলদার আওরতেরে দিয়া বনবাস।।

এতদিন বাদে আইলে করতে তল্লাশ। (পৃ.১০)

মান-অভিমানের পর গোলাল বিবি স্বামীর সঙ্গে ঘরে ফিরতে চাই কিন্তু দুই ভাই-বোন একসঙ্গে জঙ্গলে থেকে দিনযাপন করার কথা বলে। বেরাহিম ও গোলাল বিবি নিরাশ হয়ে ঘরে ফেরে। বোন বিবি ও শাজঙ্গলী দুই ভাই-বোন মদিনা শরিফ থেকে

বাদাবনে গঙ্গা নদী পার হয়ে ভঙ্গর শাহ'র দেশ আঠারো ভাটিতে এসে পৌঁছায়।<sup>২৫</sup> এই ভাটির দেশে এসে বোন বিবি নারায়ণীর সঙ্গে লড়াই করে বাদাবন দখলকে ঘিরে। নারায়ণী বা দক্ষিণ রায় ভাটির দেশে বোন বিবির উপস্থিতি জানতে পেরে সেই স্থান ত্যাগ করার কথা জানায় কিন্তু বোন বিবি ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এই লড়াই এ সামিল হয়। দক্ষিণ রায় নিজের দেশে যবনের উপস্থিতি মানতে নারাজ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ রায় যুদ্ধে হেরে গিয়ে বোন বিবির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, বিনিময়ে আঠারো ভাটির সমস্ত দায়িত্ব বোন বিবির উপর ছেড়ে দিয়ে প্রজা হয়ে থাকার কথা জানায়। ভাটির অঞ্চলের মানুষের কাছে বোন বিবির ক্ষমতা প্রচারিত হতে থাকে, এই ভাবে জনপ্রিয়তার জায়গা তৈরি হয়।

অন্যদিকে ধোনাই ও মোনাই দুই ভাইয়ের বাদাবনে মধু সংগ্রহের কাহিনি এখানে বর্ণিত হয়েছে। ধোনাই মনস্থির করে বাদাবন থেকে মোম-মধু সংগ্রহ করে আনবে। বাদাবনে মোম-মধু সংগ্রহের জন্য সাত ডিঙার আয়োজন করতে থাকে, মোনাই কিছুতেই রাজি হয়নি ধোনাই এর এমন সিদ্ধান্তে।

যত টাকা চাহ লেহ দিব আমি ভাই।।

তোমার রোজগার আমি কিছু নাহি চাই। (পৃ.১৬)

ধোনাই শেষে দুখেকে রাজি করিয়ে বাদা বনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। মধু সংগ্রহের জন্য বনের মধ্যে প্রবেশ করলে দক্ষিণ রায় নিজের ক্ষমতার প্রভুত্ব দেখাতে ধোনাইকে নরবলি পূজার ব্যবস্থা করতে আদেশ করে। ধোনাই দক্ষিণ রায়ের উদ্দেশ্যে দুখেকে নরবলি দিতে চাই। কিন্তু দুখে বোন বিবিকে স্মরণ করতে থাকে এই সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য। বোন বিবি মায়ারূপ ধরে দুখের সামনে হাজির হয় এবং তাকে নিজের মা বলে পরিচয় দিলে সে কিছুতেই বিশ্বাস করেনা, শেষে বোন বিবির প্রকৃত পরিচয়ে জানতে পারে। বোন বিবির কৃপায় দুখে নতুন ভাবে জীবন ফিরে পায়। অন্যদিকে বাদা বনে মধু সংগ্রহের পর ধোনাই ও মোনাই দুইভাই নিজের দেশে ফিরে গেলে দুখের মা নিজের ছেলের মৃত্যুসংবাদ জানতে পেরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু বোন বিবির কৃপায় দুখে কুস্তীরের পিঠে চেপে নিজের গ্রামে ফিরে আসে।

দুখে নিজের দেশে ফিরে এসেছে এই সংবাদ পেয়ে চারিদিকের লোকজন তাকে দেখতে ছুটে আসে, কিন্তু ধোনাই নিজের অপরাধের ভয়ে আসতে পারেনি। দুখে সমস্ত লোকের মাঝে ধোনাই এর অনুপস্থিতি দেখে পিয়াদা দরোয়ান পাঠায় ধোনাকে ধরে আনার জন্য, কেঁদো খালির ঘটনার কথা ভেবে দুখের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ধোনাই শান্তি খণ্ডনের উপায় স্বরূপ নিজের কন্যার সঙ্গে দুখের বিবাহ দিতে প্রস্তুত। দুখের সঙ্গে চাম্পার বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হয় এবং ধোনাই-দুখে সমস্ত পারস্পরিক বিবাদ ভুলে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়। অন্যদিকে বোন বিবির কৃপায় দুখে-চাম্পা সুখের জীবন অতিবাহিত করে। এই কেচ্ছার মধ্য দিয়ে এইভাবে বোন বিবির অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে এবং বননির্ভর জনগোষ্ঠীর মানুষকে কৃপালাভের কথা জানা যাচ্ছে। সুকুমার সেন বোন বিবির মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলেন-

“বন-বিবির পাঁচালী গাথা হয়েছে সুন্দরবনের “মউল্যা” অর্থাৎ মধু-মোম-সাংগ্রাহকদের বিশিষ্ট অধিদেবতাকে উপলক্ষ্য করে। হিন্দু ব্যাধ-কাঠুরে-পশুপালকের অধিদেবতা বন-দুর্গার বা মঙ্গল-চন্ডীর রূপান্তর ইনি। পূর্বতন দক্ষিণ রায়, বড়-খাঁ গাজী ও কালু-শাহার বিরোধকাহিনীর অনুবৃত্তি পাই বন-বিবির উপাখ্যানে। অষ্ট্রিক-মোঙ্গল জাতির অন্যতম উপাস্য ব্যাঘ্রমানব অপদেবতা কালক্রমে দক্ষিণবঙ্গের জাঙ্গল-অনূপ প্রান্তে দক্ষিণরায় ঠাকুরে পরিণত হলেন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বড়-খাঁ গাজী হলেন দক্ষিণের অধীশ্বর। দক্ষিণপশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির বিরোধমিলনের একটু ইতিহাস রয়ে গেছে দক্ষিণরায় বড়-খাঁ গাজীর গল্পের মধ্যে। হিন্দু কবির লেখা কাহিনীর বিশিষ্ট নাম ‘রায়মঙ্গল’, মুসলমান কবির লেখা সাধারণত ‘গাজী সাহেবের গান’ নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দু কবির লেখায় দুটি নায়কের মধ্যে কারো মাহাত্ম্য খর্ব করা হয়নি। মুসলমান লেখক কিন্তু দক্ষিণরায়ের হীন পরাভব দেখিয়ে তবে দু-দেবতার মধ্যে দোস্তানি পাতিয়েছেন।”<sup>২৬</sup>

দোভাষী পুথিকারেরা অনেকেই এই রচনাকে ‘লৌকিক উপাখ্যান’, ‘পীর মাহাত্ম্যবিষয়ক পাঁচালি কাব্য’ বলেছেন। অনেকেই বোন বিবিকে মঙ্গলচন্ডীর প্রতিরূপ

হিসাবে দেখেছেন, কেউ কেউ বোন বিবিকে আল্লা প্রেরিতা পিরানি হিসাবে ভেবেছেন। অন্যদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত কেচ্ছা কাহিনি নামেও অভিহিত করেছেন।<sup>২৭</sup>

আবদুল আলী গারলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি  
(মুনসী মোহম্মদ ইউনুছ)

প্রণেতা: মুনসী মোহম্মদ ইউনুছ সাহেব।

প্রকাশক: আলিমী প্রেস, চুরিহাট্যা, ঢাকা, সন ১৩৭০ সাল।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

মূল্য: পঞ্চাশ পয়সা।। ০ আনা

**কাহিনি সংক্ষেপ:** ঘারভাল নর-নারী আবদুল আলী ও নিবারণ সুন্দরীর জীবন নিয়ে এই কেচ্ছা কাহিনি রচিত হয়েছে। পয়ার, ত্রিপদী ও চিতং মিল বিভিন্ন ছন্দে এই কাব্যের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। এই কেচ্ছা কাহিনি গানের মধ্য দিয়েও কিছুটা বর্ণিত হয়েছে, গানগুলি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গাওয়া হয়েছে। কাব্যের শুরুতেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন-

আমি অতি মুর্খমতি বিদ্যা বুদ্ধি হীন।।

ছোটকালে পাটশালাতে পড়েছি কত দিন ও বিদ্যা বুদ্ধি হীন কিন্তু মুর্খ পন্ডিত।। (পৃ.১)

আবদুল আলী রূপে গুণে পরিপাটি কুড়ি বছরের ঘারভাল পুত্র। এই ঘারভালরা ছিল পাহাড়িয়া শ্রেণির, এরা নিত্যদিন বিভিন্ন এলাকায় সাপ ধরে বেড়ায়। এই ঘারভালদের দলের মধ্যে এক অবিবাহিত কন্যার নাম নিবারণ, বয়স পনেরো/ষোলো বছর। এই নিবারণের সঙ্গে মিলনের চেষ্টায় আবদুল আলী অস্থির হয়ে ওঠে।

নিবারণকে চক্ষে দেখি, পলক না মারে আখি, প্রেম বান হুদে আসি বিন্দিলেক যাই।।

আবদুল আলী যেইস্থানে, নজর করে নিবরণে, দুই জনের দৃষ্টির প্রেমচক্ষের আশনাই।

দুইজন দুইখানে রহে, ছটফটে অঙ্গ দহে, ভঙ্গ প্রেমে কদাচিত রঙ্গ লাগে নাই।। (পৃ.২)

ঘটনাসূত্রে ঘারভালদের কন্যা নিবারণকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয় আবদুল আলী। সকলে মিলিত হয়ে নিবারণের সঙ্গে আবদুল আলীর বিয়ে দেয়। কৃষ্ণ-রাধা, লালমতি-ছয়ফলমুগ্গক, পদ্মাবতী-রত্নসেন এদের মতোই আবদুল আলী নিবারণকে সঙ্গী

হিসাবে পেয়ে দুজনে সুখে জীবন কাটাতে থাকে। নিবারণের মুখে স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে আবদুল আলী মাঝিদের নিয়ে নৌকা করে সাপ ধরতে যেতে প্রস্তুত হয়। অন্যদিকে আবদুলের মা সন্তানের সমূহ বিপদের কথা জেনে যেতে বারণ করে এবং বিভিন্নভাবে সন্তানকে বোঝাতে থাকে।

বাছারে তোরে, মায় নিষেদ করে।।

আবদুলের যেওনা দুঃখিনির বাছা তোর মায় নিষেদ করে। (পৃ.৪)

মাঘ মাসে সতেরো খানা নৌকাসহ লোকজন সঙ্গে নিয়ে পাটুয়াখালিতে আবদুল সাপ ধরতে যায়। বাঁশিতে মন্ত্র ফুকে সাপ তোলে মাটির ভিতর থেকে, শেষপর্যন্ত সেই সাপের আঘাতে আলীর মৃত্যু হয়। আবদুলের মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর মা এবং স্ত্রী নিবারণ কান্নায় ভেঙে পড়ে। শাশুড়ি বউকে নানাভাবে তিরস্কার করতে থাকে। অনাহারে, মলিন বেশে জীবন কাটাতে থাকে স্বামীর বিরহে। আবদুলের মৃতদেহ সাপ মুখে করে নিয়ে আকাশ পথে উড়ে যায়, সেই দৃশ্য দেখে মুলাদি নগরের এক বধূ শাশুড়ির অনুমতি নিয়ে মন্ত্র পাঠ করে সেই সাপসহ আবদুলের দেহ নীচে নামায়। অন্যদিকে নিবারণ স্বামীর দুঃখে কাতর হয়, স্বামীকে ছাড়া জীবন কাটাতে থাকে। নিবারণের বারমাসী বর্ণনা দিয়ে কাব্য শেষ হচ্ছে। মাঘ মাসে স্বামীকে হারিয়ে যেভাবে পতি বিরহে বিলাপ করে তারই চিত্র সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে এই কাব্যে। মাঘ মাস থেকে শুরু করে পৌষ মাস পর্যন্ত নিবারণের বারমাসী প্রসঙ্গ জানা যায়।

প্রথম মাঘ মাসে, মোর পতি সপে ডংশে, দুঃখ গেল মাস।।

নুতন নুতন যুবতির মন অভিলাষে, স্বামী পাসে থাকে খোসে মোর সর্বনাশ।

এইমত জাড়ার দিন, যুবতী রমণীগণ, জরাজরী হই।।

সোয়ায় তারা পতি কোলে লই, আমি দুঃখি পোড়ামুখি পতি ঘরে নাই। (পৃ.১১)

শেষপর্যন্ত মুলাদি নগরের বিবির চেষ্টায় আবদুল নিজের গৃহে ফিরে আসে এবং নিবারণ ও মাতা-পুত্রকে দেখে আবদুল নতুন ভাবে জীবন গড়ার কথা ভাবে।

ছহী রঙ্গ-বাহার বা শাহে আলম ও মাহে আলমের কেছা  
(মৌলবী হাজী আবদুল মজিদ ভুইঞা)

প্রণেতা: মৌলবী হাজী আবদুল মজিদ ভুইঞা ছাহেব মরহুম প্রণীত।

প্রকাশক: হবিবী প্রেস, ৩ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬৪, সন ১৩৩৯ সাল।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৫৮

আবদুল মজিদ ভুইঞা রচিত 'রঙ্গ-বাহার' কেছার পল্ট অনেকটা রূপকথার গল্পের মতো মনে হলেও খাঁটি রূপকথা এমন বলা যায় না। আসলে অনেকটা রূপকথার স্টাইল বজায় রেখে কেছার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। কেছার প্রথমেই আবদুল মজিদ শায়েরের বাণী উল্লেখ করেছেন। কলিকাতা শহরের মুনশী গোলাম মওলা এই পুথির বেশ কিছু অংশ ঠিকঠাক করে নিজের প্রেসে ছাপিয়ে দেন। কাব্যমধ্যেই রচনাকাল উল্লেখ আছে ১২৭১ সালে পুথি ছাপার কাজ শেষ হয়। এরপর ত্রিপদী ছন্দে 'শায়েরের মোনাজাত' নামে একটি অংশে আল্লার মেহেরবানি প্রচার করেছেন।

ইনি উড়িষ্যার বালেশ্বরের কটক জেলার বাসিন্দা ছিলেন। কটক শহরের লাছুমপুরের নিবাসী মরহুম মাগফুর পীরের কাছে মাথা নত করেছেন, এরপর হেম্মত খাঁ শহীদ নামে অপর একজন পীরের বন্দনা করেছেন। ছৈয়েদ আবদুল আলী, আমির আলী, ফতেউল্লা খান নামে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরামর্শে কবি কেছা রচনা করেন। এছাড়া 'হামদ-নায়াত' অংশে গুরু বন্দনা করেছেন।

ভুরসুট পরগণা বিচে উদনা বসতি আছে তার মধ্যে ছৈয়েদ হামজায়।।

কবিতা করিনু শুরু সে যে আমার গুরু মোলাকাত নাহি মেরা সাথে। (পৃ.৭)

কাহিনি সংক্ষেপ: মেছের মুলুকে নামকরা বাদশার নাম আওরঙ্গির। এই বাদশার বিবির নাম ছর-তন। বাদশার উজির পদে নিযুক্ত ব্যক্তির নাম নওরঙ্গির, উজিরের বিবি নুর-তন। প্রথমদিকে দুই দম্পতি নিঃসন্তান থাকায় কারও মনে সুখ ছিল না। আল্লাহ'র কাছে সন্তানের প্রার্থনায় রাত-দিন মগ্ন থেকেছে। শেষপর্যন্ত আল্লার স্বপ্নাদেশ পেয়ে বাগানের গাছ থেকে আম এনে নিজের নিজের বিবিকে সেই ফল ভক্ষণ করতে বলে। একসময় দুই বিবি গর্ভবতী হয় এবং দুইজনেই পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়।



বেটা মুখ দেখে দুঃখ গেল দোহাকার।

দেখে রূপ, ছটি ছুপ, হইল তাহার।। (পৃ.১৩)

বাদশার ছেলের নাম শাহে আলম ও উজিরের পুত্রের নাম মাহে আলম। শাহে আলম ও মাহে আলম দুই বন্ধু পরস্পরের সযোগিতায় দিন যাপন করতে থাকে। ষোলো বছর বয়সে দুই বালকের সমূহ বিপদের কথা পরিজনেরা জানতে পারে। দুই বালকের বিবাহের জন্য পরিবারের সবাই উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কনৌজ দেশের বাদশা আকবর ছানির একমাত্র কন্যা নয়ন বানু এবং উজির দেলবর ছানির কন্যার নাম চয়ন বানু। দুই কন্যার সঙ্গে বিবাহের কথা একরকম স্থির হয়। দুই কন্যা রূপে যথেষ্টই সুন্দরী, কিন্তু বয়সের তুলনায় কেউই বিয়ের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। কন্যাপক্ষের পরিজনেরা নিজেদের সাত বছরের কন্যাদের বিবাহ দিয়ে দূর দেশে পাঠাতে নারাজ, বিবাহের পর নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত নিজেদের ঘরে রাখার পরিকল্পনা করে।

শাহে আলম ও নয়ন বানু এবং মাহে আলম ও চয়ন বানুর বিবাহপর্ব মিটে যাওয়ার পর দুই কন্যা পিতৃগৃহে থেকে যায়। উপযুক্ত বয়সে বিবাহের চার-পাঁচ বছর পর দুই কন্যা স্বামী বিরহে অস্থির হয়ে ওঠে।

রাত্রিকালে নিদ্রা নাই, হায় হায় করে দুই, বারে বারে মনকে ছমঝায়।।

এই বাতে মা বাপেরে, না কহে শরম তরে, কিরূপে কহিব য়ায়ছা বাত। (পৃ.২১)

ইতিমধ্যেই কনৌজ শহরে শাহে আলম ও মাহে আলম এসে উপস্থিত হয় স্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। অন্যদিকে বাদশার কন্যা নয়ন বানু এক যোগীর প্রেমে পাগল হয়ে ওঠে। স্বামী ঘরে ফিরে এলেও এই কন্যা তার অপেক্ষায় না থেকে যোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মন্দিরে প্রবেশ করে। এই যোগী নয়ন বানুকে আদেশ করে তার স্বামীকে (শাহে আলম) হত্যার জন্য।

আমার হাতের খাঁড়া তুমি লিয়া যাও।

তোমার স্বামীর ছের কেটে এনে দাও।। (পৃ.২৮)

নিজের স্ত্রীর আঘাতে শাহে আলমের মৃত্যু হয়। মাহে আলম নয়ন বানুর এই ঘটনার সাক্ষী থেকে বন্ধুর এই চরম দুর্দশায় রাগের বশবর্তী হয়ে যোগীকে হত্যা করে।

এবং বাদশার কন্যা নয়ন বানুর নাক কাটা যায়। বাদশা মাহে আলমকে শাস্তিস্বরূপ ফাঁসি দিতে আদেশ জানালে জনসম্মুখে নিজের কুকীর্তির কথা নয়ন বানু সকলকে জানায়। অন্যদিকে উজিরের কন্যা চয়ন বানু স্বামীর শাস্তির কথা ভেবে ছটফট করে কারণ বিবাহপরবর্তী সময়ে দুজনের সাক্ষাৎ হয়নি।

শুনে উজিরের বেটি বড় হৈল ছটফটী, ইয়াদ করে যৌবনের জোস।।

কহে হয় কি হৈল, প্রিয়া মেরা কি করিল, কি বুঝিয়া করিল এই কাম। (পৃ.৩২)

মাহে আলম শোকাতুর অবস্থায় বন্ধুর মৃতদেহ নিয়ে সিন্দুকে আঁটকে রাখে। ভয়ে ত্রস্ত হয়ে নিজের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করতেও নারাজ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উজির (দেলবর ছানি) এর আদেশমতো কন্যা চয়ন বানুর সঙ্গে মাহে আলম দেখা করে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নিজের স্বামীকে পাওয়ার ইচ্ছায় চয়ন বানু নিজেকে সুন্দর করে নানা অলংকারে নিজেকে সজ্জিত করে তোলে। স্বামীর প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় রত থেকেছে সর্বদাই এই নারী অন্যদিকে বাদশার কন্যা নয়ন বানু অন্য প্রেমিক পুরুষের প্রেমে আবদ্ধ হয়ে জীবনের চরম পরিণতির সাক্ষী থেকেছে। চয়ন বানু শুধুমাত্র পতি চিন্তায় বিভোর না থেকে বন্ধু শাহে আলমের প্রাণভিক্ষা চেয়েছে স্বয়ং আল্লাহর দরবারে।

শুনিয়া আভাজ বিবি করে মোনাজাত।

আল্লার দরগায় তবে মাঙ্গিল হাজাত।।

মেরা খছমের দোস্ত শাহে আলমেরে।

মারিয়াছে জরু তার যোগীর খাতেরে।।

তাঁহারে বাচাও আজ আপানি এলই। (পৃ.৩৯)

আল্লাহ'র অসীম কৃপায় শাহে আলম পুনরায় নতুন জীবন ফিরে পায়। শাহে আলমকে পেয়ে বন্ধু মাহে আলমের খুশির অন্ত নেই। নিজের কন্যার আচরণে বাদশা (আকবর ছানি) দুঃখপ্রকাশ করে এবং শাহে আলমকে পুনরায় বিবাহের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু শাহে আলম এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি।

এ দেশেতে শাদি আমি, না করিব শুন নামি, এক শাদি হয়ে য়ায়ছা হাল।

আর হেথা নাহি রব আপনার দেশে যাব, হয় যদি সাবুদ কপাল।। (পৃ.৪৩)

আকবর ছানির দ্বিতীয় কন্যা ছুরতোন্নেছার সঙ্গে শাহে আলমের বিয়ের জন্য অনুরোধ করে। ছুরতোন্নেছা শাহে আলমের প্রেমে অস্থির হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত শাহে আলম ছুরতোন্নেছার কাছে নিজের জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা প্রকাশ করে। সমস্ত ঘটনাজানার পর ছুরতোন্নেছা শাহে আলমকে বিয়ে করতে রাজী হয়। কাজি ডেকে মহা ধুমধামে দুজনের বিয়ে হয়।

কাজিকে ডাকিয়া নেকা খানি পড়াইল।

কাজিরে এনাম কত মালমাত্তা দিল।। (পৃ.১০২)

এই কাব্যে পরি প্রসঙ্গ এসেছে, রূপকথার আকারে গল্পের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই পরিদের দ্বারা শাহে আলম ও ছুরতোন্নেছা অন্যদেশে গায়েব হয়ে চলে যায়। কনৌজ শহরের সমস্ত মানুষ দুজনের শোকে কাতর হয়ে পড়ে। অন্যদিকে যাদুকরের মায়ার বশে মাহে আলম গাছে পরিণত হয় এই অকাল্পনিক দৃশ্যের কথা এই কাব্যের বর্ণনায় এসেছে। অন্যদিকে চয়ন বানু মাঞ্জুস নামে এক বাদশার প্রেম অস্বীকার করায় তাকে বন্দি হতে হয়। বন্দি জীবনদশা থেকে মুক্তি পেতে আল্লাহ'র নিকট সাহায্য পার্থনা করে। চয়ন বানু বন্দি জীবন কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। এবং কাহিনির শেষ পর্যায়ে শাহে আলম, ছুরতোন্নেছা, মাহে আলম ও চয়ন বানু নিজেদের রাজ্য মেছের দেশে ফিরে আসে। নিজেদের প্রত্যেকের জীবনের দুঃখ যন্ত্রণার কথা সকলকে জানায় এবং সুখের জীবনে আবার ফিরে আসে। এইভাবেই কাব্য শেষ হয়েছে।

এই কেছা কাহিনির মধ্য দিয়ে রূপকথার ছলে আল্লাহ'র মহিমা ব্যক্ত হয়েছে অন্যদিকে হাদিস ও কোরানের বাণী অনুষ্ঙ্গ হিসাবে এসেছে।

**আমির সদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরীর পুথি**

**(মুন্সী মোয়াজ্জম আলী)**

প্রণেতা: মুন্সী মোয়াজ্জম আলী।

প্রকাশক: হামিদিয়া প্রেস, চুড়িহাটা, ঢাকা, তাং ৮-১০-৪৫ ইং।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০

মুগী মোয়াজ্জম আলী কুমিল্লার বাসিন্দা ছিলেন। কবির পুত্র মহাম্মদ ইয়াছিন মিয়া, ইনিই এই পুথির খারিদা সূত্রে মালিক।

কাহিনি সংক্ষেপ: প্রথমেই 'হাম্দো না'আত' অংশে আল্লাহতালাকে স্মরণ করেছেন-

বিছমিল্লা আল্লার নাম স্মরিয়া প্রথম। (পৃ.১)

এই পুথি ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সদাগরের জীবনের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। মূলত গ্রামবাংলার মানুষের জীবন-যাপনের নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোকে নিয়ে একরকম কুৎসা করে মুসলমান সাহিত্যিকরা পুথি রচনা করেন, আমির সদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরীর পুথিও ব্যতিক্রম নয়। কেচ্ছার শুরুতেই ভেলুয়া সুন্দরীর আত্মীয়পরিজনের কথা জানা যায়, তেলৈন্যা নগরে রাজা মনুহর ও মাতা ময়নার একমাত্র কন্যা ভেলুয়া। ভেলুয়ার রূপের বর্ণনা দিয়েছেন বিভিন্ন উপমার সাহায্যে, শরীরের নানারকম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনা করেছেন নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে। মধ্যযুগের কাব্যে নারীদের রূপ বর্ণনা একটা অংশ।

আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী।।

দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্র কুপের পরী।

কাছে গেলে দেখা যায়রে সোনার প্রতিমা।।

আর সুন্দর লাগেরে ভেলুয়ার চক্ষের ভঙ্গিমা।

আখির উপর ভুরু কন্যার অতি মনোহর।।

পদ্য ফুলের মাঝে যেন রসিক ভোমর।

ভাল পুষ্প পাইয়ারে ভোমর মধু করে পান।। (পৃ.২)

সদ্য বারো বছরের কিশোরী নারী জীবনের যে প্রাণজ্জ্বলতা তা ভেলুয়ার রূপের মধ্যে ধরা পড়েছে। এরপর শামলা বন্দরের মানিক সদাগর ও সোনাই সুন্দরের পুত্র আমির সাধুর কথা জানা যায়। ছোট বয়স থেকেই কোরান, কিতাবসহ শাস্ত্রবিদ্যায় সে পারদর্শী হয়ে ওঠে। মাত্র দশ বছর (১০) বয়সে আমির সাধু শিকার যাত্রার জন্য মনস্থির করে কিন্তু একমাত্র পুত্র হওয়ায় মায়ের মন অস্থির হয়ে ওঠে। সমস্ত রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে শেষপর্যন্ত আমির সাধু শিকারের পথে বার হয়। আমির সাধু মাঝি

(গৌরলধর)কে চৌদ্দ কাহণ ডিঙা সাজিয়ে দেওয়ার কথা জানায়। ডিঙার প্রত্যেক তক্তার গায়ে মাঝি আমিরের ছবি সারি দিয়ে সাজিয়ে তুলেছে। চৌদ্দটি ডিঙা এবং প্রত্যেক ডিঙার কার্যকারিতা এখানে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সমস্তরকম বন্দোবস্ত করে আমির সাধু সৈন্য সেনা নিয়ে যাত্রাপথে এগিয়ে চলে। যাত্রা শেষ করে ডিঙা নিয়ে ঘাটে পৌঁছে আমির সাধু ওই নগরের আকাশে নয় লক্ষ কবুতর (পায়রা) দেখতে পায়। অজস্র পায়রার মধ্যে একটি কবুতরের মুখে মানুষের মতো স্বর শুনে সেই পাখিকে শিকারের বশবর্তী করে আমির সাধু গুলাইলের আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ সেই কবুতর আঘাতে মূর্ছা গিয়ে ভেলুয়ার বুকের উপর এসে পড়ে। ভেলুয়া নিজের পোষ্য কবুতরের এমন অবস্থা নিজের চোখে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ভেলুয়ার সাত ভাই আমির সাধুর এই কর্মের জন্য সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে আমিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত হয়।

যুদ্ধে তেলৈন্যা নগরের বহু সাধারণ মানুষ প্রাণ হারায়, চারিদিকে কান্নার রোল ওঠে। যুদ্ধকালীন এই অবস্থার মধ্যে নগরের মানুষজনদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, দিন-রাত্রির তফাত বুঝতে অসুবিধা হয়। প্রতিটি ঘরে ঘরে আশঙ্কার ঘোর অন্ধকার নেমে আসে, আল্লাহ'র দরবারে বেঁচে থাকার পরম ইচ্ছায় প্রার্থনা চলে। সাতদিন যুদ্ধচলার পর সাতভাই মিলে আমির সাধুকে পাকড়াও করে, শারীরিক নিগ্রহের পর নিজেদের বাড়িতে সাধুকে নিয়ে হাজির হয়। আমির সাধুর বুকের উপর পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তীব্রযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। ভেলুয়ার মাতা কান্না শুনতে পেয়ে ছুটে এসে জানতে পারে সেই সাধু তার নিজের ভগিনীর পুত্র। আমির সাধুকে সর্বরকম শাস্তি থেকে উদ্ধার করে বুড়ি নিজের ঘরে নিয়ে যায়, এবং সেখানে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে। মায়ের মুখে আমিরের সত্য পরিচয় জানার পর সকলেই ভেলুয়া ও আমিরের বিবাহের সিদ্ধান্ত নেয়। সুন্দরী রূপবতী ভেলুয়ার সঙ্গে আমিরের বিবাহ সর্বরকম বন্দোবস্ত আয়োজনে ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের সমস্তরকম আয়োজন মিটে গেলে আমির সাধু ভেলুয়াকে নিয়ে নিজের দেশে ফিরে যায়।

পরিবারকেন্দ্রিক জীবনে প্রবেশের পর দুজনকে ভয়াবহ পরিস্থিতির স্বীকার হতে হয়। আমির সাধুর বোন বিবলার কুপরামর্শের জন্য তাদের বিবাহিত জীবনে বিপর্যয়

ঘনিয়ে আসে। আমির সাধু মায়ের উপদেশে উজানী নগরে বাণিজ্যে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। স্বামীর যাত্রার কথা শুনে ভেলুয়া বিলাপ করে।

না যাইও রে বলিরে সুন্দর কন্যা চরণে পড়িল।

না যাইওর রে সাধু বোল্লাম তোমারে।।

হাতের বাজু বেচিরে সাধু খাবামু তোমারে।

না যাইও রে সাধু কহি বার বার।। (পৃ.৯)

বাণিজ্য যাত্রায় দিক নিশানা ভুল হওয়ায় পুনরায় আবার সেই ডিঙা নিজেদের বন্দরে এসে পৌঁছায়। ভাগ্যের এমনই পরিহাস সেই সুযোগে আমির সাধু ভেলুয়াকে দেখতে নিজের ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে, বিহঙ্গম পাখির সহায়তায় অতি দ্রুত আমির সাধু ঘরে পৌঁছে ভেলুয়াকে ডাকতে থাকে। দুজন দুজনকে পেয়ে বিমোহিত হয়ে যায় কিন্তু ভোরের আলো ফোটায় আগেই আমির সাধু ঘুমে অচেতন সুন্দরী ভেলুয়াকে গৃহে একা ছেড়ে ডিঙায় ফিরে আসে। এরপর প্রভাতে ঘরের কপাট খোলা অবস্থায় ভেলুয়াকে বিছানায় দেখে বিবলাসহ পরিবারের সকলে তাকে কলঙ্কিত করে। এই অবস্থায় ভেলুয়া সবাইকে ঘটনার সমস্ত কথা জানালেও কোন কিছুই বিশ্বাসযোগ্য হয়নি কারও কাছে। অপমান, ঘৃণায় ভেলুয়া নিজের কাছে হেরে গিয়ে সমস্ত কলঙ্কের বোঝা নিয়ে সংসারে থেকে যায় শাশুড়ি, ননদের সঙ্গে। যমুনার তীরে কলসিতে জল ভরতে গিয়ে ভোলা সওদাগর সুন্দরী ভেলুয়াকে লুট করে নিজের দেশে নিয়ে আসে। কটালি দেশে এসে ভেলুয়া স্বামীর জন্য কাঁদতে থাকে এবং নিজের দঃখের কথা জানিয়ে আমির সাধুকে পত্র লেখে। ভেলুয়ার বারমাসী বর্ণনার মধ্য দিয়ে স্বামীকে দীর্ঘদিন না পেয়ে তার বিরহের জীবন কেমন কেটেছে তা এখানে পরিস্ফুট হয়েছে।

প্রথমে আশ্বিন, সময় প্রবীন প্রীয়া মোর পরবাস।।

সরতের হিত, দহে নারী চিত, ভাবিয়া হৈলাম নৈরাশ।

আহা প্রাণেশ্বর, রৈলা দেশান্তর, না পাইলে বার্তা সার।। (পৃ.১৯)

ভোলা সওদাগর ভেলুয়াকে লুট করে নিজের স্ত্রী হিসাবে পেতে চায় কিন্তু সুন্দরী ভেলুয়া নিজের পাতিব্রত রক্ষা করে। ভোলার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিশাপ দিলে ভোলা

সওদাগর চোখে অন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে বহুদিন পর আমির সাধু বাণিজ্য ছেড়ে নিজের দেশে ফিরে আসে এবং জানতে পারে ভেলুয়ার মৃত্যু হয়েছে। নিজের সুন্দরী স্ত্রী ভেলুয়াকে ফিরে পেতে আমির সাধু কবর খুঁড়ে ফেলে এবং কালো কুকুর সেখানে দেখতে পায়। পরিবারের প্রতিটি লোকের থেকে ভেলুয়ার অসতীত্বের কথা জানতে পারে কিন্তু তার কোনও রকম প্রমাণ না করেই আমির সাধু ভেলুয়ার সন্ধানে বার হয়। আমির সাধু ফকির বেশে সারিন্দা বাজিয়ে কট্টালি নগরের পথে-ঘাটে ভেলুয়াকে নিয়ে গান করে। ভেলুয়ার সাত সখী ঘাটে জল ভরতি গিয়ে সাধুর মুখে এমন গান শুনে তার রূপের প্রতিমূর্তি কলসিতে এঁকে আনে এবং চিহ্নস্বরূপ কলসির ভিতরে হিরের আংটি পেয়ে ভেলুয়ার নিজের স্বামীকে চিনতে দেরি হয়নি। শেষপর্যন্ত ভেলুয়া পরিকল্পনা করে ভোলা সওদাগরের আদেশে ফরিকবেশ ধারণ করা সাধুকে তার বাড়িতে থাকতে দেয় এবং রাত্রিতে আমির-ভেলুয়া একে অপরকে চিনতে পারে। বহুদিন পর এইভাবে নিজেদের একসঙ্গে ফিরে পেয়ে দুজনেই নিজেদের জীবনের কথা পরস্পরকে বলতে থাকে। অন্যদিকে মুনাফ কাজিও ভেলুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়। অনেক বাধা বিপত্তির পর আমির সাধু ভেলুয়াকে ফিরে পেতে ভোলা সদাগর ও মুনাফ কাজির সঙ্গে যুদ্ধ স্থির করে। দুজন পাষাণের হাত থেকে আমির সাধু নিজের স্ত্রীকে উদ্ধার করে এবং শেষপর্যন্ত তারা একে অপরকে ফিরে পায়। এইভাবে বহু ঘটনার বিন্যাসে কাহিনি শেষ হচ্ছে।

ভেলুয়ার কাহিনি শুধুমাত্র কেছায় সীমাবদ্ধ তা নয়। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন রচিত ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র একত্রিত ভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে ‘ভেলুয়া’ নামে (ছত্রসংখ্যা-১২১৯) একটি পালা প্রকাশিত হয়েছে, দ্বিতীয় খণ্ডে ‘ভেলুয়া’ নামে (ছত্রসংখ্যা-১৪৩৪) আর একটি পালার উল্লেখ করেছেন। এছাড়া শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত ‘প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র (তৃতীয় খণ্ড)তে ‘ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধু’ (ছত্রসংখ্যা-১২৭৪) এই নামে পালা পাওয়া যায় এবং (ষষ্ঠ খণ্ড)তে যে পালা পাওয়া যায় তার নাম ‘ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা’ (ছত্রসংখ্যা-১৭৪০)। সুন্দরী ভেলুয়াকে ঘিরে যতগুলি কাহিনি পাওয়া যাচ্ছে তা আমাদের বিশেষভাবে নজর কাড়ে। আসলে গীতিকা ও কিসসা/কেছা

এই দুই ধরনের ফর্ম (Form) এ কাহিনির উল্লেখ যেভাবে হয়েছে তা দেখার বিষয়। গীতিকা ও কেছায় বেশ কিছু কাহিনির অদল-বদল ঘটেছে সেগুলির দিকে আমরা দৃষ্টি দেব। কাহিনির পরিবর্তন, পরিবর্জন ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে তুলনা করলেই পার্থক্য এবং স্বাভাব্য ধরা পড়বে।

### পরিবর্তন:

ক. শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনের গীতিকার কাহিনি শুরু হয়েছে আমির সাধুর প্রসঙ্গ দিয়ে তার বয়স জানা যাচ্ছে যোলো বছর কিন্তু মোয়াজ্জম আলীর কেছা কাহিনি আরম্ভ ভেলুয়ার প্রসঙ্গ বর্ণনার মধ্য দিয়ে এবং এখানে আমির সাধুর দশ বছর বয়স পূর্ণ হবার কথা জানতে পারি।

খ. চরিত্রগত দিক দিয়ে নায়ক-নায়িকার (আমির সাধু, ভেলুয়া সুন্দরী) নাম সঠিক পাওয়া গেলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নামের অমিল লক্ষ করার মতো তবে শুধু চরিত্র নাম নয় দেশের নামেরও অমিল লক্ষণীয় যেমন-

গীতিকা	কেছা
মনাই সোন্দরী (আমির সাধুর মা)	সোনাই সুন্দর
মনাই (ভেলুয়ার মা)	ময়না
বিভলা (আমির সাধুর বোন)	বিবলা
টোনারাবাই (গুণিন/সারিন্দা বাদক)	টোলাবাড়িয়া (সারিন্দা বাদক)
শাফলা বন্দর	শামলা বন্দর
তেলেন্যা নগর	তেলেন্যা নগর
মাছিলি বন্দর	মাছলী বন্দর
কাটুলি নগর	কটুলি নগর

গ. আমির সাধুর শিকার যাত্রার কথা জানা যায় তবে গীতিকায় (ফাল্গুন) মাসের উল্লেখ আছে। এছাড়া শিকারে যাত্রার সময় আমির সাধুর পিতা গৌরলধর মাঝির হাতে ছেলের দায়িত্ব তুলে দেয় কিন্তু কেছায় আমির সাধু নিজে থেকেই মাঝিকে বাণিজ্য যাত্রার সমস্ত আয়োজনের কথা বলে।



ঘ. শিকারে বেরিয়ে আমির সাধু কৈতরের ঝাঁক লক্ষ করে একথা গীতিকায় জানতে পারি কিন্তু কেছায় নয় লক্ষ কবুতর (পায়রা) দেখতে পায়।

ঙ. আমির সাধুর সঙ্গে ভেলুয়ার ভাইদের যুদ্ধের কথা জানা যায়। সেই যুদ্ধে কত সৈন্য ছিল তা গীতিকায় জানা না গেলেও কেছায় সত্তর হাজার সৈন্যের উল্লেখ আছে।

চ. শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনের গীতিকায় প্রভাতকালে আমির সাধুকে বিদায় দিচ্ছে সুন্দরী ভেলুয়া কিন্তু মোয়াজ্জম আলীর কাব্যে হোঙ্কা নলের আঘাতে নিজের স্ত্রীকে বেহুশ করে আমির সাধু বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে এমন উল্লেখ আছে।

ছ. বারমাসী বর্ণনার মধ্য দিয়ে ভেলুয়ার বিরহ জীবন-যাপনের চিত্র ধরা পড়ে। সেই বারমাসী বর্ণনার ক্ষেত্রে গীতিকায় দেখা যায় একদম বৈশাখ থেকে শুরু করে চৈত্র মাস পরপর এইভাবে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু কেছায় আশ্বিন মাস থেকে শুরু করে ভাদ্র মাস দিয়ে শেষ হয়েছে।

জ. ভেলুয়া কলঙ্কিত হয়ে ঘাটে কলসি নিয়ে জল ভরতে যায় গীতিকায় এমন জানা যায় কিন্তু কেছায় বিশেষভাবে যুমনার ঘাটের উল্লেখ আছে।

ঝ. ভোলা কর্তৃক ভেলুয়া সুন্দরী লুট হওয়ার পর তার সঙ্গে দীর্ঘ ছমাস মিশতে চায়নি, 'ইদত' (তালুক দেওয়ার পর বা স্বামীর মৃত্যুর পর নতুন স্বামী গ্রহণ করা অবধি স্ত্রীজাতির যে সময় কাল একা কাটাতে হয় সেই সময় পর্ব ইদত কাল বলে পরিচিত) পালনের কথা বলে কিন্তু কেছায় ভোলা সদাগর ভেলুয়ার সঙ্গে খারাপ আচরণ করার অভিপ্রায় নিয়ে কাছে আসলে ভেলুয়ার অভিশাপে ভোলার দুচোখ কানা হয়ে যায়।

ঞ. গীতিকায় বলা হয়েছে আমির সাধু কুস্বপ্ন দেখে ভেলুয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে এবং নিজের দেশে ফিরে আসে কিন্তু কেছায় ভেলুয়া নিজে বিপদের সম্মুখীন হয়ে পত্র পাঠায়, সেই পত্র হাতে পেয়ে আমির সাধু নিজের দেশে ফিরে আসে।

ট. গীতিকায় আরও লক্ষ করা যায় ভেলুয়াকে উদ্ধারের জন্য আমির সাধু দেশে ফিরে পিতা-মাতাকে সমস্ত ঘটনা বলে গৌরলধরকে সঙ্গে নিয়ে ভোলার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু কেছায় আমির সাধু কটালি নগর থেকে পত্র দেয় গৌরলধর মাঝিকে, সেই পত্র পেয়ে মাঝি সৈন্য নিয়ে হাজির হয়।

ঠ. গীতিকায় আমির সাধু ভেলুয়াকে উদ্ধারের জন্য চৌদ্দ ডিঙা সাজানোর কথা বলে কিন্তু কেছার কাহিনি অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে আমির সাধু প্রথম যৌবনে শিকারে বার হওয়ার সময় চৌদ্দ ডিঙা নিয়ে যায়। চৌদ্দটি ডিঙা যথাযথ নামে চিহ্নিত হয়েছে। কেছায় তেরোটি নাম পাই, কালাধর ডিঙ্গার নামটি পাওয়া যায়নি।

গীতিকা	কেছা
ফোরকান	ফোরকান
কালাধর (আমির সাধু যাত্রী)	আউল-কাউল
কৈল্যাণ	লক্ষ্মীধর
কাঞ্চনমালা	হুড়িমুড়ি
গুয়াধর	হকচুর
হংসমাল	রংমালা
শ্যামল সোন্দর	কল্যান
হাঙ্গরা	হংসমালা
খৈয়াপাটি	খৈয়াপেটি
রংমালা	কাঞ্চনমালা
হকচুর	হাঙ্গরা
আউল কাউল	গুয়াবর (গৌরলধর মাঝি যাত্রী)
হুরমুর	শ্যামলাসুন্দর (আমির সাধু যাত্রী)
লক্ষ্মীধর (গৌরলধর মাঝি যাত্রী)	

### পরিবর্তন:

ক. গীতিকায় গৌরলধর মাঝির কথা জানলেও কোথাও তার স্ত্রীর কথা জানা যায়নি কিন্তু কেছায় মাঝিসহ বধুর কথা জানতে পারি। গীতিকায় স্ত্রীপ্রসঙ্গ বর্জিত হয়েছে।

খ. শিকারের পথে বেরিয়ে আমির সাধু যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে গীতিকায় তার বর্ণনা থাকলেও কেছায় তা বর্ণিত হয়নি।

গ. গীতিকায় আমির সাধু কৈতর হত্যা করলে ভেলুয়ার সাত ভাই তাকে থানায় বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার কথা জানায় কিন্তু কেছায় থানার উল্লেখ নেই বন্দি করে বাড়িতে নিয়ে যায়।

ঘ. ‘আমির সাধুর সাথে ভেলুয়ার সাত ভাইয়ের যুদ্ধ’ এই অংশটির কথা কেছাতে জানা গেলেও গীতিকায় আমির সাধুর সঙ্গে ভাইদের যুদ্ধের কোনোরকম বিবরণ নেয়, অংশটি বর্জন হয়েছে।

ঙ. বিয়ের পর ভেলুয়া বিদায়ের সময় তার সাত ভাইয়ের বউদের সাহায্যে বছরকম প্রসাধনী ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয় কিন্তু এই বর্ণনা কেছাতে নেই।

চ. গীতিকায় দিশাভুল হওয়ার ফলে আমির সাধু পুনরায় নিজের ঘরে ফিরে আসে এবং ভেলুয়ার সঙ্গে রাত্রিযাপন করে আবার বাণিজ্যে রওনা দেয়, ভেলুয়া কলঙ্কিত হয় কিন্তু কেছাতে আমির সাধু যে বিহঙ্গম পক্ষীর সহায়তায় পুনরায় ভেলুয়ার কাছে ফিরে আসে এবং রাত্রিযাপন করে আবার ফিরে যায় তার ফলস্বরূপ ভেলুয়া কলঙ্কিত হয় এই দুই ঘটনা আলাদা আলাদা ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

### সংযোজন:

ক. মোয়াজ্জম আলী রচিত কেছাতে আমির সাধু বাণিজ্যে গিয়ে বিহঙ্গম পক্ষীর সহায়তায় পুনরায় নিজের ঘরে ফিরে এসে ভেলুয়াকে নাম ধরে ডাকলে সুন্দরী ভেলুয়া সেই ডাকে সাড়া দেয় কিন্তু দরজা খোলেনি, স্বামীর পরিচয়ে চিহ্ন দেখানোর কথা বলে তৎক্ষণাৎ আমির সাধু নিজের হাতের হীরার আংটি কোঠার মধ্যে ফেলে দেয়। এই অংশটি নতুনভাবে আমরা কেছাতে পাই, যা শকুন্তলা-দুশ্মন্তের কথাকে স্মরণ করায়, শকুন্তলা আংটির মাধ্যমে রাজা দুশ্মন্তকে চিনে নেয়, গীতিকায় কাহিনি অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে।

খ. গীতিকা অংশে সখী প্রসঙ্গ না এলেও মোয়াজ্জম আলী রচিত কেছাতে সুন্দরী ভেলুয়ার সখীরা এক বিরাট জায়গা করে নেয়। মধ্যযুগের কাব্যে সখী প্রসঙ্গ প্রায়শই কাব্যে দেখা যায়, নায়িকার বহু কার্যকলাপ এ সখীদের ভূমিকা রয়েছে। আমির সাধু কটালি নগরের পথে ফকিরবেশে উপস্থিত হলে ভেলুয়ার সখীরা সেই খবর তার কাছে

আনে। সাত সখীর মধ্যে বড় সখীর কলসির মধ্যে আমির সাধু ছল করে নিজের হাতের আংটি ফেলে দেয়, পরে সেই আংটি দেখে ভেলুয়ার বুঝতে দেরি হয়নি ফকির লোকটিই তাঁর স্বামী।

গ. গীতিকায় ভেলুয়ার সতীত্বের পরীক্ষার কথা আমরা জানতে না পারলেও কেচ্ছাতে ‘ভেলুয়ার পরীক্ষার বয়ান’ এই নামে একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। ভেলুয়াকে লোহার চাল দিয়ে ভাত তৈরির কথা বলা হয়।

লোহার চাউল আনি দিলরে ভাত রাঙ্কিবার।

সেই চাউল লইরে ভেলুয়া করিছে গমন।।

পাকশালাতে লিয়ারে কন্যা করিল রন্ধন।

আমির সাধু দেখিরে ভাত বলে চমৎকার। (পৃ.২৫)

এই প্রসঙ্গে বেহুলার পরীক্ষার কথা মনে পড়ে, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যেও এমন বর্ণনা জুড়েছেন, বেহুলাকে লোহার কলাই রান্না করার জন্য বলা হয়।

হেনকালে চাঁদবেনে কহে আর কথা।

যদি সে তোমার কন্যা হয় পতিব্রতা।।

লোহার কলাই দিবে করিয়া রন্ধন।<sup>২৮</sup>

ঘ. শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন গীতিকায় সুন্দরী ভেলুয়ার কঠিন বিমারে মৃত্যুর কথা বলেন কিন্তু মোয়াজ্জম আলী কেচ্ছাতে মৃত্যুর কথা বলেননি বরং সুন্দরী ভেলুয়া কিভাবে নিজে কঠিন সংগ্রাম করে পুনরায় সংসার জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছে সেই কাহিনি বর্ণনা করেছেন। ভেলুয়া সাত পরি’র সাহায্যে রোকাম শহরে ইন্দ্ররাজার সভায় নৃত্য পরিবেশন করে এবং সেই সভায় আমির সাধু গায়েরী টুপি পরিধান করে প্রবেশ করে পরে রাজা তাকে চিনতে পেরে রাগান্বিত হয়ে ভেলুয়াকে পাথরের মূর্তিতে পরিণত করে। দীর্ঘ এক বৎসর পর আশীর্বাদ সহকারে ভেলুয়ার প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। তারপর সুন্দরী ভেলুয়াকে নিয়ে আমির সাধু নিজের দেশে ফিরে আসে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন শুরু করে। নিজের জীবনের জন্য ভেলুয়া ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করে অন্যদিকে

বেহুলা নিজের মৃত স্বামীর জীবন পুনরায় ফিরে পেতে নৃত্য করে দেবতাদের খুশি করতে।

এইক্ষেত্রে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত গীতিকার সঙ্গে আলাদাভাবে মোয়াজ্জম আলী রচিত কেছার তুলনা না করলেও কাহিনি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সবটাই স্পষ্ট কারণ আমরা আগেই শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনের ‘ভেলুয়া ও আমির সাধু’র যে কাহিনি তার বিষয়বস্তু জেনেছি। গীতিকায় সমস্ত ঘটনার বিষয়বস্তু একই থেকেছে। বিষয়বস্তু নির্মাণে কাহিনি একই থেকেছে। চরিত্র নাম, স্থানের নাম সবকিছুতেই মিল পাওয়া যায়, শুধুমাত্র অধ্যায় বিভাজনে পার্থক্য চোখে পড়ে। এছাড়া শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনের ২য় খণ্ড ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের ৬ষ্ঠ খণ্ডের কাহিনি এক থেকেছে। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন তাঁর পালাটি ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন এবং আলাদাভাবে প্রতিটি অধ্যায়ের নামকরণ করে বর্ণনা করেছেন কিন্তু শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত পালাটি ২০টি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়েছে আলাদাভাবে কোনও অধ্যায় নাম পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে মোয়াজ্জম আলীর পুথিতে বিভিন্ন অধ্যায় নামে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য়, ৪র্থ খণ্ড)	পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড)	প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড)	প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড)	কেছা পুথি
আমির সাধু	মদন সাধু	আমির সাধু	মদন সাধু	আমির সাধু
ভেলুয়া সুন্দরী	ভেলুয়া সুন্দরী	ভেলুয়া সুন্দরী	ভেলুয়া সুন্দরী	ভেলুয়া সুন্দরী
---	মুরাই সাধু	---	মুরাই সাধু	---
---	শুক ও শারী এই দুই পাখির কথা জানা যায়	---	শুক ও শারী পাখির উল্লেখ আছে	---
---	আবুরাজার প্রসঙ্গ এসেছে	---	আবুরাজার বর্ণনা পাই	---
---	হীরণ সাধুর কথা জানা যায়	---	হীরণ সাধুর প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে	---
---	মেনকা সুন্দরীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে	---	মেনকা সুন্দরীর কথা জানতে পারছি	---

সুন্দরী ভেলুয়াকে ঘিরে যে কাহিনিগুলি বর্ণিত হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তা আমরা জানলাম। এরপর গীতিকা ও কেচ্ছা বিষয়ে জানার। যেহেতু এই দুই ফর্ম এ ভেলুয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ইংরাজিতে যাকে Ballad বলা হয়ে থাকে, বাংলায় আমরা তাকেই ‘গীতিকা’ বলি। ‘Ballad’ এসেছে লাতিন ‘Ballare’ শব্দ থেকে। এর অর্থ নৃত্য অর্থাৎ নৃত্যগীত মূলক রচনা হল গীতিকা।<sup>২৯</sup> গীতিকার পালাগুলি মূলত ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে রচিত হয়েছে।

আসলে সামাজিক চিত্রপটে দুই ধরনের (গীতিকা ও কেচ্ছা) সাহিত্যের মূল্য অনেকখানি, বিশেষ বিশেষ Form এ ভেলুয়া সুন্দরীর কাহিনির বর্ণনা যেভাবে হয়েছে তাতে বোঝা যায় দুই ধারার মধ্যে ফারাক কতটা। এই কেচ্ছার মধ্যে গানের প্রভাব যেভাবে এসেছে আপাতদৃষ্টিতে বিচার করে এই রচনাকে ‘গীতিকা’ বলে দেওয়া বোধহয় খুব সহজ নয়। আসলে মৌখিক পরম্পরার সূত্র ধরেই কেচ্ছার লেখকরা নিজেদের মতো করে কাব্য রচনা করেছেন। গান বা সংগীত সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গের আওতাভুক্ত আমরা সকলেই জানি। আসলে গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে গানের মাধ্যমে গেয়ে গেয়ে কেচ্ছা বলার এক ধরনের রেওয়াজ বোধহয় ছিল, কবিরা সেই ধারার পথিক হয়েছেন। তাই ভেলুয়ার কাহিনি শুধুমাত্র যে গীতিকায় আবদ্ধ তা নয়, পুথি সাহিত্যেও মুসলমান সাহিত্যিকদের হাতে ভেলুয়ার কাহিনি বলিষ্ঠতায় ভরে উঠেছে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন।

## বড় নিজাম পাগলার কেচ্ছা

(মুনশী মহাম্মদ)

প্রণেতা: মরহুম মুনশী মহাম্মদ সাহেব।

প্রকাশক: ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১০ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, সন ১৩২৩ সাল।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৪

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রচনাকারদের অন্যতম মুনশী মহাম্মদ, হুগলি জেলার বাসিন্দা।

কাহিনি সংক্ষেপ: কাব্যটি শুরু হয়েছে ‘হামদো নাত’ এই অংশ দিয়ে। লঘু ত্রিপদী ছন্দে আল্লাহর গুণগান করেছেন। পশ্চিম দেশের সাধু মহোন বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। সাধুর স্ত্রী যথাসময়ে অপরূপ সুন্দর ছটায় বর্ণমান এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়।

দেখিয়া পুত্রের মুখ পাসোরিলো সব দুখ, খুসিতে অজুদ ফুলে গেলো।। (পৃ.৩)

এই পুত্র দাই এর পরিচর্যায় লালন-পালন হতে থাকে, অতি অল্প বয়সেই মোজাবের পড়াশুনো শেষ করে দশ বছরে উম্মর হয়ে ওঠে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত নিয়ম-নিষ্ঠা, রীতি-নীতি, কলেমা বেশ আয়ত্তের মধ্যে অর্জন করেছিল মহোন সাধুর একমাত্র পুত্র। সওদাগরের পরিবারে জন্মলাভ করার সুবাদে বংশপরম্পরায় বাণিজ্যযাত্রা ছিল তাদের একমাত্র পেশা। নিজের পুত্রকে বাণিজ্যে পাঠানোর সমস্তরকম বন্দোবস্ত করতে থাকে সওদাগর। পুত্র কিঙ্কর চাকর নফর সঙ্গে বাণিজ্যের পথে যাত্রা করে। আলাম্পানা বাদশার দরবারে সকলে উপস্থিত হয় এবং সওদাগরের পুত্রকে এত ছোট বয়সে বাণিজ্যে দেখে তিনি বিস্মিত হয়।

বাদসা সুনিয়া ফের লাগিল কহিতে।।

এমন বয়েসে ফের দেস বিদেসেতে।

সাবাস মা বাপ তেরা কলেজা ধরিয়া।।

বিদেসে ভেজিয়া দিল তোমার লাগিয়া।

এতেক বলিয়া সাহা কিঙ্করের তরে।। (পৃ.৬)

বাদশার দরবারে যাতায়াতের সুবাদে বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয় দুজনের মধ্যে। দরবারে এক জওয়ানের মুখে দক্ষিণ দেশের রাজার কন্যার রূপের বর্ণনা শুনে পাগল হয়ে ওঠে কিঙ্কর। সুন্দরী রূপবতী রাজার কন্যার কথা শুনে কিঙ্কর পাগলের মতো অস্থির হয়ে ওঠে।

খাত্তা পেত্তা নিন্দ ভুক সকলি ছাড়িল।।

সদাই জে নাম তার জপো মালা হৈল।

শুনিয়া বিবির কথা নিন্দ নাহি ধরে।।

দেলের চক্ষেতে কান্দে ফোকারিতে নারে। (পৃ.৯)

রাজকন্যা কমলাবতি পাগল পুরুষকে সেই দরবারে গাছতলায় অপেক্ষা করতে দেখে। কিঙ্করের রূপ দেখে কমলাবতির দয়া হয়।

সাহাজাদির নজর গেরে কিঙ্করের পানে।।

ছুরত দেখিয়া বিবি দয়া হৈল মনে।

আহা এ মহন রূপ কার বংসি ধারি।।

কেমনে ছাড়িয়া দিল আহা মরি মরি। (পৃ.১৩)

কমলাবতি সেই বিদেশি পাগলের কাছে তার পরিচয় জানতে চাইলে সে নিজের নাম জানায়। নেজামকে পাগলের মতো দেখে কমলাবতি অন্তরের ভিতর নিজের মায়ের কাছে নিয়ে আসে এবং খেদমতের সমস্তরকম বন্দোবস্ত করতে থাকে। নেজাম রোজ রোজ কমলাবতির সঙ্গে মক্তবখানায় যায়। কমলাবতি ধীরে ধীরে পাগল নেজামের রূপে মুগ্ধ হয় এবং তার প্রেমে আসক্ত হয়।

দুই জোনে একসাতে, পড়ে খুসি খোসালিতে,

দু জোনায় বড়া মহব্বত দুজনার পিরিতি পরে,

এক লহজা কেহু করে, না দেখিলে হয়ত মওত। (পৃ.১৪)

নেজাম নিজের দেশে পত্র পাঠায় পিতার উদ্দেশ্যে এবং সেই পত্রে কমলাবতির সমস্ত বৃত্তান্ত তুলে ধরে। বাণিজ্যযাত্রায় এসে তার এহেন কর্মের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা চায়। নেজাম ও কমলাবতি দুজনেই প্রেমের মোহে অস্থির হয়ে ওঠে এবং দুজনেই রাজ দরবার থেকে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। শেষপর্যন্ত জঙ্গলের অন্ধকারে বসবাসের উপযুক্ত জায়গা না পেয়ে কাছাকাছি বস্তিতে এসে পৌঁছায়। সেই বস্তির মাঝে এক পরম সুন্দরী মালিনীকে দুজনেই দেখতে পায় এবং গরীব মালিনী তাদের দুজনকেই নিজের ঝুপড়িতে আশ্রয় দেয়। মালিনী পতিব্রতা নিজের আপনজন বলতে তেমন কেউ নেই। মালিনীর ঝুপড়িতে এইভাবে দিন কাটানোর সময় নেজাম জানতে পারে মালিনী তার রূপে মুগ্ধ। এই পরিস্থিতিতে কমলাবতিকে মালিনীর গৃহে রেখে নেজাম সেই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মনঃস্থির করে।

শহরের পথে ঘুরতে ঘুরতে নেজাম জানতে পারে উত্তরদেশে এক রাক্ষসের বিরাত উপদ্রব সমস্ত মানুষজনকে তটস্থ করে তোলে। এই খবর শুনে নেজাম রাক্ষস



বধ করার জন্য সেই দেশের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং জানতে পারে রাজা তার সম্পত্তির অর্ধেক পুরস্কার হিসাবে দেবে এছাড়া নিজের একমাত্র কন্যার সঙ্গে বিজয়ীর বিবাহ দেবে। নেজাম পাগলা রাক্ষস বধের জন্য জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেই জঙ্গলের ভিতর গিয়ে কিছুটা ভীতিগ্রস্ত হয়ে নিজের জীবনের কথা ভেবে আক্ষেপ করতে থাকে।

আপনার মনে মনে কত কথা বকে।।  
এ সব দুষ্কের কথা বলি আর কাকে।  
কি করিতে কি করিনু আগে না বুঝিনু।।  
আপনার পায়েতে আপে কুড়ালি মারিনু।  
আছিলে আপন ঘরে খুসি খোসালিতে।।  
কু দশা ঘটিল কেন আইলে বানিজ্জেতে। (পৃ.২৭)

গভীর জঙ্গলের মধ্যে নেজাম এক তুতি পাখিকে দেখতে পায় এবং তার মুখে জানতে পারে জঙ্গলের ভিতর এক ঘরের মধ্যে একটি কুণ্ডা আছে, সেই কুণ্ডার ভিতর একটি ডিবায় ভ্রোমরা আছে সেই ভ্রোমরার মধ্যে রাক্ষসের প্রাণ আছে। নেজাম কুণ্ডায় নেমে সেই ভ্রোমরাকে বার করে হত্যা করে এবং রাক্ষসের প্রাণহানি ঘটে। রাক্ষসের দেশে ওই ঘরের মধ্যে এক সুন্দরী নারীকে নেজাম দেখতে পায়। ঘটনাক্রমে রাক্ষসপুরীর কন্যা লালমতি নেজামের রাক্ষস বধের কথা জানতে পারে এবং এই কথা শুনে সেই নারী নেজামের গলায় মাল্যদান করে এবং তাকে বিবাহ করে।

এতেক বলিয়া বিবি মালা হাতে লিয়া।।  
নিজামের গলা পরে দিল পরাইয়া।  
নিজাম আপনা মালা খুলে গলা হৈতে।।  
পরাইয়া দিল মর্দ বিবির গলেতে।  
অদল বদল কৈল মালা দোহাকার।। (পৃ.৩০)

অন্যদিকে সাহাজাদি কমলাবতি মালিনীর ঘরে দুঃখজ্ঞাপন করতে থাকে নেজামের জন্য। এক হুণ্ডা অতিক্রম করে গেলেও তার প্রাণের পুরুষ এসে পৌঁছায়নি। লালমতিকে নিয়ে নেজাম সাধু আনন্দে মেতে থাকার মধ্যেই হঠাৎ করে কমলাবতির

কথা স্মরণে আসে তৎক্ষণাৎ নেজাম মালিনীর গৃহে ফিরে আসে এবং কমলাবতির সঙ্গে দেখা করে। অন্যদিকে নেজাম রাক্ষস বধের ঘটনা রাজদরবারের রাজাকে (শ্রীধর) জানাতে সেখানে উপস্থিত হয় এবং রাজা-রাণী উভয়েই তার দুঃসাহসিক কাজে খুশি হয়ে নিজেদের কন্যা সুমতিকে নেজামের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয়। নেজামপাগল সুমতি সুন্দরীকে পেয়ে সকল নারীদের ভুলে যায় এবং তার রূপে বিমোহিত হয়ে পড়ে। সেই রাজদরবারে মালিনী নেজামকে চিনতে পারে এবং গৃহে ফিরে কমলাবতিকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলে কিন্তু সুন্দরী অভাগী কমলাবতি সে কথা কোনোমতেই বিশ্বাস করেনি। মালিনী ফন্দি করে রাজদরবারে গিয়ে মালা দেওয়ার সময় নেজামের কানে সিঁদুরের চিহ্ন করে দেয়। কিছুদিন পর কমলাবতির কাছে নেজাম প্রত্যাবর্তন করলে সেই চিহ্ন দেখে অভিমান শুরু হয় এবং নেজাম নিজের কুকর্মের জন্য কমলাবতির কাছে ক্ষমা চাই।

মাফ কর ধরি পায়, না হইলে বাচা দায়, জান দিয়া রাখনা আমায়।

হইয়াছে জা হবার, কদাচ না হবে আর, খাতা মাফ করনা আমার।। (পৃ.৪৮)

মালিনীর সহায়তায় নেজাম ও কমলাবতির বিবাহ হয়। নেজাম কমলাবতি, লালমতি ও সুমতি এই তিন সঙ্গীকে নিয়ে হাসি-খুশিতে দিন জীবনযাপন করে। ইতিমধ্যেই তুতি পাখি নেজাম পাগলাকে আরব দেশের সুন্দরী কন্যা এরাবতীর রূপের কথা শোনায়, সেই রূপের বর্ণনায় পুনরায় নেজাম অস্থির হয়ে ওঠে।

কি কবো মাথার কেশ কাল নাগ হেন।।

ঘুঙ্গরি বালেতে খোসবু আতর জেমন।

আসিয়া পড়েছে কেশ নিচেতে জানুর।।

পেসানি উপরে জেয়ছা চমকিতেছে নুর।

নাসিকার কথা তার কি দিব সাবাসি।। (পৃ.৫১-৫২)

সুন্দরী এরাবতীকে নেজামের রূপ দেখানোর জন্য একজন চিত্রকরকে আরবদেশে পাঠানোর সমস্তরকম ব্যবস্থা করতে থাকে। রাজদরবারে চিত্রকরের থলিতে

সমস্ত চিত্রের মধ্যে নেজামের রূপ দেখে এরাবতী অচেতন হয়ে পড়ে। নেজামের ছবি নিয়ে রাত্রিদিন মনের দুঃখে দিন কাটায়।

সহে না এ দুখ; ফেটে জায় বুক, মুখ না দেখাব আর।

এ নব জৌবনে, পতি রত্ন ধোনে, দরসন নাহি পায়।। (পৃ.৫৯)

নেজাম এক দরবেশের কৃপায় এরাবতীর দেশে উপস্থিত হয়। নেজাম সেই দেশে ঘুরতে ঘুরতে এরাবতীর গান শুনতে পায় এইরূপে দুজনের সাক্ষাৎ হয় এবং দুজনেই খুশি হয়। এরাবতীকে নিয়ে নেজাম অন্য স্ত্রীদের নিকট ফিরে আসে এবং তখনই সতিনজ্বালা শুরু হয়। এরাবতীকে তিন সতিন সহ্য করতে পারেনা তাদের মধ্যে ঈর্ষার আগুন জ্বলতে থাকে।

সতিনের ঝাল বড় হয় সতিনের।।

মারিতে এহার তরে ঢুড়েন ফেকের। (পৃ.৭৪)

বাকী স্ত্রীগণ এরাবতীকে অপবাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকে কিন্তু এরাবতী নিজের বুদ্ধিমত্তায় সেই বিপদ থেকে রক্ষা পায়। সমস্ত ঘটনা নেজাম জানতে পারে এবং কমলাবতি, লালমতি, সুমতিকে ত্যাগ করে একমাত্র এরাবতীকে নিয়ে বাণিজ্য থেকে নিজের দেশে ফিরে আসে। পিতা-মাতার একমাত্র আদরের পুত্র বহুদিন পর বাণিজ্যযাত্রা থেকে ফিরে এসেছে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেই সমারোহে মহলে উৎসবের রোল পড়ে এবং সমস্তরকম আনন্দ আয়োজনে এরাবতী ও নেজামের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

কাজি জিকে ডেকে এনে সাদি পড়াইল।।

আমিন আমিন ভাই সকলেতে বল।

তার পরে বর কুরি আনিলেক ঘরে।।

আরসি লইয়া দেখাইল দোহকারে।

এরাবতী খুসি মনে রহিল ঘরেতে।। (পৃ.৮১)

এইভাবে এই কেচ্ছা পুথির কাহিনি শেষ হয়েছে। আসলে নেজাম সুন্দরী নারীর প্রতি বারবারই আসক্ত হয়েছে এবং সেই নারীকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় পাগল হয়ে উঠেছে। পুরো গল্পের কাহিনি জুড়ে নেজাম এর বৃত্তান্তই উঠে এসেছে।

**ছহী গুলে বকাওলী**  
**(মুন্সী আবদুশ শকুর ওর্ফে মানিক মিঞা)**

প্রণেতা: মুন্সী আবদুশ শকুর ওর্ফে মানিক মিঞা প্রণীত।

প্রকাশক: হবিবি প্রেস, মেছুওয়া বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, সন ১৩২৭ সাল।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২৮

মূল্য:।। ০আনা মাত্র

মুন্সী আবদুশ শকুর হিন্দি কাব্যের অনুকরণ করে এই কাব্য রচনা করেছেন। মুন্সী ছাহেবের অনুরোধে এই কাব্য রচিত হয়েছে। এই কাব্য সম্পর্কে আলোচনা যতটুকু পাওয়া যায় সুকুমার সেনের কথায়, তিনি বলেছেন মানিক মিঞা (ওর্ফে আবদুশ শকুর) ‘গোলে বকাওলি’ কাব্য রচনা করেন।<sup>১০</sup>

**কাহিনি সংক্ষেপ:** কাব্যের শুরুতেই পয়ার ছন্দে আল্লাহ’র বন্দনা করেছেন। কাব্যমধ্যে গ্রন্থের নাম বলেছেন- ‘গোলে বকাওলি’। পূর্বদেশে অবস্থিত সরকারস্থান দেশের নামকরা বাদশা জয়নাল সাহা সর্বগুণের অধিকারী। বাদশার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর চারপুত্র প্রত্যেকেই রূপে রূপবান এবং সর্বগুণে বিদ্যায় বিদ্যান। বাদশার দ্বিতীয় স্ত্রী একমাত্র পুত্রসন্তান জন্ম দেয় তার নাম তাজলমুল্লুক। পণ্ডিতরা ভবিষ্যৎবাণী করে জানায় বাদশা এই পুত্রের মুখোমুখি হলে অন্ধ হয়ে যাবে। এই পুত্রকে ঘিরেই পুরো কাব্যের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। যথাযথ সময়ে তাজল লেখাপড়া, কুস্তি সবকিছুতেই পারদর্শী হয়ে ওঠে। তাজল মায়ের নিকট বিদায় নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। অন্যদিকে জয়নাল সাহা নিজেও শিকারের পথে বার হয়। তাজলমুল্লুক যে ময়দানে উপস্থিত হয় সেইস্থানেই জয়নাল সাহা এসে পৌঁছায়। ক্লান্ত হয়ে জয়নাল সাহা প্রচণ্ড দাবদাহে এক গাছের তলায় আশ্রয় নেয় এবং সেই গাছের নিচে একইস্থানে তাজলমুল্লুক আগে

থেকেই বসে ছিল। গাছতলায় তাজলকে দেখতে পেয়ে সেই রূপের ছটায় জয়নাল সাহা চোখে অন্ধ হয়ে যায়। জয়নাল সাহা দুঃখপ্রকাশ করে।

বেটাকে দেখিলে আঁখি হয়তো উজালা।

মোর ভাগ্যে উলটা তার করে খোদা তালা।। (পৃ.৬)

জয়নাল সাহা নিজের দৃষ্টি হারিয়ে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাতে থাকে, শহরের নামকরা হাকিম দ্বারাও তার সুরাহা মেলেনি শেষপর্যন্ত পণ্ডিতেরা জানায় গোলে বকাওলী (আশ্চর্য ফুল) ফুলের স্পর্শে বাদশার দৃষ্টি পুনরায় ফিরবে। একবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাদশার চারপুত্র ফুলের খোঁজে যাত্রা শুরু করে। ঘটনাক্রমে তাজলমুল্লুক দেশ ছেড়ে চলে আসে যে জায়গায়, এই চার সাহাজাদা সেখানে এসে উপস্থিত হয়। লোকমুখে সমস্ত কথা জানতে পেরে তাজলমুল্লুক ফুলের সন্ধানে মরিয়া হয়ে ওঠে। শহরের পথে ভবঘুরে জীবনযাত্রায় তাজল বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। অন্যদিকে চারজন সাহাজাদা দেলবর লক্ষার (বেশ্যা রমণী) মহলে এসে উপস্থিত হয় এবং সেখানে বেশ কিছুদিন থেকে যায়। চারভাই লক্ষার রূপে মুগ্ধ হয় এবং তার আদেশমতো সেই মহলেই পাশা খেলার পরিবেশে মেতে ওঠে। প্রতি রাতে পাশা খেলার নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে চারভাই, সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে চারজন সাহাজাদা। লক্ষা দারোগা ডেকে চারজনকে বন্দির আদেশ দেয়। নিজের ভাইদের এমন অবস্থা দেখে তাজলের দুঃখ হয় এবং সে ঘুরতে ঘুরতে শহরে এক আমিরের বাড়ি যায়, আমির তাজলের চন্দ্রতুল্য রূপ দেখে মুগ্ধ হয়। আমির তাজলকে আশ্রয় দেয়, সেখানে বসবাসকালীন সময়েই তাজল লুকিয়ে লক্ষার বাড়িতে যাওয়া শুরু করে। লক্ষার বাড়িতে গিয়ে তাজলের এক বুড়ির সঙ্গে পরিচয় হয় এবং সেই বুড়িকে দেখে তাজলের নিজের দাদির কথা মনে করে। বুড়ির কাছে তাজল নিজের চার ভাইয়ের দুঃখের কথা জানায় এবং বুড়িও সদয় হয় তার প্রতি। তাজলমুল্লুক এই বুড়ির কাছেই জানতে পারে লক্ষা কিভাবে অসৎ উপায়ে পাশা খেলায় লক্ষ লক্ষ টাকা অর্জন করে। তাজল সমস্ত কিছু জানার পর নিজের ভাইদের বিপদমুক্ত করতে লক্ষার নির্দেশমতো পাশা খেলায় রাজি হয়, তাজল নিজের বুদ্ধি এবং কৌশলের দ্বারা লক্ষাকে পরাজিত করে। শেষপর্যন্ত লক্ষা নিজেকে তাজলের কাছে দাসী

হয়ে থাকার কথা জানায় কিন্তু পিতার দুঃখের জীবনে সুখ ফিরিয়ে আনতে তাজল নিজের কর্তব্যে অবিচল। তাজল গোলে বকাওলি ফুলের খোঁজে মরিয়া হয়ে ওঠে। দেলবর লক্ষার দেওয়া বিয়ের প্রতিশ্রুতিকে সে অবজ্ঞা করে। দেলবর লক্ষা তাজলের রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। গান গেয়ে লক্ষা বিলাপ করে-

বারন করি প্রাণ নাথ সে পথে তুমি জেওনা।

জানিয়ে শুনিয়ে অগ্নি কুন্ডেতে বাঁপ দিওনা।। (পৃ.১৯)

পরিস্থানে এই গোলে বকাওলী ফুলের সন্ধান পাওয়া যাবে এই কথা তাজল লক্ষার মুখে জানতে পারে। এছাড়া আরও জানতে পারে পরিদের বাদশার কন্যা বকাওলীর তৈরি বাগানে এই ফুল আছে। তাজল নিজের চার ভাইকে মুক্ত করার কথা লক্ষার কাছে জানায় কিন্তু কোনও আশানুরূপ ফল সে পায়নি। লক্ষাকে ছেড়ে তাজল পরিস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, মোছাফের (দেও) নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ হয়। মোছাফের নিজের বহিন (বোন) এর কাছে পত্র পাঠায় তাজলকে সাহায্য করার জন্য। হাম্মালা তাজলকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং নিজের পালিত কন্যা মাহমুদার (অন্যদেশ থেকে তুলে এনে ১৪ বছর পালন করে) সঙ্গে বিবাহের সিদ্ধান্ত নেয়। মোছাফেরের বহিন হাম্মালা এবং তাঁর কন্যা মাহমুদা তাজলকে সাহায্য করে বকাওলীর বাগানে ঠিকমতো পৌঁছাতে। তাজলমুলুক বাগানে প্রবেশ করে পিতার জন্য ফুল সংগ্রহ করে এবং সেই স্থানেই বালাখানায় পালঙ্গের উপর এক সুন্দরী বিবিকে (বকাওলী পরি) ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার রূপে আসক্ত হয়। সুন্দরী কন্যার রূপ তাজলকে মোহিত করে এবং সে চিহ্ন স্বরূপ আংটি বদল করে ফিরে আসে।

তাজল একইসঙ্গে একদিকে মাহমুদার সঙ্গে বিয়ে করে অন্যদিকে দেলবর লক্ষার সঙ্গে নিকা করে। চতুর চারভাই তাজলের সংগ্রহের ফুল কেড়ে নিয়ে তাজলকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয়। পিতার নিকট চার ভাই বকাওলী ফুল হাজির করে এবং সেই ফুলের স্পর্শে জয়নাল সাহা পুনরায় চক্ষু ফিরে পায়। অন্যদিকে বকাওলী পরি বাগানে ফুল দেখতে না পেয়ে সবাইকে শাস্তি দেয় এবং অপরাধীকে খুঁজে বার করার নির্দেশ দেয়। সমস্ত জায়গায় তল্লাশির পর সরকারস্থানে এসে বকাওলী পুরুষবেশ

ধারণ করে (১৬ বছরের জওয়ান) এবং জয়নাল সাহা এই জওয়ানের কথা জানতে পারে। অন্যদিকে তাজল হাঙ্কালার নিকট বকাওলীর নকল বাগান তৈরির কথা জানায় এবং হাঙ্কালা বকাওলীর বাগানের ন্যায় একখানি বাগান তৈরি করে দেয়। জঙ্গলের কাঠুরিয়াদের মুখে তাজলের এই বাগানের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা জয়নাল সাহা জানতে পারে। আবদুশ শকুর তাজলের কাহিনির বর্ণনা দিতে এই কাব্যের মধ্যে অনেক কাহিনির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এক সাহাজাদি আওরত কিভাবে মরদ এ পরিণত হচ্ছে সেই কাহিনির কথা এখানে তুলে এনেছেন। এছাড়া এই কাব্যের কাহিনি অংশে এক চিড়িয়া ও ফকিরের কথা এসেছে। কোতভালের বয়ানে আল্লাহ'র কুদরত বা মহিমা বোঝাতে এই কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে।

তাজলের তৈরি বাগান দেখে জয়নাল সাহা খুশি হয়। তাজল নিজের দুই স্ত্রীকে (দেলবর লক্ষা, মাহমুদা) পিতার নিকট হাজির করে। অন্যদিকে বকাওলী পরি সরকস্থান ত্যাগ করে নিজের দেশে ফিরে যায় এবং সেখানে বসে তাজলকে খত লেখে। ছমনরু পরি বকাওলীর লেখা খত (পত্র) তাজলের নিকট নিয়ে পৌঁছায়। সেই পত্র মারফত জানা যায় বকাওলী পরি তাজলের প্রতি আসক্ত। ছমনরু পরির কথামতো হাঙ্কালা এসে বকাওলীর সহিত সাক্ষাৎ করে এবং হাঙ্কালা তাজলের সব বৃত্তান্ত জানতে পারে। হাঙ্কালা নিজের দামাদকে (জামাই) গোপনে বকাওলীর কাছে নিয়ে যায় এবং বকাওলি ও তাজল পরস্পর দুজনকে পেয়ে মোহিত হয়।

এরপর তাজলের মজাফফের সাহা নামে এক বাদশার কন্যা রুআফজার সহিত পরিচয় হয় এবং রুআফজা তাজলকে জানায় এক দেও কর্তৃক সে অত্যাচারিত হয়। রুআফজাকে যে দেও হরণ করে তাকে মেরে রুআফজাকে উদ্ধার করে তাজল। রুআফজা দেশে ফিরে নিজের পিতা-মাতাকে তাজলের কথা জানায়। দীর্ঘদিনবাদে রুআফজার সহযোগিতায় বকাওলী ও তাজলের সাক্ষাৎ হয়।

দোহাকার গলা দোহে হাতেতে ধরিয়া।

কামে কামাতুর হোয়ে ধরে সামটীয়া।। (পৃ.৮১)

মাতা-পিতার পরিকল্পনাতে বিরাট আয়োজনে আনন্দ-উৎসবের মধ্যে দিয়ে তাজল ও বকাওলীর বিবাহপর্ব সম্পন্ন হয়। রুআফজা লুকিয়ে বকাওলী ও তাজলের বিবাহ বাসরের চিত্র দেখে এবং তামাশা করে। বিবাহকার্য সম্পন্ন হলে তাজল বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে নিজের দেশে ফিরতে চায়, বকাওলী মাতা-পিতার নিকট বিদায় নিয়ে তাজলের সহিত রওনা দেয়। অন্যদিকে বকাওলী দীর্ঘদিন অমর নগরে ইন্দ্রপুরীতে না যাওয়ার ফলে ইন্দ্ররাজা রুষ্ট হয়। বকাওলী এক মানুষের উপর আশক হয় একথা ইন্দ্ররাজা জানতে পারে। ইন্দ্ররাজা বকাওলীকে তুলে আনার নির্দেশ দেয়। বকাওলী পরি রাজাকে তুষ্ট করতে ইন্দ্রসভায় নাচ করে।

সবাত্রে জাইয়া বিবী নাচিতে লাগিল।

মহফেলের লোক যত সবে মোহ গেল।।

দেখিয়া সে ইন্দ্র রাজা খোসাল হাজার। (পৃ.৮৬)

প্রতিদিন এইভাবে ইন্দ্রপুরীতে বকাওলী যাতায়াত শুরু করে, মাঝরাতে তাজল বিছানায় বকাওলীকে না দেখে সন্দেহ প্রকাশ করে। বকাওলী যে তক্তরঙাতে চেপে ইন্দ্রপুরীতে যায় সেই তক্তের একপাশ চেপে ধরে তাজল বকাওলীর সহিত ইন্দ্ররাজার সভায় হাজির হয়। তাজল সেখানে পৌঁছে বকাওলীকে সভায় নাচতে দেখে এবং ইন্দ্ররাজার শাপে শেষপর্যন্ত বকাওলী পরি পাথরে পরিণত হয়। ছঙ্গল দ্বীপের এক মন্দিরে বকাওলী পরিকে পাথর করে রাখা হয়। এই দ্বীপের এক ব্রাহ্মণের মুখে তাজল বকাওলীর কথা জানতে পারে। এছাড়া এই দ্বীপে চতরসেন রাজার কন্যা চাতরাভাত এর সঙ্গে তাজলের পরিচয় হয় এবং এই কন্যা তাজলের রূপে আকৃষ্ট হয়। চতরসেন কন্যার বিবাহের জন্য তাজলের নিকট ঘটক প্রেরণ করে কিন্তু তাজল রাজি হয়নি। তাজলকে মিথ্যা অপবাদে দায়ে কারাগারে বন্দি করে। বন্দি অবস্থায় বকাওলীকে না পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত তাজল বিবাহে সম্মতি জানায় এবং রাজা চতরসেন মহাধুমধামে কন্যার বিবাহ দেয়। বিবাহপর্ব মিটে গেলে তাজল রাত্রিতে গৃহত্যাগ করে বকাওলীর নিকট পৌঁছায় দেখা করার জন্য। এইভাবে কিছুদিন লক্ষ করার পর চাতরাভাত পিতার নিকট সকল বৃত্তান্ত জানায়। সকলেই তাজলকে নজরে রাখে এবং



জানতে পারে বকাওলীর কথা, রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে সেই মন্দির ধ্বংস করার জন্য আদেশ করে।

তাজল তারপর থেকে কোনোভাবেই বকাওলীর সন্ধান না পেয়ে চাতরাভাতের সহিত সংসার জীবনে মগ্ন হয়। ভাগ্যক্রমে এক কৃষাণের ঘরে বকাওলীর পুনরায় জন্ম হয়। কৃষাণের ঘরে জন্মানো কন্যাকে দেখে তাজল চিনতে পারে এবং তাকে বিবাহের জন্য ঘটক প্রেরণ করে। অন্যদিকে বকাওলী কৃষাণ এবং তাঁর স্ত্রীকে তাঁর পূর্ব-বৃত্তান্ত সব জানায়, শেষে বকাওলী কৃষাণের ঘর ত্যাগ করে তাজলের সঙ্গে ফিরে আসে। শেষপর্যন্ত তাজলমুগ্ধক নিজের চারজন স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় নিজের দেশে ফিরে আসে এবং জয়নাল সাহার শহরে আনন্দের স্রোত বইতে থাকে, এইভাবে গুলে বকাওলীর কেচ্ছা শেষ হচ্ছে। এই কাব্যে নারী চরিত্রের মধ্যে বকাওলীর ইতিহাস অনেকটা অন্যরকম, বকাওলীর পুনর্জন্মের কথা বর্ণিত হয়েছে। ইন্দ্রসভায় নাচের উল্লেখ আছে। অন্যান্য নারীর চেয়ে সবচাইতে বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে প্রেমিক পুরুষকে পাওয়ার জন্য। তাই হয়তো এই কাব্যের নামকরণেও সেই বিশেষ দিকটির কথা স্মরণ করা হয়েছে।

গোলে বকাওলীর কাহিনি নিয়ে অনেক সাহিত্যিক নিজেদের দক্ষতায় কাব্য রচনা করেছেন। সব কাব্যের বিষয়বস্তু মোটামুটি একইরকম শুধুমাত্র আপন আপন নিজস্বতায় কাহিনি বর্ণনায় লেখার ফারাক ঘটেছে।

কবির নাম	কাব্য	রচনাকাল
নওয়াজিস খান	গুলে বকাওলী	আঠারো শতক
মুহম্মদ মুকীম	গুলে বকাওলী	১৭৬০-৭০ খ্রীঃ
মুহম্মদ আলী	গুলে বকাওলী	আঠারো শতক
মুগ্গী এরাদত আলী	গোলে বকাওলি ও তাজুল কুমারের পুথি	১৮৪০ খ্রীঃ
উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র	গুলে বকাওলি ইতিহাস	১৮৪৩ খ্রীঃ
বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়	গোলে বকাওলী	১৯০৪ খ্রীঃ
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	গোলে বকাওলি	১৮৭৮ খ্রীঃ
কুঞ্জবিহারী বসু	গোলে বকাওলী	১৮৮১ খ্রীঃ

সূত্র: ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ২০১২, পৃ. ৩৭৮।

আজদ্যার কেছা  
(গরীব তৈয়ব)

গরীব তৈয়ব রচিত ‘আজদ্যার কেছা’ সত্যপীরপালার কাহিনি নিয়ে রচিত একখানি পুথি। এই পুথিটি অধ্যাপক সুমঙ্গল রাণা বীরভূমের রাজনগরের হরেনসতুল্লার পুত্র বদর উল ইসলামের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করেন। গরীব তৈয়ব রাঢ়ভূমির বাসিন্দা। সত্যপীরের মহিমা হিন্দু-মুসলমান উভয়সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে কতটা শুভ বার্তা বহন করে এনেছে তা কাব্যের পড়তে পড়তে লক্ষ করার মতো। মুসলমান সাহিত্যিকরা এই পীরের ধারণাকে গ্রহণ করে কেছা রচনা করেছেন।

**পুথি পরিচয়:** শ্রীপঞ্চগনন মণ্ডল সম্পাদিত ‘পুঁথি-পরিচয়’ (চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থে এই পুথিটির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী ক্যাটালগে পুথি সংখ্যা-১৫৩৮, পত্র সংখ্যা-৮৪। লিপিকাল আনুমানিক ১২০১ সাল, আকার  $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{২}$  ইঞ্চি। অখণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়।

**কাহিনি সংক্ষেপ:** আল্লার মহিমা দিয়ে কাব্যটি শুরু হয়েছে-

আল্লা আল্লা বল ভাই নবি কর সার।

হরদোমে জিগির কর মহাম্মদ মাদার।। (পৃ.১)

সত্যপীরের মহিমা গোটা মুসলমান জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হলেও হিন্দু সমাজের মানুষের কাছে প্রথমদিকে সত্যপীর সেই ভাবে পূজা পায়নি। সেই প্রসঙ্গ এখানে বর্ণনায় এসেছে।

দুনিঞাতে জত লোক আছে মোছলমানে।

সত্তপীরের কারামত তারা সবাই জানে।।

হিন্দু লোক নাহি জানে দেত্তান সত্তপীরে।

তেকারণে হিন্দুলোক পূজা নাহি করে।। (পৃ.১)

সত্যপীর স্বয়ং মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য অযোধ্যা নগরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। নফর ছিদ্দিক অযোধ্যা নগরে সত্যপীরকে যেতে বারণ করে এবং সেখানে গেলে

তাঁর মৃত্যু হবে এমনতর আশঙ্কা করে। অযোধ্যা নগরের চূড়ামণি দশরত রাজা। তাঁর মহিমা সারা অযোধ্যা জুড়ে ছড়িয়ে।

যুর্জবংসে চূড়ামণি দশরত রাজা।

দেবগন্ধর্বলোকে জার করে পূজা।। (পৃ.১)

এই বংশেই কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কোমললোচন অর্থাৎ রামচন্দ্র। তাঁর বৈমাত্র ভাই লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। একসময় লক্ষ্মণ শক্তিসেল বাণে জর্জরিত হয়ে পড়ে, এই পরিস্থিতিতে বীর হনুমান নিজের শক্তিবলে ঔষধের জন্য গন্ধমাধনে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। যাত্রাপথে সূর্যঠাকুরকে পিষ্ট করে নিজের আয়ত্তে এনে পর্বতের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সমস্ত পর্বতময় ঔষধ খোঁজার পরেও না পেয়ে আস্ত পর্বতখানা তুলে মাথায় করে নিয়ে আসে। ভরত ঠাকুর এইরকম দৃশ্য লক্ষ করে কিছু বিবেচনা না করেই হনুমানের বুক গণ্ডিবাণ নিক্ষেপ করে। তৎক্ষণাৎ হনুমান মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রঘুনাথকে স্মরণ করে, হনুমানের মুখে রঘুনাথ (রাম) শব্দ শুনে ভরত নিজের ভুল বুঝতে পারে। ভরত নিজের হাতের ধনুক, বাণ ছুড়ে ফেলে হনুমানের কাছে গিয়ে জানতে চায় কি কারণে তার এই যাত্রা। হনুমান ভরতকে লক্ষ্মণের বিপদের কথা জানায় এবং পর্বতে ঔষধ চিনতে না পারায় মস্ত পর্বত তুলে আনার সিদ্ধান্তের কথাও শোনায়। হনুমানের এই যাত্রাপথে ভরতের বাণ ক্ষেপণ যে লক্ষ্মণের মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকতে পারে সে কথাও বলে। শেষপর্যন্ত ভরতের সহযোগিতায় হনুমান পুনরায় পর্বত নিয়ে রামের কাছে হাজির হয় এবং লক্ষ্মণ জীবন ফিরে পায়।

পর্বত লইএগা আইল রামের সর্নিধান।

অউখদ প্রবেসে দেখ বাচিল লক্ষ্মন।। (পৃ.২)

অন্যদিকে ছিদ্দিকি নফর সত্যপীরের সঙ্গে অযোধ্যা নগরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। সত্যপীর নিজে ফকির রূপ ধরে অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করে।

হাথে নিলেন রাঙ্গা লাঠি কান্ধে নিল ছাতা।

কেবল পাঁজরা সার তাহে নাহি পাতা।।

নফর লইএগা সঙ্গে করিল গোমন।

অর্জুনা নগরে জাগ্রা দিল দরসন।।

ছাহেব অনাথের নাথ ভাবেন সর্ভপির। (পৃ.৩)

সত্যপীরের ফকিরবেশী রূপে নগরের শিশুরা বড়ই আনন্দিত, শিশুদের এই রূপে দেখা দিয়ে আবার গায়েব হয়ে যায়। এই ভিখারি বেশ ধারণ ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের শিবের ভিক্ষাযাত্রাকে স্মরণ করায়। এছাড়া পীরের গায়েব হওয়ার বিষয়টিও মঙ্গলকাব্যে দেব-দেবীর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পুনরাবৃত্তি।<sup>৩১</sup>

গরীব তৈয়ব এই কাহিনির মধ্যে আর এক কাহিনির অবতারণা করে পুরো কাব্যের বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অযোধ্যানগরে এক কাঙ্গল ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রী দীর্ঘদিন নিঃসন্তান হয়ে জীবনধারণ করে। ব্রাহ্মণ প্রতিনয়ত শিবপূজায় নিয়োজিত থেকেছে, শেষপর্যন্ত দীর্ঘ বারোবছর পর মহাদেবের কৃপায় তাঁদের ঘর আলো করে দুই পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। ব্রাহ্মণের ঘরে নিত্যদিন অভাব, ভিক্ষা করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। ব্রাহ্মণী দুই পুত্রকে ঘরে রেখে সরোবরে স্নান করতে গেলে সত্যপীর দুই পুত্রকে হরণ করে।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দুই পুত্রকে হারিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে।

চুরি হইল দুটি বাছা নাহি তার ঘরে।

তায় কালিনি মাএর মণ উটাটান করে।। (পৃ.৪)

পুত্রদের হারিয়ে ব্রাহ্মণ শোকাতুর অবস্থায় অযোধ্যা নগরে সীতা হরণের কথা মনে করে। দুষ্ট রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে যায়, বহুদিন সীতা সেখানে বন্দি অবস্থায় জীবন কাটায়। অনেক যুদ্ধ করার পর রাম স্ত্রীকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনে। ব্রাহ্মণ এই ঘটনাকে পুরো অযোধ্যাবাসীর কাছে পাপ হিসাবে মনে করে এবং নিজেদের দুই পুত্রের নিখোঁজ হওয়া এই পাপেরই কর্মফল। ব্রাহ্মণ দশরথের পুরীতে গিয়ে লক্ষ্মণকে এই কথা বলে এবং লক্ষ্মণ তাঁর কাছে ক্ষমাভিক্ষা প্রার্থনা করে। পুনরায় সন্তানের জন্ম হলে লক্ষ্মণ সেই সন্তান রক্ষা করার দায়িত্ব নেবে একথা বলে।

ব্রাহ্মণী পুনরায় শিবের বরে গর্ভবতী হয়। সন্তান প্রসবের দিন বীর লক্ষ্মণ হনুমানকে (পবনন্দন) নিয়ে ব্রাহ্মণের বাড়িতে চারি প্রহর রাত্রি জেগে পাহারা দেয়।

পুরো বাড়ি গড় দিয়ে গণ্ডীবাণ মেলে দেয় হনুমান কিন্তু নজরদারি সত্ত্বেও মায়ের কোল থেকে পুত্রকে চুরি করে সত্যপীর। সন্তানকে না পেয়ে দুজনেই অস্থির হয়ে ওঠে এবং ব্রাহ্মণের দেওয়া শাস্তি লক্ষণ মাথায় পেতে নেয়।

অন্যদিকে রাম নিজের ভ্রাতাকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দেখে হাহাকার করে। পবননন্দন অস্থির হয়ে ওঠে রামের নির্দেশে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সবত্রই খুঁজে বেড়ায় ব্রাহ্মণ পুত্রদের উদ্ধারের জন্য। পবননন্দন জোমপুরীতে তল্লাশি করে কোনও সন্ধান পায়নি, শেষপর্যন্ত নিজের মাতার কাছে পবননন্দন জানতে পারে পাতালপুরীতে সত্যনারায়ণ ব্রাহ্মণের তিনপুত্রকে চুরি করে। হনুমান মাতার কথামতো পাতালপুরীতে প্রবেশ করে এবং তিন পুত্রকে দেখতে পায়। এই পুত্রদের মুখে পবননন্দন জানতে পারে সত্যপীর যুগে যুগে সংসারে সকলের কল্যাণ করে এসেছে, কিন্তু অযোধ্যাবাসী তাঁর সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেনি সেই ক্রোধে পুত্রদের চুরি করে। এই সকল বৃত্তান্ত শুনে হনুমান সকলকে নিয়ে পালানোর পরিকল্পনা করে কিন্তু পুত্রগণ সত্যপীরের সকল কেরামতির কথা জানায়। কিন্তু পবননন্দন নিজের ক্ষমতার কাছে সত্যপীরের ক্ষমতাকে লঘু করে দেখে। বীর হনুমান সত্যপীরের মুখোমুখি হয়ে পুত্রদের ছেড়ে দেওয়ার আর্জি জানায় কিন্তু নিজের পূজা আদায় না করে কোনোভাবেই তাদের নিস্তার নেয় সেকথা জানায়। শেষপর্যন্ত সত্যপীরের অভিশাপে হনুমান নিজের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। হনুমানসহ সকলেই বুঝতে পারে ফকিরবেশী পীর আসলে পৃথক কোনও দেবতা বা ফকির নয়। চারযুগের চারজন অবতার। সত্যপীর নিজের কেরামতিতে আসল রূপ হনুমানের সামনে দেখায় এবং সেই রূপ দেখে হনুমান মূর্ছা যায়।

সোন সোন অরে বাছা বির হনুমান।

আমি মোছলমানের সর্ভপির হিন্দুর নারায়ন।।

জাহির হইনু আমি সকল সংসারে।

সর্ভপিরের পূজা করে প্রতি ঘরে ঘরে।।

মোছলমান সিন্ধি দেয় মোল্লাকে ডাকীঞা।

হিন্দু সব পূজা করে ব্রাহ্মণ আনিঞা।।

সব দেসে জাহির হঞাছি ঘরে ঘরে। (পৃ.২৫)

ব্রাহ্মণ পুত্রদের নিয়ে হনুমান অযোধ্যানগরে প্রত্যাবর্তন করে পীরের সকল কথা জানায়, সকল নগরবাসী হনুমানের কথামতো সত্যপীরের পূজা করতে থাকে এবং আত্মীয়-পরিজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব নিয়ে সত্যপীরের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে। এইভাবে কাব্যটি শেষ হয়েছে। এই কেছার মূল উপজীব্য বিষয় অযোধ্যায় সত্যপীরের মাহাত্ম্য-প্রচার করা। আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি কাব্য নামের সঙ্গে লেখক ‘কেছা’ কথাটি জুড়ে দিয়েছেন। আসলে মধ্যযুগে অন্যান্য ধারার মতোই মুসলমান সাহিত্যিকদের হাতে এই কেছা সাহিত্য জনপ্রিয়তার জায়গা তৈরি করে। ‘রামায়ণ’ কাহিনিকে গল্প বর্ণনায় জুড়ে দিলেও পুরো কাহিনির সমাবেশ ঘটেনি শুধুমাত্র অযোধ্যানগরীর বর্ণনা অংশ এবং রাম-সীতার গল্পকথাকে এখানে তুলে ধরেছেন। এছাড়া নারীর জীবনের যে কলঙ্কিত আভাস তা এখানে সীতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। আসলে কেছায় নারীদের কথা বেশি করে এসেছে। এখানেও সীতাকে পাপের ভাগীদার করে তুলে অর্থাৎ নারীর কুৎসা<sup>৩২</sup> ঘটিয়ে পীরের মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে।

### পোস্তক কেছা মানিক ছওদাগর (বালক মিঞা)

মুসলমান সাহিত্যিকরা পীরদের নিয়ে নানারকম কেছা সাহিত্য রচনা করেছেন। শ্রীপঞ্চগনন মণ্ডল সম্পাদিত ‘পুঁথি-পরিচয়’ (চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থে এই পুঁথির উল্লেখ আছে।  
**পুঁথি পরিচয়:** বালক মিঞা রচিত এই পুঁথিটি বীরভূম জেলার রাজনগর এলাকায় প্রাপ্ত। বিশ্বভারতী ক্যাটালগে পুঁথিসংখ্যা-১৫৪৭, পত্রসংখ্যা-৭৩, আকার-  $৮\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{২}$  ইঞ্চি, অখণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়। লিপিকাল আনুমানিক ১২০১ সাল। মুদ্রিত পুঁথি।  
**কাহিনি সংক্ষেপ:** বালক মিঞা রচিত ‘পোস্তক কেছা মানিক ছওদাগর’ এই কাব্যে মানিক সওদাগরের জীবনের মধ্য দিয়ে সত্যপীরের মহিমা প্রচারিত হয়েছে। প্রথমেই হবিব অর্থাৎ মোহাম্মদের বন্দনা করেছেন। গুজরাট শহরের নামকরা সওদাগর মানিক বিলাসবহুল জীবন ধারণে অভ্যস্ত, সূর্যনের কলসিতে জলপান করে। এই সওদাগরের নিজের সাত পুত্র এবং সাত পুত্রবধু নিয়ে সুখের সংসার। সত্যপীর নিজে ফকিরবেশে

সওদাগরের বাড়িতে প্রবেশ করে। মানিক সাধু পালঙ্গের উপর বসে ফকিরের মুখে আল্লাহ'র কথা শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে মারার উপক্রম হয়। এই সওদাগর কুফার জাতির নিষ্ঠায় জীবন ধারণ করে। মানিক সাধুর ছোটবউ (কমলাবতি) ফকিরের হাঁক শুনে ভিক্ষা দিতে এগিয়ে আসে কিন্তু ফকির ভাত খেতে চায়। কমলাবতি ফকিরকে জানায় বাড়ির রান্নাঘরে সে ঢুকতে পারেনা। কিন্তু ফকির কমলাবতির হাতে রান্না ভাত খেয়ে এই গৃহ ত্যাগ করবে এমন কথা জানায়। শেষপর্যন্ত কমলাবতি রন্ধন করা খাবার প্রথমেই ফকিরকে তুলে খেতে দেয়, এই দৃশ্য দেখে মানিক সাধু ছোট বউকে প্রহার করতে থাকে। এবং ছোট পুত্রকে আদেশ করে সেই বধূকে বনবাস দেওয়ার জন্য। নিজের ভুলের জন্য কমলাবতি সকলের কাছে ক্ষমা চাইলেও নিস্তার পায়নি।

বনবাসে থাকাকালীন চরম বিপদের সময় সত্যপীর কৃপা করে। জঙ্গলের ভিতর মন্দির বানিয়ে দেয় কমলাবতির থাকার জন্য। অন্যদিকে মানিক সাধুর জীবনে চরম দুর্দশা নেমে আসে সমস্ত মালমত্তা প্রতিপত্তি হারিয়ে ভিখারির মতন জীবনধারণ করে। সত্যপীরের আদেশ পেয়ে সওদাগর পীরের নামে শিরনি মানত করে। এছাড়া পরিবারের সকলে মিলে ছোটবধূকে গৃহে ফিরিয়ে আনে এবং পীরের কৃপায় সব সম্পত্তি পুনরায় ফিরে পায়।

এই কাব্যে মানিক সাধুর জীবনের চরম দুর্দশা এবং পুনরায় সবকিছু ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে পীরের কৃপায়। ফকির বা পীরকে আড়ালে রেখে কবি মানিক সাধুর জীবনের কথা বর্ণনা করেছেন। এই কেছার বর্ণনায় পীরের পূজা প্রচার এবং শিরনি মানতের কথা উঠে এসেছে। এখনও বহু জায়গায় এইভাবেই পীরের পূজা সম্পন্ন হয়।

### কেছা আলি অলি

(অধম বালক, গরীব বরকত)

শ্রীপঞ্চগনন মণ্ডল সংকলিত 'পুঁথি-পরিচয়' (চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থে 'কেছা আলি অলি' পুঁথিটি পাওয়া যায়। ভগিতা অংশ থেকে বোঝা যায় এই পুঁথিটি কোনও একক কবির রচনা নয়।

পুথি পরিচয়: বিশ্বভারতী ক্যাটালগে পুথি সংখ্যা-১৫৪১, পত্রসংখ্যা-৭৩, আকার- ৮ $\frac{২}{৩}$  × ৫ $\frac{১}{৩}$  ইঞ্চি, লিপিকাল আনুমানিক ১২০১ সাল, অখণ্ডিত পুথি, আধার তুলটে লেখা হয়েছে।

**কাহিনি সংক্ষেপ:** সত্যপীরকে আড়ালে রেখে আলি অলির গল্পের মধ্য দিয়ে কবিরা এখানে কাব্যের বিষয়বস্তুকে তুলে ধরেছেন। বাল্লক শহরের নামজাদা সওদাগর খইরত একসময় বাণিজ্যপথে যাত্রার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। এই সওদাগর ডিঙা নিয়ে আনন্তিনগর পৌঁছায়, সেখানে নদীর কূলে একজন কাঠুরিয়া (একমেগা) জ্ঞাতি-কুটুম্ব নিয়ে সত্যপীরের নামে শিরনি দান করে। নদীর কূলে এই আনন্দের সমারোহ দেখে সওদাগর সেখানে হাজির হয়, অপুত্রক হওয়ায় নিজেও সত্যপীরের নামে হাজার টাকার শিরনি মানত করে। বাণিজ্য যাত্রা থেকে বারো বছর পর সওদাগর নিজের গৃহে ফিরে আসে এবং স্ত্রীকে পীরের সকল বৃত্তান্ত জানায়। সওদাগরের স্ত্রী স্নান করে পীরের ফুল-শিরনি নিয়ে মোনাজাত করে।

পীরের কৃপায় সওদাগরের স্ত্রী গর্ভবতী হয়, দশ মাস পরিপূর্ণ করে দুটি চন্দ্রবদন পুত্রের জন্ম দেয়। সওদাগর একটি পুত্রের জন্য পীরের কাছে মানত করে কিন্তু আঁটকুড়ো পিতার দুই পুত্র সন্তান হয়। শহরের নামকরা ব্রাহ্মণ এসে পঞ্জিকা দেখে দুই পুত্রের নাম দেয় আলি ও অলি।

সওদাগর পীরের মানত করা শিরনি দিতে ভুলে যায়, পরিণামে নিজের স্ত্রীকে হারায় এবং দুই পুত্র (আলি-অলি) মাতৃহারা হয়। পুত্রদের করুণ পরিস্থিতি দেখে সওদাগর সন্ধুকা শহরের কন্যা মল্লিকাকে পুনরায় বিবাহ করে। শুধুমাত্র নিজের পুত্রদের মাতৃস্নেহে ভরিয়ে দিতে এই বিবাহ করে। খইরত সওদাগর স্ত্রী এবং দুই পুত্র রেখে আবার বাণিজ্যে যাওয়ার মনস্থির করে। সওদাগর ডিঙা নিয়ে যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়ে, সেই সময় মল্লিকা নিজের রূপ-যৌবনের কথা মনে করে খইরতের জন্য প্রতীক্ষায় না থেকে পুনরায় অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মোগল বাদশার সহিত মল্লিকার প্রণয়ের সম্পর্ক তৈরি হয় এবং যুক্তি করে আলি-অলি দুই ভাইকে হত্যার



পরিকল্পনা করে। নিজেদের স্বার্থ-চরিতার্থ করার জন্য মল্লিকা পরম স্নেহে দুই পুত্রকে কাছে ডাকে এবং নিজের তৈরি শরবত দুজনকে খেতে দেয়। বিষমিশ্রিত শরবত খেয়ে আলি-অলি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

দুটি ভাই করেন বিকুলি।।

কেমন কেমন করে গা চলিতে না চলে পা অঙ্গ তাদের হইল মলিন।  
পড়িএগা বিসম পাকে বাপ বাপ বলে ডাকে এবে বিধি তারে হইল ভিন।।  
আসিএগা বাপের ডেরে লেটিল পালঙ্গ পরে দুটি ভাই তেজিল পরানে।  
(পৃ.১২৩)

অন্যদিকে মোগল বাদশা ছিফাই এর সহিত মল্লিকা তামাশায় মেতে ওঠে। সত্যপীরের কৃপায় দুই অনাথ পুত্র পুনরায় বেঁচে ওঠে, শ্বেতমাছি রূপে পুত্রদের পাশে বসে তাঁদের অঙ্গে হাত দিয়ে জীবন ফিরিয়ে দেয়। পীরের কথামতো দুই ভাই গৃহ ত্যাগ করে জঙ্গলের মধ্যে জীবন কাটাতে শুরু করে। ছোট ভাই অলি পানি পিপাসায় অস্থির হয়ে ওঠে, বড় ভাই কোথাও পানির সন্ধান না পেয়ে ছোট ভাইয়ের কষ্ট দেখে আলি পানির খোঁজে পথ হারায় জঙ্গলমাঝে। অলি ভাইকে না দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে, এই পরিস্থিতিতে সত্যপীর সহায়তা করে, পানি খেয়ে নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করে।

অনুপাম শহরে দাওদ নামে সওদাগরের একমাত্র পুত্র কুজা (এই পুত্রের পিঠে আড়াই হাত কুজ আছে এই কারণেই এই নাম)। স্বপ্নাদেশ পেয়ে শিকারের জন্য দাওদ জঙ্গলের পথে বার হয়, সেই জঙ্গলের মাঝে সুন্দর রূপধারী এক পুত্রকে (অলি) দেখতে পায়। অলিকে নিজের গৃহে নিয়ে আসে কিন্তু দাওদের স্ত্রী স্বামীর এই কাজে সহমত পোষণ করেনি সেই পুত্রকে জঙ্গলে রেখে আসার কথা জানায়। অলিকে কারাগারে বন্দি করে রাখে। দাওদ নিজের পুত্রের বিবাহের জন্য সন্ধুক শহরের দৌলত সওদাগরের মহলে হাজির হয়। তাঁর কন্যা মনহরির সঙ্গে কুজার বিবাহের বন্দোবস্ত করে কিন্তু দাওদ চালাকি করে অলিকে কন্যাপক্ষের সামনে হাজির করে। দৌলত অলির রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজের কন্যাকে সমর্পণ করতে রাজি হয়। সমস্ত আয়োজনে বিবাহপর্ব মিটে যাওয়ার পর মনহরি পতি হিসাবে কুজাকে দেখে মূর্ছা যায়। বিবাহবাসরে কুজাকে

হত্যার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে এবং ছুরির আঘাতে কুজাকে হত্যা করে। বিচারসভায় সকলে জানতে পারে অলিকে বন্দি করে মিথ্যা ছলনার আশ্রয়ে মনহরির সঙ্গে কুজার বিয়ে হয়। সেই সভায় খইরত সওদাগর নিজের পুত্রের নাম শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সৎ মা পুত্রদের দায়িত্ব ত্যাগ করে পরকীয়ায় মত্ত থেকেছে একথাও খইরত সওদাগরের কানে আসে। নিজের পুত্রকে (অলি) কারাগার থেকে মুক্ত করে নিজের কাছে নিয়ে আসে এবং অন্যদিকে সত্যপীরের কৃপায় শেষপর্যন্ত আবার খইরত সওদাগর নিজের প্রথম স্ত্রীর প্রাণ ফিরে পায়। খইরত সওদাগর নিজের স্ত্রী এবং দুই পুত্রকে নিয়ে নিজের দেশে ফিরে নতুন করে জীবন শুরু করার কথা ভাবে এবং সত্যপীরের নামে শিরনি প্রদান করে। এই কাব্যটিতে খইরত সওদাগরের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে কেচ্ছার গল্প বর্ণনার মধ্য দিয়ে সত্যপীরের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে।

### ইমামের কেচ্ছা

(রাধাচরণ গোপ)

শ্রীপঞ্চগনন মণ্ডল সম্পাদিত ‘পুঁথি-পরিচয়’ (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে ‘ইমামের কেচ্ছা’ এই পুঁথিটির উল্লেখ আছে। ইমাম হাসান ও হোসেন এবং এজিদ এর কাহিনি নিয়ে রাধাচরণ গোপ এই পুঁথি রচনা করেছেন।

**পুঁথি পরিচয়:** এই পুঁথিটি বোলপুর-শ্রীনিকেতনের সন্নিহিত লোহাশুড়ি গ্রামে প্রাপ্ত। সম্পাদকীয় গ্রন্থে ‘ইমামের কেচ্ছা’ নিয়ে মোট চারটি পুঁথির উল্লেখ আছে।

১. বিশ্বভারতী ক্যাটালগে পুঁথিসংখ্যা-৬৮১, পত্রসংখ্যা-৫টি, আকার- $১৪\frac{১}{২} \times ৫$  ইঞ্চি, লিপিকাল ১২৩৪ সাল, খণ্ডিত পুঁথি।

২. বিশ্বভারতী ক্যাটালগে পুঁথিসংখ্যা- ৬৮৩, পত্রসংখ্যা-৪১টি, আকার- $১৩\frac{১}{২} \times ৪\frac{১}{২}$  ইঞ্চি, লিপিকাল ১২৩৪ সাল, খণ্ডিত পুঁথি।

৩. বিশ্বভারতী ক্যাটালগে পুঁথিসংখ্যা-৬২৫, পত্রসংখ্যা-২৫টি, আকার-  $১১ \times ৪$  ইঞ্চি, খণ্ডিত পুঁথি।

৪. বিশ্বভারতী ক্যাটালগে পুথি সংখ্যা-৬২৬, পত্র সংখ্যা- ৪০টি, আকার- ১৪ × ৪½ ইঞ্চি, খণ্ডিত পুথি।

**কাহিনি সংক্ষেপ:** রাধাচরণ গোপ কাব্যের শুরুতেই ‘বন্দনা’ অংশে আল্লাহ, নবির উল্লেখ করেছেন। এজিদ মদিনা শহর থেকে কৌশল করে ইমাম হাসান ও হোসেন দুই ভাইকে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসে। বড় ইমাম হাসান জহর (বিষ) খেয়ে মারা যায় এবং ছোট ইমাম হোসেন পরিবারসহ পালিয়ে যায়। নবিজি জিবরাইল মারফত জানতে পারে মাবিয়ার পুত্র এজিদের হাতে দুই ইমাম মারা যাবে। মাবিয়া বন্ধুত্বের কথা মর্যাদা রাখতে বিয়ে করতে নারাজ কিন্তু কঠিন সময়ের কথা ভেবে মাবিয়া শহরের সবথেকে বয়স্ক এক বুড়িকে বিবাহ করে। এজিদ নামে পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। পরবর্তীতে এই এজিদের ষড়যন্ত্রে ইমাম হাসান ও হোসেনের মৃত্যু হয়। কেছায় এই অংশটুকুই বর্ণিত হয়েছে।

কারবালার কাহিনি নিয়ে সাহিত্যিক মহলে বহু ধরনের কাব্য রচিত হয়। ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে কবিমানসে এসেছে সার্বজনীনতার ছাপ যা আমাদের সংস্কৃতিকে এককভাবে কোথাও আঁটকে রাখেনি। এই কাব্যেও সেই ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিন্দু কবির মানসিকতায় এসেছে আল্লাহ, নবি সম্পর্কিত ভাবনা, এখানেই এই কেছার স্বার্থকতা।

ষোড়শ শতাব্দী থেকেই কিসসা বা কেছা কাহিনির গল্প লিখিত হয়েছে। কবি মোহাম্মদ কবীর ‘মধুমালতী’, (১৫৮৮ খ্রিঃ) নামে কেছা লিখেছেন। এই মধুমালতী’র কাহিনি নিয়েই অনেক কবি বাংলায় কাব্য রচনা করেছেন। কবি চুহর (চট্টগ্রামের বাঁশখালী গ্রামের নিবাসী), কাব্যনাম- ‘মধুমালতী’। উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট সরকারের অন্তর্গত রিকাহতপুর গ্রামের বাসিন্দা কবি শাকের মামুদ লিখেছেন ‘মধুমালতী’। কবি গোপীদাস (চট্টগ্রামের পোপদিয়া গ্রামের বাসিন্দা), কাব্যনাম- ‘মধুমালতী’। জোবেদ আলী লিখেছেন ‘রাজকন্যা মধুমালতী’ এছাড়া নূর মুহাম্মদ লিখেছেন ‘মদনকুমার মধুমালী’। পরবর্তীতে সপ্তদশ শতাব্দীতে আব্দুন নবী এক ৮০ পর্বের কেছা কাব্য রচনা করেন, কাব্যের নাম ‘আমীর হামজার কিছা’। অষ্টাদশ

শতাব্দীতে মুহাম্মদ খাতের কেছা রচনার ধারাকে বহন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রওশান আলী কেছা রচনার পর্ব শুরু করেন। এছাড়া শাহ আবদুল করিম রচিত ‘জঙ্গলে মঙ্গল গাজি কালু ও চম্পাবতীর কিছা’ পাওয়া যায়।<sup>৩০</sup>

মুসলমান সাহিত্যিকদের দ্বারা যে কেছা কাহিনিগুলি লিখিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট শুধুমাত্র কেছার গল্প রোমান্টিকতার জায়গায় থেমে থাকেনি, সমাজের পীর বা ফকিরদের নিয়ে অজস্র কেছা রচিত হয়েছে। কেছায় পীরদের মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের মিলনের দিকটি বেশ প্রকট হয়েছে। পাশাপাশি মুসলমান সমাজে পীরের ভক্তি কতটা সেই দিকটিও উঠে এসেছে। ফলে সংস্কৃতির আলোচনায় এই কাব্যগুলি নানারকম প্রেক্ষিত নির্মাণের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

## তথ্যসূত্র ও টীকা

১. আনিসুজ্জামান বলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশি শব্দবহুল কাব্যরচনার একটা ধারা মুসলমানদের মধ্যে গড়ে ওঠে, যা সাধারণত ‘মুসলমানি বাংলা কাব্য’ নামে পরিচিত।

সূত্র: আনিসুজ্জামান, ‘মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)’, ঢাকা, চারুলিপি, ফেব্রুয়ারি ২০১২। পৃ.২৯

২. তরফদার. মমতাজুর রহমান, ‘বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি’, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯। পৃ.২৭

৩. তদেব। পৃ.১১

৪. তদেব। পৃ.৩২

৫. Sen. Sukumar, ‘History of Bengali Literature’, New Delhi, Sahitya Akademy, 1960. P.150

৬. Majumdar. R. C, ‘History of Mediaeval Bengal’, Calcutta, G. Bharadwaj & co. 1973. P.253

৭. আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)', ঢাকা, চারুলিপি, ফেব্রুয়ারি ২০১২। পৃ.১১৮
৮. প্রাচীন সমাজে সর্বত্রই দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। আরবদেশে দাসপ্রথা ব্যাপকভাবে ছিল, দাস-দাসী বা গোলামদের হাতে বাজারে বিক্রি করা হত।  
সূত্র: করিম. আবদুল, 'ইসলামের ইতিহাস পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন (প্রাচীন সভ্যতা থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২০। পৃ.১৭
৯. ওফাত আরবি শব্দ 'ওয়াফাত' থেকে এসেছে। অর্থ মৃত্যু বা শহীদ হওয়া।  
সূত্র: রশিদ. মোহাম্মদ হারুন (সম্পাদনা ও সংকলন), 'বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, মে ২০১৫। পৃ.৩১
১০. গনী. ওসমান, 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি', কলকাতা, রত্নাবলী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯। পৃ.১৫৩
১১. দাস. গিরীন্দ্রনাথ, 'বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা', বারাসাত, শেহিদ লাইব্রেরী, এপ্রিল ১৯৭৬। পৃ.৪৫০
১২. Banerjee. Sumanta, 'The Parlour and the Streets Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta', Calcutta, Seagull Books, 1998. . P.117
১৩. শিরনির আভিধানিক অর্থ মিষ্টান্ন, মিষ্টবস্তু দ্বারা কিছু প্রস্তুত করে মাজারে এনে দিতে হয় পীরের উদ্দেশ্যে। সেবাইত এই শিরনি ফাতেহাসুরা, কুলহো এবং দরুদ পাঠের মধ্য দিয়ে পীরকে অর্পণ করেন।  
সূত্র: আহমদ. তসলীমুদ্দীন, 'পীর, সত্যপীর, পীরবরহক', 'রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী (সম্পা.), নবম ভাগ, কলিকাতা, বিশ্বকোষপ্রেস মুদ্রিত, ১৩২১। পৃ.৩৬
১৪. ব্রহ্ম. তৃপ্তি, 'লোকজীবনে বাংলার লৌকিক ধর্মসঙ্গীত ও ধর্মীয়মেলা', কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. এম (প্রাঃ লিঃ), ১৩৯২। পৃ.২৪৮-২৪৯

১৫. রচনাকাল সম্পর্কে জানা যায়- “কুতপুরে বাস করি প্রাকাশিলা গান।।

সন ১২ শত ৫ সালে গান আলাপন।”

সূত্র: মোহাম্মদ যাকারিয়া. আবুল কালাম (সম্পা.), ‘বাঙলা সাহিত্যে গায়ী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান’, কলকাতা, সারস্বতকুঞ্জ, ১৯৯২। পৃ.১৫৩

১৬. রচনাকাল সম্পর্কে জানা যায়- “কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।

বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র সকের বৎসর।।”

সূত্র: ভট্টাচার্য. শ্রীসত্যনারায়ণ (সম্পা.), ‘কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী’, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮। পৃ.১৬৮

১৭. Banerjee. Sumanta, ‘The Parlour and the Streets Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta’, Calcutta, Seagull Books, 1998. P.117

১৮. Karim. Munshi Abdul & Ahmad Sharif, ‘A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts’, Dacca: The Asiatic Society of Pakistan, 1960. P.543

১৯. দাস. গিরীন্দ্রনাথ, ‘বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা’, বারাসাত, শেহিদ লাইব্রেরী, এপ্রিল ১৯৭৬। পৃ.৪১৭

২০. Banerjee. Sumanta, ‘The Parlour and the Streets Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta’, Calcutta, Seagull Books, 1998. . P.71

২১. শ্রীমন্নর্ষি. কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস, ‘স্কন্দ পুরাণম্ (সপ্তখন্ডাত্মকম্), শ্রীযুক্ত পঞ্চগনন তর্করত্ন (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন প্রেস, ১৩১৮। পৃ.৩৬৭০

২২. আনিসুজ্জামান, ‘মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)’, ঢাকা, চারুলিপি, ফেব্রুয়ারি ২০১২। পৃ.১৩৬ -১৩৮

২৩. ঘোষাল. চন্ডিকাপ্রসাদ, ‘বটতলার ‘গুপ্তকথা’: কেছার ভাঁড়ার না অন্তপুরের আরশি’, ‘বাঙালির বটতলা (প্রথম খণ্ড)’, অদ্রিশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য (সম্পা.), কলকাতা, অনুষ্ঠান, জানুয়ারি ২০১৩। পৃ.৪২

২৪. আনিসুজ্জামান, ‘মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)’, ঢাকা, চারুলিপি, ফেব্রুয়ারি ২০১২। পৃ.১৩৮
২৫. আঠারো ভাটি’র দেশে ভাঙ্গর শাহকে সকলে মান্য করত। বনবিবির আগমনের পূর্বে ভাঙ্গর শাহর আবির্ভাব ঘটেছিল।  
সূত্র: দাস. শশাঙ্কশেখর, ‘বনবিবি’, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র’, মার্চ ২০০৪। পৃ.৫৮
২৬. সেন. সুকুমার, ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৩। পৃ.৮২
২৭. সুজিতকুমার মণ্ডল এই কাব্য সম্পর্কে বলেন- “বোন বিবি জহুরা নামা প্রণয়পালা না হলেও পরবর্তীকালের রচিত ইসলামি পুথি হিসেবে ‘কেছা’ নামে বিবেচিত।”  
সূত্র: মণ্ডল. সুজিতকুমার (সম্পা.), ‘বনবিবির পালা’, কলকাতা, গাঙচিল, ২০১০। পৃ.৩৩
২৮. ক্ষেমানন্দ. কেতকাদাস, ‘মনসামঙ্গল’, ভট্টাচার্য শ্রীবিজনবিহারী (সংকলন ও সম্পাদনা), নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৫। পৃ.২৮
২৯. চক্রবর্তী. বরণকুমার, ‘গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য’, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৩। পৃ.১৪২
৩০. সেন. সুকুমার, ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৩। পৃ.১১২
৩১. ভট্টাচার্য. সম্পদ কুমার, ‘সত্যপীরের নতুন কাহিনি: আজদ্যার কেছা’, ‘অনুষ্টিপ’ (বিশেষ বাংলা পুঁথি সংখ্যা, প্রাক্ শারদীয়), অনিল আচার্য (সম্পা.), ৪৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা, ১৪২২। পৃ.৪২১
৩২. বিস্তারিত জানতে দেখুন- <https://www.google.com/amp/s/www.ntvbd.com/arts-and-literature/14986/%25E0%25A6%2595%25E0%25A7%2580-%25E0%25A6%2595%25E0%25A7%2587%25E0%25A6%259A%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%259B%25E0%25A6%25BE%3famp> (10/11/2022)
৩৩. হক. মৃদুল ও সঞ্জিতা দত্ত (সম্পা.), ‘পড়শি’, শাহ আবদুল করিম সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, শীত ১৪২৮(২০২১)। পৃ.২১৭

## চতুর্থ অধ্যায়

### দৈনন্দিন জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির নানাদিক (নির্বাচিত সাহিত্য)

“No land on earth has such a long cultural continuity as India.”<sup>১</sup>

যেকোনও সাহিত্যই সময়ের ধারায় বহমান। সমাজের চিত্র, তার প্রথা বিবর্তনের রূপ সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। সামাজিক টানাপোড়নের মধ্যেই সংস্কৃতির সৃষ্টি। সংস্কৃতি কালপরম্পরায় বহমান, ক্রমপরিবর্তনশীল। আমরা বলতে পারি, একটি জাতির বা একটি দেশের সমগ্র জীবনচর্যার পরিচয় পাওয়া যায় তার সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত, এর নির্দিষ্টরূপ সেইভাবে বলা সম্ভব নয়। যা আমাদের সংস্কার সাধন করে তাই সংস্কৃতি। সংস্কার সাধন বলতে বোঝায় যা মনকে উন্মুক্ত করে চিন্তাকে উন্নত করে। ‘সংস্কৃতি’র অর্থ শুধুমাত্র সংস্কারের পুনরাবর্তন নয়, সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তনকেও বোঝায়। আর এই বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষ ক্রমশই এগিয়ে চলেছে।<sup>২</sup>

সংস্কৃতি’র প্রতিশব্দ হিসেবে ইংরেজি ‘Culture’ কথাটি পাওয়া যায়। ‘কালচার’ (Culture) এই শব্দটির মূলে আছে লাতীনের ‘কুলতুরা’ (Cultura) শব্দ; এই শব্দ লাতীনের ‘কোল’ (Col) ধাতু থেকে এসেছে, ‘কোল’ অর্থে ‘কৃষি বা চাষ করা’ এছাড়া ‘যত্ন করা’ বা ‘পূজা করা’ও বোঝায়। অন্যদিকে ‘Culture’ এর অনুরূপ প্রতিশব্দ ‘উৎকর্ষসাধন’ একথাও বলা যেতে পারে।<sup>৩</sup> বিনোদ কে গৌর (Vinod K. Gour) সংস্কৃতি’র সংজ্ঞায় বলেছেন- “The word culture rooted in the latin cultura, meaning “to cultivate”, was for long, meant to signify the product of social cultivation: the progressive refinement of human behavior.”<sup>৪</sup> বৈদিক সাহিত্যেও ‘সংস্কৃতি’ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় ‘আত্মসংস্কৃতির্বাণ শিল্পানি’। ইংরেজিতে যাকে বলা যেতে পারে- ‘Arts indeed are the culture of the soul’.<sup>৫</sup> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায় এবং যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি



প্রমুখ ব্যক্তির এই Culture বা সংস্কৃতি নিয়ে নিজেদের মতামত পোষণ করেছেন। তাঁদের সেই মতের সঙ্গে অনেকেই মত গ্রহণ করেছেন অন্যথায় কেউ কেউ অন্য মত মেনেছেন। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত রুচি এবং নিজস্ব মতামতের জায়গা থেকে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেন। শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কথার সারবস্তু একই থেকেছে।<sup>১৬</sup> কিন্তু গোপাল হালদার ‘কালচার’ ও ‘রিলিজিয়ন’ এই দু’টিকে পৃথকভাবে ভেবেছেন।<sup>১৭</sup>

সংস্কৃতির ধারণা শুধুমাত্র একটি পরিসরেই বদ্ধ নয়। একটি জাতির বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বা তাদের নিজ নিজ সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি সত্ত্বেও তারা কিছু বিস্তৃত সামাজিক প্রবণতা এবং শৈল্পিক রূপ প্রকাশ করে যা একে অপরকে আলাদা করে। এক্ষেত্রে নিজস্ব শৈলীর দিকটি বেশ প্রকট হয়ে ওঠে।<sup>১৮</sup> ভারতবর্ষে বহু জাতির বসবাসের মধ্যেও মূলত তিন ধরনের সংস্কৃতির চিত্র সামনে উঠে আসে। প্রাচীন যুগের বৈদিক সংস্কৃতির পাশাপাশি মধ্যযুগে ইসলামি সংস্কৃতিকে আমরা পাই।<sup>১৯</sup> ভারতবর্ষে ইসলাম শক্তির অভ্যুত্থানে নতুন সংস্কৃতির ধারণা সর্বক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে এবং ইসলামীয় সংস্কৃতি এক নতুন সংস্কৃতির ইতিহাস তৈরি করে ভারতবর্ষের মাটিতে।<sup>২০</sup> ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম দুই জাতির বহুযুগ ধরে পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে গোটা ভারতবর্ষসহ বাংলার সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসে। বঙ্গদেশের সংস্কৃতির মধ্যে এক মিশ্র প্রভাব লক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন-

“A view is being deliberately propagated by the Hindu (non-Muslim) political leaders from the beginning of the present century, that as a result of the admixture of the Hindu and Muslim cultures in the middle age both lost their separate entities giving rise to a new culture which is neither Hindu nor Muslim but Indian.”<sup>২১</sup>

‘সংস্কৃতি’ এই শব্দটির মধ্যেই একটি জাতির ভাবসাধনা ও জীবনচর্যার সমগ্র পরিচয় উঠে আসে। এর মধ্যেই ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজ-বোধ ও জীবনদর্শনের সমস্তটাই নিহিত থাকে।<sup>২২</sup> ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায়, মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি যখন বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তখন রাজধানী দিল্লির সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ ঘটাতে জৌনপুর এগিয়ে আসে। কিন্তু জৌনপুরের

অবক্ষয়ের পর দিল্লির কর্তৃত্ব বাংলার উপর প্রবল আকার ধারণ করেছিল। ফলে বাংলার সঙ্গে উত্তর ভারতের এক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। অন্যদিকে আরব দেশের সঙ্গে পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যোগাযোগ বহুকালের। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের কথা জানতে পারি। চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে আরব দেশ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। আরব বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে এক মুসলমান উপনিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিল। যার ফলস্বরূপ দেশীয় সংস্কৃতি অবক্ষয়ের মুখে পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পূর্ব বাংলার অঞ্চলগুলির সঙ্গে মুসলিম শাসনের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। এই শতাব্দীতে চেঙ্গিস খানের মধ্য এশিয়া আক্রমণের পর সেখানকার শিক্ষিত মুসলমানগণ ভারতে এসে আশ্রয় নেয়। মুসলিম অভিযানের ফলে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটেছিল এবং তারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে বসতি গড়ে তোলে। এরই মধ্যে বাংলায় সুফি প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে এক বিশ্বাস গড়ে তুলতে শুরু করে। এই মুসলমান প্রতিপত্তির কালে একদিকে বৌদ্ধধর্মের পতন এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থান দেখা দেয়। ফলে আঞ্চলিক উপজাতির কিছু অংশ হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারেনি, তারা সুফিভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাংলার সংস্কৃতিতে এক নবযুগের সূচনা দেখা দেয়, সুফিদের জীবন-দর্শন, রীতি-নীতি সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সবমিলিয়ে বাংলায় তথা গোটা ভারতে এক মিশ্রভাবধারার উন্মেষ ঘটেছিল।

সুনীতিকুমার এর কথায়-

“The people and culture of India form a component, a mixture of at least four distinct types of humanity, which may loosely be called ‘race’.”<sup>৩০</sup>

উত্তরবাংলার বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব সমস্ত মানুষের জীবনে বজায় ছিল। সুতরাং, হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত এক মিশ্র সংস্কৃতির ধারা যে বাংলায় বিদ্যমান ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বঙ্গদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে অন্যান্য সংস্কৃতির পাশাপাশি মুসলিম সংস্কৃতি সমাজে জায়গা করে নেয় এবং এই সময়ের সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনাকর্মে সেই সংস্কৃতির বেশ প্রয়োগ ঘটান। ভারতীয় সংস্কৃতির একটি ধারা বলা যেতে পারে

এই ‘মুসলিম সংস্কৃতি’কে। মুসলমানরা এই সংস্কৃতি প্রসঙ্গে অনেকেই অনেক মত পোষণ করেছেন। গোপাল হালদার, আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামান, আবদুল করিম প্রমুখরা মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি নিয়ে নানা বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আব্দুল লতিফ (Abdul Latif) বলেন মুসলিম সংস্কৃতি’র যে বিষয়বস্তু তা খুব বিস্তৃত। ইতিহাসের ধারায় মুসলমানদের মন কর্ম, চিন্তা, ও সৃষ্টির পাশাপাশি সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও নিজেকে প্রকাশ করেছে। মুসলিমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের একটি চিহ্ন তৈরি করেছেন। সংস্কৃতি’র সমগ্র অঙ্গকে একত্রিত করে রেখেছে নিজেদের পরিচর্যার মধ্যে দিয়ে। তাঁদের রীতি-নীতি, জীবনযাপনকে এর আওতাভুক্ত করেছেন, যার সবকিছুই নাকি ‘কোরান’কেন্দ্রিক।<sup>৪</sup>

ধ্রুপদি সংস্কৃতির ধারায় সাহিত্যকে বিচার বিশ্লেষণের দিকটি যেমন উঠে আসে ঠিক সেইভাবেই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভিতর দিয়েও আর একটি সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। যে সংস্কৃতি আসলে মাটির কাছাকাছি মানুষের লোককেন্দ্রিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে এবং আমাদের এই গবেষণায় আমরা সেই ধ্রুপদি সংস্কৃতির পাশাপাশি মানুষের আচার-ব্যবহার, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছি এবং তারই পরিচয় এখানে দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার ভিতর দিয়েই মুসলমান সাহিত্যিকদের কবিত্বশক্তির পরিচয় যেমন পাব তেমনই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব ধরনের সংস্কৃতির (culture) একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। সমাজকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতির অর্থ পরিস্ফুট করা সহজ নয়, সামাজিক কর্মতৎপরতা এবং আচার-আচরণ এর মধ্যে থেকেই সংস্কৃতি’র প্রসঙ্গ উঠে আসে। আমরা এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে সমাজ কেন্দ্রীভূত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে কিভাবে সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রসঙ্গ এসেছে নির্বাচিত সাহিত্যের আলোচনায় দেখে নেব।

## ক. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও সংস্কৃতি

### লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না: সংস্কৃতির নানাদিক

দৌলত কাজি তাঁর ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’ কাব্যে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন।

**বন্দনা:** কাব্যটি প্রথমেই শুরু হয়েছে ‘বন্দনা’ অংশ দিয়ে। ‘বিসমিল্লা অর্ রহমান রহিম আল্লাহ্ করিম’ অর্থাৎ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ, দয়াময় আল্লাহর নাম স্মরণ করেছেন। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তি শুভকাজ আরম্ভ করেন এইভাবে আল্লাহকে স্মরণ করে, যা দৌলত কাজির ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। ‘বন্দনা’ অংশে হিন্দু প্রসঙ্গ নেই, ইসলাম ধর্মের গৌরবময় দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

মুসলমানী মূল বাতি            যার তেজে জ্বলে নিতি  
না নিবায়ে বায়ু বৃষ্টি জলে। (পৃ.২)

**রাজসভার বর্ণনা:** রোসাঙ্গ রাজসভার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে দৌলত কাজি রাজা সুধর্মার কথা এবং রাজ্যের অন্য লোকজনদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। এই রাজসভায় ভিন্ন ভিন্ন লোকেদের আসা যাওয়া ছিল, সভার স্থানটিও বেশ অন্যরকমভাবে সুসজ্জিত ছিল।

মউর গঠন যেন সভার আকৃতি।।  
অপূর্ব নৃপতি সভা বিনোদের স্থল।  
অমাত্য সহিত রাজা করে কুতূহল।।  
যাহার যেমত যুক্ত শিবির রচিয়া। (পৃ.৮)

রোসাঙ্গ রাজসভা শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য রচনার অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানে বসেই মুসলমান সাহিত্যিকদের অনেকেই সাহিত্য রচনা করেছেন।

**বারাঙ্গনা প্রসঙ্গ:** বারাঙ্গনা নারী সহযোগে রাজদরবারে নৃত্য-গীত অনুষ্ঠান চলত এখানে সেই চিত্র ফুটে উঠেছে।

গীতে নৃত্যে বারাঙ্গনা সুশীতল রব।।  
শুনিতে প্রত্যেক মনে জাগে মনোভাব।। (পৃ.৮)

নারীর বসন-অলঙ্কার-প্রসাধনী: নারীর ব্যবহৃত অলঙ্কার, বসন, প্রসাধনী এগুলি সংস্কৃতির মধ্যেই পড়ে। নারীদের আলাদা ভাবে কোন ধর্মের কোনে ঠেসে রাখেননি। ময়নাবতী, চন্দ্রাণী ও সখীদের যে পরিচয় পাই তাতে হিন্দু নারীরা যেভাবে নিজেদের সাজিয়ে তোলে এদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সিঁদুর লেপনে তাঁরা নিজেদের রাঙিয়ে তুলেছে।

ঘনচয় রুচিকেশ সিঁদুরে শোভন। (পৃ.১২)

সিঁদুর বিবাহিত হিন্দু নারীর চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত এক ধরনের প্রসাধন দ্রব্য। ময়না ও লোরকের দাম্পত্য জীবনের শুভ চিহ্ন হিসাবে এই প্রসাধন ময়না ব্যবহার করেছে। এখানে হিন্দু প্রভাবের স্পষ্ট নিদর্শন মেলে। ময়নাবতীর সারা দেহ চন্দনের প্রলেপ দিয়ে আবৃত। ময়নাবতী অলঙ্কার হিসেবে কর্ণপুর (এক ধরনের কানের অলঙ্কার), গলায় মনিহার ইত্যাদি ব্যবহার করেছে। অপরদিকে চন্দ্রাণীর সাজ-সজ্জায় ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী (কস্তুরী, চন্দন)। নূপুর, কেয়ূর, হার, কিঙ্কিণী, কঙ্কন। ‘অন্তস্পট’ নারীর ব্যবহৃত এক ধরনের আবরণ, যা চন্দ্রাণী ব্যবহার করেছে নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য।

পাটাম্বর শাড়ি, মোহন শাড়ি এগুলি নারীদের ব্যবহৃত এক ধরনের বসন। শীতকালের আবরণ হিসাবে সেই সময়ের নারীরা উয়ারি ব্যবহার করত। কোঁচা দিয়ে শাড়ি পড়া বাঙালি মেয়েদের শাড়ি পড়ার মতো নয়। রাজস্থানী, দক্ষিণভারতী প্রথা উঠে এসেছে কবির বর্ণনায়।

বিবিধ সুগন্ধি সব করিয়া ভূষিত।

কান্তাই পাটের ধটি কটি বিরাজিত।।

সুবিচিত্র পাটাম্বর কোঁচা পরিধান।

অঙ্গে অঙ্গরাগ শোভে কেয়ূর কঙ্কণ।।

বান্ধিয়া লোটন চূড়া কুসুম্ভে রচিয়া। (পৃ.১৩২-১৩৩)

সাধনের ‘মৈনাসৎ’ অংশে ময়না মালিনীকে ব্যবহৃত বসন ও প্রসাধন উপহার দেয়।

কুঙ্কুম কেসর উবটন দাঙ্গি।।

সুরঁগ চুনরী আনি পহরাঙ্গি। (মেনাসৎ চৌপাঙ্গি ৯, পৃ.১৫২)

অন্যদিকে লালনের ফিরে আসার কথা শুনে ময়না সাজগোজ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সজি সিনগার মন ভয়ৌ অনংদা। (মেনাসৎ চৌপাঙ্গি ৩৭, পৃ.১৮১)

**বারমাসী বর্ণনা:** বারমাসী বর্ণনা অংশে ফাল্গুন মাসে নারীরা যেভাবে সেজে উঠেছে তাও বেশ অন্যরকম। ফাল্গুনে বসন্তরাজ ঋতু যেমন প্রকৃতিকে নানা রঙে ভরিয়ে দেয়, নারীরাও পুরুষের প্রেম পেতে তেমনি নিজেদের রাঙিয়ে তুলেছে।

লাল কুসুম্ব রেণু                      লাল সিন্দুর জন্  
লাল বসন তনু সাজে। (পৃ.১৩৪)

**পুরুষের পোশাক:** আশরফ খান রাজসভায় উজীর পদে আসীন হবার সময় নানা পরিধানে নিজেকে সাজিয়ে তোলে।

স্বর্ণ অঙ্গরাগ দিল রত্নময় টুপি।।  
দশ হস্তী প্রধান দিলেক বহু ঘোড়া।  
রাজ খড়্গ সমে দিলে লক্ষের কাপড়া।। (পৃ.৬)

রাজসেনারা বিচিত্র ভূষণ ব্যবহার করে-

বনে ভ্রমে রাজসেনা বিচিএভূষণ।  
বিকচ কুসুম্ব তরু যেন শোভে বন।। (পৃ.৯)

লোরক রাজ্য ছেড়ে বনে যাত্রাকালে নিজেকে নানাভাবে সজ্জিত করে এবং সারা দেহে কস্তুরি চন্দন এর লেপন দেয়।

অঙ্গ পরিমল                      সুগন্ধী শীতল  
সধগরে বায়ু যোজনা।।  
বিবিধ বরণ                      কস্তুরী চন্দন  
মুদিত লুলিত সেনা। (পৃ.১৪)

চন্দ্রাণীর দর্শন পেতে বছরে দুবার মোহরা নগরের সমস্ত রাজারা নিজেদের  
সাধ্যমতো পরিপাটি হয়ে রাজসভায় উপস্থিত হত।

যাহার যেমত যোগ্য সাজিল বিশেষ।

নানারঙ্গে অঙ্গরাগ পরিধান বেশ।। (পৃ.৪৬)

**বিনোদন:** সংস্কৃতির একটি বড় অঙ্গ বিনোদন। রোসাঙ্গের রাজা ও অমাত্যজনেরা কতটা  
আমোদপ্রমোদে দিন কাটাতেন তা জানতে পারি। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, নাচ, গান, এবং  
বারাঙ্গনা নারীদের নিয়ে তারা মেতে থাকত।

আপূর্ব নৃপতি সভা বিনোদের স্থল।

অমাত্য সহিত রাজা করে কুতূহল।।

যাহার যেমত যুক্ত শিবির রচিয়া।

তথাত রহিলা সৈন্য আনন্দ করিয়া।। (পৃ.৮)

এই সভায় বিভিন্ন ভাষার চর্চাও হত ফারসি, হিন্দি, সংস্কৃত, বাংলা এছাড়াও  
গুজরাটি, ঠেট, গোহারী অঞ্চলের ভাষা।

গুজরাতি গোহারী ঠেট ভাষা বহুতর।

সহজে মোহন্ত সভা আনন্দ সাযর।। (পৃ.১০)

চন্দ্রাণী ও বামন বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ। বামন অন্তপুরীতে প্রবেশ করলে  
চারিদিক নাচ, গান, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে উল্লাসে মুখরিত হয়ে ওঠে।

কেহ নাচে কেহ গাহে শীতল সুস্বরে।।

করতালে কত তাল তরল বংশীনাৎ।

উপাঙ্গ মৃদঙ্গ করে রঙ্গে রসবাদ।। (পৃ.২৭)

চন্দ্রাণীর বিবাহজীবন এর শুভ কামনায় রাজা মোহরা যে আয়োজন করেন তার  
মধ্য দিয়ে এক হিন্দু-বিবাহ অনুষ্ঠানের চিএ উঠে আসে।

কন্যা জামাতাকে রাজা একত্রে দেখিয়া।

করিল বহুল দান দোহান নিছিয়া।।

মোহরা নৃপতি করে মঙ্গল বিধান।

পুরোহিত পড়ে পাঠ আনন্দ কল্যাণ।।

সসৈন্য সামন্ত রাজা করে মহোৎসব।

ব্যাল্লিস বাজনা বাজে শব্দ মনোভাব।। (পৃ.২৮)

এছাড়া বাঙালির নানা বিনোদনের মধ্যে তাস, পাশা, ইড়কি, চৌগা, ইধুলি প্রভৃতি খেলার প্রচলন ছিল। রূপরামের ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যে পাশা খেলার উল্লেখ আছে। আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে চৌগা খেলার কথা আছে। দৌলত কাজির ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’ কাব্যে পাশা খেলার উল্লেখ এসেছে।

নিত্য সভা করি খেলে পাশা সারি

লইয়া পাত্র সমাজ। (পৃ.১৫)

**নিমন্ত্রণ পদ্ধতি:** চন্দ্রাণীর দর্শন পেতে বছরে দুবার মোহরা নগরে রাজ্যের সমস্ত রাজাদের উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানানোর রেওয়াজ ছিল।

যত জ্ঞাতি রাজা সবি মোহরা নগরে।

বার্তিল তাম্বুল দিয়া প্রতি ঘরে ঘরে।। (পৃ.৫১)

তাম্বুল অর্থাৎ পান দিয়ে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপার ছিল। দক্ষিণভারত, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি জায়গায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে আতিথেয়তার ক্ষেত্রে পান-সুপুরি দিয়ে নিমন্ত্রণ করার প্রথা ছিল। আবার এদেশেও এই প্রথার চল লক্ষ্য করার মতো। আবার অন্য ভাবে বলা যায় এই সময়ে ভারতবর্ষে পান, সুপুরি এগুলির চাষ হতো। এই কারণেও হয়তো আমন্ত্রণ রীতিতে এই পানের চলনই বেশি ছিল।

**ধাত্রীবিদ্যার প্রসঙ্গ:** বুদ্ধিশিখা (ধাই) চন্দ্রাণীর জীবনে মা এর মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকেছে। ধাই এর সহযোগিতায় লোরকে নিজের করে পেয়েছে চন্দ্রাণী। সন্তানের জন্মের সময় ধাই এর ভূমিকা থাকে, গ্রামবাংলার চিত্র ধরা পড়েছে এই বর্ণনায়।

প্রথমে জন্মিলা যবে এই মহীতলে।

নাভিচ্ছেদ করিলুঁ তোমার কুতুহলে।।

কোলে করি যত্নে ধরি দিলু স্তনপান।

মোর হৃদে শয্যা তোর মলমূত্রস্থান।। (পৃ.৪৯)



শয্যাচিত্র বর্ণনা: ‘লোর ও চন্দ্রাণীর মিলন’ অংশে নারীদের খাটে শুয়ে থাকার চিত্র ফুটে উঠেছে। আসলে সমাজকে বাদ দিয়ে কোন সাহিত্যই রচিত হতে পারে না, সামাজিক ব্যাপারগুলিই সংস্কৃতির এক একটি দিক। চন্দ্রাণী ও তার তিনজন সখী অন্তঃপুরে নিজেদের মতো সুন্দরভাবে খাট সাজিয়েছে। খাটের বিছানা বিভিন্ন সুগন্ধি যেমন কস্তুরী, চন্দন এর আবেশে ভরপুর। খাটগুলিতে চান্দোয়া লাগানো, যা মুক্তা প্রবালে তৈরি।

এক রূপে চারি শয্যা রচিল কুমারী।

সুবর্ণ বেষ্টিত চারি খাট মনোহারী।। (পৃ.৬৫)

উৎসব: সমস্ত মানুষ নিজের আনন্দ উপভোগের জন্য উৎসবে মেতে ওঠে। জীবনের নানা দিকের মধ্যে এটি একটি দিক। মধ্যযুগের বাংলায় উৎসব উপলক্ষে পুতুলনাচের ব্যাপক চল ছিল। এই সময়ে হিন্দু মুসলিম প্রত্যেকেই নানা অনুষ্ঠানে নিয়োজিত থেকেছে।

‘সতীময়না’তে বসন্ত উৎসবের চিত্র দেখা যায়। ফাল্গুন মাসে দোল উৎসবে সমস্ত নারীরা নিজেদের সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তুলেছে। তারা প্রকৃতির রঙে সেজে উঠেছে, নারীরা এই উৎসবে নিজেদের জীবনকে নতুন করে তুলেছে নিজের প্রিয়তম মানুষটি অর্থাৎ পতির সঙ্গে মিলিত হয়ে।

খেলায় নাচয় ফাগুরঙ্গ দশ দিশে।

মৃত্তিকা প্রতিমা কেহ দোলায় হরিষে।।

পতিসঙ্গে রসপুরে সকল কামিনী।। (পৃ.১৩৩)

মিয়া সাধনের কাব্যেও হোলি উৎসবের কথা জানা যায়।

তে ফাগুন নিত খেলিঁ হোরী।। (মৈনাসৎ চৌপাঙ্গ ২৭, পৃ.১৭১)

এছাড়াও কার্তিক মাসে দেওয়ালি পরব এর কথা জানা যাচ্ছে।

পরব দেওয়ালি উত্তম রাতি

খেলয় মঙ্গল ছত্রিশ জাতি। (পৃ.১২২)

সাধনের ‘মৈনাসৎ’ কাব্যেও এই পরবের কথা জানা যায়-

কাতিগ মাস এহ পর্ব দিবারী।

বিরহন ভঙ্গ সুরসৈহারী।। (মৈনাসৎ চৌপাঙ্গ ১৯, পৃ.১৬৩)

‘মৈনাসৎ’ অংশে ভাদ্রমাসে তীজ উৎসব এর কথা জানা যায়। মনের আনন্দে সবাই মেতে উঠেছে।

সুখ সৌঁ গাবত নীসরী তীজ বড়ো তিবহার।। (মৈনাসৎ চৌপাঙ্গ ১৪, পৃ.১৫৮)

যুদ্ধ প্রসঙ্গ: কোনও রাজ্য জয়ের যুদ্ধ নয়, এক নারীকে পেতে এই যুদ্ধ। চন্দ্রাণীকে ঘিরে লোরক ও বামন দুজন পুরুষই যুদ্ধ করেছে রথে চড়ে, এবং অস্ত্র হিসাবে তারা শর, খর্ববাণ ব্যবহার করেছে। খর্ববাণের আঘাতে বামন নিহত হয়। এক গভীরতম ইঙ্গিতকে তুলে ধরতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা। বামন নপুংসক তাই সে চন্দ্রাণীকে পায়নি। চন্দ্রাণী সৌন্দর্য, লোরক রসিক বা প্রেমিক অন্যদিকে ময়না কামনার প্রতীক। এই যুদ্ধ যেন কামনার জাল থেকে মুক্তি পেয়েছে সৌন্দর্যকে পাওয়ার জন্য।

মুখামুখী দুই রথী                      যেন দুই মত্ত হাতী  
দস্তে দস্তে যেন পেষাপেষি। (পৃ.৭৭)

দৌলত কাজি রচিত ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’ কাব্যে এককভাবে কোন সংস্কৃতি’র নির্দশন নেই। কাব্যে বিভিন্ন সংস্কৃতি’র মেলবন্ধন ঘটেছে। শুরুতেই মুসলমান রীতি-নীতিকে মাথায় রেখে কাব্যরচনা করলেও একেবারে খাঁটি ইসলামি বৃত্তান্তকে কাব্যে গুঁথে দেননি। বন্দনা অংশে মুসলমান সমাজে নবির আধিপত্য, পবিত্র কোরান, বিভিন্ন দেবদূত যেমন- ইস্রাফিল, জিব্রাইল এর উল্লেখ, শরিয়ত ধর্মশাস্ত্রের কথা বলেছেন। ‘রাজস্বতি’ অংশের প্রথমেই লিখেছেন-

রসুলের পদযুগ মস্তকেত ধরি।

পীর গুরুজন পিতৃমাতৃ নমস্কারি।। (পৃ.৪)

এখানে রসুল বলতে মোহাম্মদ এর কথা বলেছেন, যিনি ইসলাম সমাজের শ্রেষ্ঠ নবি। তারপর পীর ও গুরুর উল্লেখ, হিন্দু সমাজে গুরুরা শিষ্যের দ্বারা পূজিত হন, তেমনই অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান সমাজেও পীরেরা পূজিত হতেন। পরবর্তীতে এই পীরের প্রতি হিন্দুদের মনেও ভক্তি জন্মায়, ফলে পীরকে ঘিরে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যতার সূত্র তৈরি হয়। এই পীর, গুরু, পিতামাতা সবার প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন করেছেন। সাধারণত মুসলমান সমাজের লোকজন নমস্কার করেন না, এটা হিন্দুরা করে

থাকেন। মুসলমানেরা একে অপরকে সালাম বিনিময় করে থাকেন। ‘আস-সালামু আলাইকুম’ ও ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম’ এই দুটি কথা বলে থাকেন। এছাড়া রোসাঙ্গ রাজসভায় বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন দেশের লোকজনের যাতায়াত ছিল, ফলে তাদের মধ্যেও সংস্কৃতির লেনদেন তৈরি হয়েছে।

সৈয়দ কাজি শেখ মোল্লা আলীম ফকির।  
পূজেন্ত সে সব যেন আপনা শরীর।।  
বিদেশী আরবী রুমী মোগল পাঠান।  
পালন্ত সে সব লোক শরীর সমান।।  
শ্যামতনু যুক্তিবন্ত বচন মিষ্টতা।  
শুদ্ধমতি ছোটবড় লোকেত ইষ্টতা।।  
দেশান্তরী প্রবাসী পস্থিক বণিজার।  
দেশে কীর্তি যশ ঘোষে জানয় সংগসার।।  
উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ।  
আচি কুচি মাটীন পাটনা নানা দেশ।। (পৃ.৯)

হিন্দু সমাজ চার শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল যথা- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। হিন্দু সমাজ বর্ণাশ্রম শাস্ত্র অনুমোদিত সেকথা ‘শ্রীমদ্ভাগবতগীতা’তে বলা আছে। আবার পাশাপাশি মুসলমান সমাজের যে শ্রেণি এর কথাও বলেছেন যেমন- সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠান। এছাড়া কবি তন্ত্রমন্ত্র, ‘কোরান’ এর কথা ভেবে বলেছেন, মানুষই তন্ত্র, মানুষই মন্ত্র, মানুষই জ্ঞানের আধার। কিতাব, কোরাণ মানুষদের জন্যই রচিত।

সৈয়দ শেখ জাদা আদি মোগল পাঠান।  
স্বদেশী বৈদেশী বহুতর হিন্দুয়ান।।  
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।  
সারি সারি বসিলেক যেন মহীন্দর।।  
নিরঞ্জন-সৃষ্টি নর রতন অমূল।  
ত্রিভুবনে কেহ নাহি নর সমতুল।।  
নর সে পরম তন্ত্রমন্ত্র তত্ত্বজ্ঞান।  
নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান।। (পৃ.৯)

‘লোর ও চন্দ্রাণীর মিলন’ অংশে লোর ঈশ্বরের নাম জপ করে। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, গোবিন্দ, মাধব সবই হিন্দুদেবতাকে স্মরণ করেছে। চন্দ্রাণীর কাছে ভৎসনার পর বামন মন্দিরে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে, সাধারণভাবে বাস্তবজীবনে একজন হিন্দুপুরুষ যা করেন বামনও তাই করেছে।

নিকুঞ্জে খেলিয়া বীরে চলি গেলা মন্দিরে  
লাগ না পায়ন্ত সেনা পাছে। (পৃ.৩৫)

হিন্দি ভাষার কাব্যকে অনুসরণ করতে গিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের সংস্কৃতি রীতিতেও কাব্যের কিছুটা অংশ বর্ণনা করতে হয়েছে। ‘লোরচন্দ্রাণীতে’ এই রীতির প্রয়োগ ঘটেছে।

হেন মতে শুভমস্তু করিয়া কুমারী।  
দেবস্থানে প্রবেশিল লই সব নারী।। (পৃ.৩৯)

শুভমস্তু অর্থাৎ কল্যাণ হোক, শুভমস্তু কথাটি সংস্কৃত।

মুসলিম সাহিত্যিক হয়েও দৌলত কাজি গ্রন্থে রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, শাস্ত্র, এছাড়া হিন্দু রচনাকারের কথা বলেছেন। ইনিই বোধহয় এমন একজন কবি যিনি এত প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন।

স্বামীগুণ গুণি নিশি সীদতি অঙ্গনা।। (পৃ.৩৫)

এখানে সীদতি অর্থে সন্তুষ্ট বা খেদ করা। এই কথাটি কবি জয়দেবকে অনুসরণ করে লিখেছেন। আবার ‘তুলারাশি দহে যেন প্রচন্ড হতাশ’ এই লাইনটি কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’এর ১ম অঙ্কের উল্লেখ করে লিখেছেন। এছাড়াও ‘স্বর্ণশ্চীব উপাখ্যান’ এই অংশটি মহাভারতের এক গল্পকথাকে তুলে ধরতে লিখেছেন, আবার মনে হতে পারে চন্দ্রাণীর জীবন ফেরাতে এর উল্লেখ করেছেন। ‘রামায়ণ’ এর কিছু চরিত্রকে (ভীম, সীতা) এই কাব্যের প্রয়োজনে কবি তুলে এনেছেন।

ভীম হেন বলীও না করে বলাৎকার।।  
সীতা সম সুন্দরী যদিও বৈসে বনে। (পৃ.৪)

চাণক্য শ্লোকের প্রভাবও কাব্যে পড়েছে-

এমত না হয় যদি স্বামী ব্যবহার।

সহজে করিব শঠে শঠ সমাচার।। (পৃ.৩৭)

‘চন্দ্রাণীর খেদ’ এই অংশে চন্দ্রাণীর মুখে এমন কথা শোনা যায়। তবে শ্লোকের বাক্যটি এমন “শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।”

শেষ পর্যন্ত বলা যেতে পারে, সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য ও সমাজে বিভিন্ন ধর্মের সম্প্রদায়গত বিভেদের তুলনায় সংহতি বা মিলনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দৌলত কাজির ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’ গ্রন্থে ইসলামি সংস্কৃতির ছাপ থাকলেও তাকে অতিক্রম করে হিন্দু সংস্কৃতির কথা উঠে এসেছে। অন্যান্য সংস্কৃতি যেমন- [হিন্দি, সংস্কৃত] ছাপও পড়েছে। সামগ্রিকভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্য সম্পর্কে জানা যায়-

“সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন প্রচেষ্টার সূচনা হয়। বাংলার প্রান্তিক জনপদের মুসলমান কবিদের কাব্যে বর্ণিত জীবনচিত্র সর্বত্র সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে নি। বরং হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমন্বয় এই সময়ের সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।”<sup>১৫</sup>

### পদ্মাবতী: সংস্কৃতির নানাদিক

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সাহিত্যিক আলাওল রচিত ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে সংস্কৃতির বহু দিক উঠে আসে।

**রোসাঙ্গ রাজ্যের বর্ণনা:** এই রাজ্য নানা দেশের নানা লোকের সমাগমে বেশ সংস্কৃতিপ্রবণ হয়ে ওঠে।

নানা দেশী নানা লোক

শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ

আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল।

আরবী মিসরী শামী

তুরকী হাবশী রুমী

খোরাসানী উজবেগী সকল।।

লাহুরী মূলতানী হিন্দী

কাশ্মীরী দক্ষিণী সিন্ধী

কামরূপী আর বাঙ্গালী।

ভূপালী কুদংসারী                      কনাই মলআবরী  
আচি কোচি কর্ণাটকবাসী।।  
বহু শেখ সৈয়দ জাদা                      মোগল পাঠান যোদ্ধা  
রাজপুত হিন্দু নানা জাতি। (পৃ.১৩)

**অলঙ্কার, বসন ও প্রসাধন:** নারী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তাঁদের ব্যবহৃত বসন প্রসাধনের পরিচয় পাওয়া যায়।

কম্বুবর নিন্দিয়া কঠের পরিপাটি।  
নির্মল সুচারু বক্ষ সিংহ জিনি কটি।।  
চন্দনের তরু যেন কুন্দিল কন্দর্পে। (পৃ.১৭)

**নৃত্য-গীত:** গুণীজনের সমাগমে রাজসভা ভরে উঠত। নাচ, গান, রঙ্গ তামাশা করে দিন অতিবাহিত হওয়ার চিত্র বেশ স্পষ্ট।

গুণিগণ থাকন্ত তাহান সভা করি।  
গীত নাট যন্ত্র বাদ্যে রঙ্গ ঢঙ্গ করি।  
নানান প্রসঙ্গ কথা কহি নানা মত। (পৃ.২১)

**হাট বর্ণনা:** এই কাব্যে দ্রব্যসম্ভারে ভরপুর হাটের সুন্দর বিবরণ তুলে ধরেছেন।  
গ্রামবাংলার দৈনন্দিন জীবনের ছবি ধরা পড়েছে।<sup>১৬</sup>

হাটশালে মৃগমদ কুঙ্কুম লেপনে।  
লক্ষ কোটি পসার মেলিছে জনে জনে।।  
হীরামণি মাণিক্য মুকুতা গজমতি।  
পুষ্পরাগ গোমেদ বিক্রম নানাজাতি।।  
কুঙ্কুম আগর মেদ মৃগমদ বেনা। (পৃ.৩২)

**রাজসভার বর্ণনা:** বিভিন্ন রত্নে সুসজ্জিত রাজসভার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন।

উচ্চতর সপ্তখন্ড নৃপতি আবাস।  
সুবর্ণ মেদিনী তথা সুবর্ণ আকাশ।।  
কাফুরে গঠিত ঘর সুবর্ণ ইটাল।  
হীরামণি রত্ন জড়ি আছে অতি ভাল। (পৃ.৩৭)

**বিদ্যাশিক্ষা:** গুরুগৃহে শিক্ষালাভের চিত্র প্রকট। পদ্মাবতী গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে।

পঞ্চম বরিষ যদি হৈল রাজবালা।  
পড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছত্রশালা।।  
মহান পন্ডিত হৈল কন্যা গুণবান।  
চতুর্দিকে নৃপগণে শুনিল বাখান।।  
সিংহলনগর রাজকন্যা পদ্মাবতী। (পৃ.৪০)

**স্নানযাত্রা বিবরণ:** পদ্মাবতীর সরোবরে স্নানের সুন্দর চিত্র এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে।

মান-সরোবরে কন্যা করিল গমন।।  
সখীগণ সঙ্গে করি সুবেশ রচিয়া।  
নানা বর্ণ সুবসন ভূষণ করিয়া।।  
জনে জনে পরিয়া রত্ন আভরণ।  
নানা পরিমল অঙ্গে করি বিলেপন।।  
নানা অলঙ্কার বাস নানা পরিমলে। (পৃ.৪৫)

**সামাজিক-পারিবারিক চিত্র:** মেয়েদের মধ্যে বিয়ের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যে ধারণা পাই তাতে সমাজের চোখে নারীর পদহেলিত হওয়ার প্রসঙ্গ উঠে আসে।

পিতৃগৃহে কন্যার রহন দিন চারি।।  
যে কিছু খেলিতে যোগ্য আজ লও খেলি।  
কালি শ্বশুরালে গেলে কোথা রস কেলি।।  
নিজ ইচ্ছাগত নহে আপনা গমন।  
সখীগণ সঙ্গে পুনি কোথাতে মিলন।।  
শাশুড়ী ননদী বাক্য বিষ বরিষণ।  
স্বামী সেবা ভক্তি মাত্র উপায় কারণ।। (পৃ.৪৫)

**পুরুষের শিকার যাত্রা:** রাজা রত্নসেন শিকারের পথে বার হয়।

হেন মতে আছে শুক নৃপ অন্তঃপুরে।  
আর দিন মহারাজা চলিলা আহীরে।। (পৃ.৬১)

**নারীর বস্ত্রবিশেষ:** মেয়েরা নানা দেশের নানা বর্ণের শাড়িতে সুসজ্জিত।

খেনে নেত পাট পৈরে খেনে জরতারি।।

খেনে খাসা রমাপতি খেনে গঙ্গাজল ।  
খেনে কিরমিজি খেনে পৈরে মলমল ॥  
খেনে নীল খেনে পীত শ্বেতরক্তবাস ।  
খেনে মসলিন খেনে বিলমিল তাস ।  
নানা দেশী নানা বস্ত্র নানা রঙ্গ পরে । (পৃ.৭৯)

**পূজা প্রসঙ্গ:** মাঘ মাসে মহেশের পূজোতে পদ্মাবতী মন্ডপে প্রবেশ করে ।

মহাদেব মন্ডপ আছয় সেই স্থানে ॥  
মাঘ মাস হইলে শ্রীপঞ্চমী সংযোগ ।  
সেই স্থানে পূজাত আসিবে সর্বলোক ॥  
পদ্মাবতী আসিবেক পূজিতে মহেশ । (পৃ.১০০)

এছাড়া বসন্ত পূজোর উল্লেখও পাওয়া যায় । ঋতুরাজ বসন্তকে সাদরে গ্রহণ করতে সকলে আনন্দে মেতে ওঠে ।

কতদিন ব্যাজে শ্রীপঞ্চমী আইল ।  
বসন্ত পূজিতে লোক উল্লসিত হৈল ॥ (পৃ.১১১)

**ব্রত উদযাপন:** মেয়েদের একাদশী ব্রত পালন বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষণীয় । এই দৃশ্য এখানেও বাদ পড়েনি ।

ব্রত একাদশী মোর নেই নাম জপ ।  
তিলেক বিস্মৃতি মাত্র ব্রতভঙ্গ পাপ ॥ (পৃ.১৪১)

**বিবাহ আচার, রীতি-নীতি, অনুষ্ঠান প্রসঙ্গ:** ‘রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ-খণ্ড’ এই অংশে হিন্দু সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানের যাবতীয় চিত্র উঠে এসেছে । বিবাহের প্রস্তুতি পর্ব থেকে শুরু করে আচার-রীতি, সাজসজ্জা, নান্দীমুখ, মাল্যদান, আশীর্বাদ, বিদায় ইত্যাদি প্রসঙ্গ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে । নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে প্রত্যেকের ঘরে পান দেওয়ার চল ছিল ।

রচিল বিভার কার্য মঙ্গল আচার ॥  
কর্পুর সংযোগে পান দিল ঘরে ঘরে । (পৃ.১৬৭)



বিবাহ অনুষ্ঠানে বর-কন্যা দুজনকেই সুন্দরভাবে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

বর কন্যা স্নান করাইলা কুতুহলে।।  
প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে দুই স্নান করাইল।।  
রাজনীতি বস্ত্র অলঙ্কার পরাইল।।  
যেই মত মহোৎসব নৃপতির ঘরে।  
তেমত আনন্দ হৈল রত্নসেন পুরে। (পৃ.১৬৮)

বিবাহ সম্পন্ন করতে মাল্যদান করানো হয় বর-কন্যার মধ্যে। রত্নসেন-পদ্মাবতী একে অপরকে মাল্য প্রদান করে।

কর্পূর তাম্বুল মাল্য দিলা জনে জনে।।  
সুগন্ধি চন্দন দিয়া করিলা মেলানি। (পৃ.১৬৮)

নান্দীমুখ অনুষ্ঠানের সব আয়োজন করা হয় বাঙালি হিন্দু বিবাহরীতিতে। এই কাব্যে রত্নসেন এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিল রাজন।  
রত্নসেন যথোচিত করিলা আপন।।  
নাপিত ডাকিয়া আনি তৃতীয় প্রহরে।  
করিলা খেউর কর্ম কন্যা কুমাররে। (পৃ.১৬৯)

কন্যা বিদায়কালে চারিদিক মঙ্গল ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

মঙ্গল বিধান করি গীত বাদ্য নৃত্যে পুরি  
রঙ্গভূমি বাহির হৈল। (পৃ.১৮১)

**বারমাসী বর্ণন:** এই কাব্যে নাগমতির বারমাসী বর্ণনার কথা জানা যায়। নারীর বারমাসী বর্ণনায় আষাঢ় মাস থেকে পরপর বারোটি মাসের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম আষাঢ় মাস বরিষা প্রবেশ।  
মোর খণ্ডব্রতফল পছ নাহি দেশ।। (পৃ.২১২)

**সতিন প্রসঙ্গ:** নাগমতি ও পদ্মাবতী দুই সতিন মিলে স্বামীর সেবা করে।

দুই সতিনের মধ্যে বাড়িল পিরীত।  
স্বামীসেবা করে দোহ হইয়া এক চিত।। (পৃ.২৬২)

## ইউছফ জোলেখা বা মোহাব্বাতনামা: সংস্কৃতির নানাদিক

মুসী শাহ গরীবুল্লাহ তাঁর কাব্যে ইউসুফ-জোলেখার প্রণয়কাহিনি বর্ণনায় সংস্কৃতির নানা দিকের কথা তুলে এনেছেন।

**পীর ভক্তি:** বড়খাঁ গাজি (পীর)কে সালাম জানিয়ে কাব্য রচনা শুরু করেন। এই কাব্যের বক্তা বদর পীর, শ্রোতা বড় খাঁ গাজি। কবি এই পীরের ভক্ত ছিলেন, নাম উল্লেখ থেকেই বোঝা যায় প্রথমেই পীরের বন্দনা করেছেন।

বদর বলেন শুন বড়খা মেরা ভাই।।

আমার ছালাম মর্দ তোমাকে সমজাই। (পৃ.১)

**প্রার্থনা-পদ্ধতি:** এয়াকুব নবি'র স্ত্রী নিঃসন্তান থাকায় আল্লাহর নিকট হাত তুলে মোনাজাত করে। এই বর্ণনায় ইসলামি রীতি-নীতির স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পাই।

হামেসা নামাজ আর করিয়া ছালাত।।

মোনাজাত করে বিবি উঠাইয়া হাত।

সকলি করিতে পার তুমি করতার।। (পৃ.২)

**সতিন প্রসঙ্গ:** সমাজে সতিন জ্বালা প্রকট এবং পুরুষের বহু-বিবাহ এর ধারণা পাওয়া যায়।

সতিনের দশ বেটা দিলে করতার আমার বঞ্চিত কৈলে আমি গোনাগার। (পৃ.২)

**নারীর গর্ভধারণ:** এয়াকুবের প্রথম স্ত্রী রাহিলা বিবির গর্ভধারণের চিত্র ফুটে উঠেছে।

আল্লার কুদরতে হৈল রাহিলার হামেল।

দশ মাস দশ দিন হইল আখেরে।। (পৃ.৪)

**গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা:** ছালাম (সালাম) অর্থাৎ প্রণাম করাকেই বোঝায়, এটা কোন ধর্মের নিজস্ব সংস্কৃতি নয়। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটা অঙ্গ।

বাছারে ইয়াকুব নবী দেখেন নজরে।

বাপের কদমে গিয়া করেন ছালাম।। (পৃ.৮)

**পুরুষের সাজসজ্জা:** ইউসুফের দশ ভাই মিলে তাঁকে সাজিয়ে দেয়, চন্দন দিয়ে সারা গায়ে লেপন করে এবং মাথায় কাঙ্গই (চিরুনি, গ্রামবাংলায় এখনও এই কথাটি প্রচলিত) দিয়ে পরিপাটি করে দেয়।

দশ জনার হাতে দিল ইউছফে শুপিয়া।  
দশ ভাই মেহের করে মুখে চুমা দিল।।  
ছন্দন আনিয়া তার গায়ে মাখাইল।  
কাঙ্গই করিল তারা মাথায় জুলুপে।।  
বহুত মেহের তারা করিল ইউছফে। (পৃ.১১)

**চিকিৎসাবৃত্তি:** পুত্রশোকে এয়াকুব নবি অজ্ঞান হলে এই হাকিমি-বিদ্যার প্রয়োগ হয়।<sup>১৭</sup>

মাথায় ডালিল পানি মুখে আদা দিয়া।।  
কতক্ষণ বাদে নবি চেতন পাইয়া। (পৃ.১২)

**নৃত্য-গীত:** সওদাগরদের মধ্যে নাচ, গানের বেশ রেওয়াজ ছিল।

নাটওয়া নাটির রঙ্গ তামাসা বহুত।।  
বড় বড় হাতি সব সাজায় মাহুত।  
নাচ গান হরষিতে সওদাগর রয়।। (পৃ.১৬)

**দাই-প্রসঙ্গ:** মাতৃ-বাৎসল্য ছাড়াও শিশুরা দাইদের কাছে পালিত হত, নিজেদের সুখ-দুঃখ প্রকাশ করত। জোলেখা স্বপ্নে ইউসুফের রূপ দেখে বিস্মিত হয় এবং সেই বৃত্তান্ত দাইকে জানায়।

ইউছফ বিদায় হইল জাগিল জোলেখা।  
চমক লাগিয়া ওঠে কহিল দাইয়ের।। (পৃ.২৩)

অথবা

নানামতে নাচে গায় তবলা বাজায়।।  
দাইয়ের হাতে শুপে তবে দিল জেলেখায়। (পৃ.২৬)

**নারীর সাজ-সজ্জা:** জোলেখার সাজগোজের চিত্র কবি এখানে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। হার, চুড়ি, নখ (নাকের অলংকার) ইত্যাদি অলংকারে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে।

নাথ সেঙ্গারে সাদ, লোটনে সোনার চাদ, গলে দিল গজমতি হার।  
নাকেতে সোনার নথ, মতির জড়িত কত, রওশনি করে ঝলমল।।  
কানেতে কনকপতি, হিরালাল তার সাতি, ঝলমল গগন উজ্জ্বল।  
হাতেতে কাচের চুড়ি, বাওটি কামের বেড়ি কাঙ্গনে কনক তার লোভে।।  
পিঠ পরে পিঠঝাপা মাথায় সোনার চাপা, মরি, লুকাইতে নরনে সদায়।।  
(পৃ.২৫)

**নারীর পোশাক-পরিচ্ছেদ:** নারীরা বোরখা পরিহিত পোশাকে পুরুষের সামনে বার হয়, এই চিত্র ইসলাম মতে পর্দা-প্রথা বলে প্রচলিত আছে। জোলেখা বোরখা পড়ে জনসম্মুখে হাজির হয়।

হেথায় জেলেখা কহে দাইকে ডাকিয়া।  
আজিজ দেখিব আমি নজর করিয়া।।  
বোরখা উঠাও আমি দেখি তাকাইয়া। (পৃ.২৭)

**বিবাহ-অনুষ্ঠান:** আজিজ মেছেরের সঙ্গে জোলেখার বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় মহা ধূম-ধামে।

জেলেখা হুকুম দিল করিতে লগন নাচ গীত আনন্দিত বেহার বাজন।  
খেলাইল বহুত লোক এগানা বেগানা।।  
আনন্দে করিল বেহার ছামানা।

.....

নাচ গীত আনন্দিত বেহার ছামানা।  
নানারঙ্গে ভঙ্গে নাচে দুদলের মাঝ।।  
কামানে পলিতা দেয় বন্দুকের আওয়াজ।  
লস্করে লস্করে মিলে করিয়া পায়তারা।।  
দোতারা সারঙ্গি বাজে ঢোলক মন্দিরা। (পৃ.২৮)

**নারীর প্রসাধনী:** মুসলমান নারীর সিঁদুর ব্যবহার। জোলেখা প্রসাধন হিসেবে সিঁদুর পড়েছে।

এক চক্ষে কাজল আর অর্ধেক সিঁদুর।।  
পরিতে পরিতে যায় দেখিতে নজর। (পৃ.৩২)

পান খাওয়ার প্রথা: আশি বছর বয়স্কা বুড়ি পান এবং গুয়া খেয়ে জোলেখার মহলে প্রবেশ করে। মুসলমানরা মাঝে মাঝে সামাজিক সমাবেশে অতিথিদের পান-সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করতেন।<sup>১৮</sup>

হেনকালে সহর হইতে আইল এক বুড়ি।  
জেলেখার আগে আইল হাসিয়া হাসিয়া।।  
পড়িয়া পাটের সাড়ি পান গুয়া খাইয়া। (পৃ.৪৩)

পূজা-প্রসঙ্গ: ইউসুফকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় জোলেখা পূজায় মগ্ন, এখানে হিন্দু সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট, মুসলিম নারী ঠাকুরের নিবেদনে রত থেকেছে প্রেমিক পুরুষকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে।

জেলেখা দেবতা পুজে ধুপধুনা দিয়া।।  
ইউছুফে দেহত মোকে আমার করিয়া। (পৃ.৪৬)

অতিথি আপ্যায়ণ: নারীদের মধ্যে সাধারণত অতিথি আপ্যায়ণের ব্যাপার দেখা যায়।

তামাম আওরত ডাকে মেহমানি করিয়া।  
সকলে বসায় এনে গালিচা উপর।।  
খেলায় পিলায় খানা তাজিম বিস্তর। (পৃ.৫৪)

ধর্মান্তরিতকরণ: ইউসুফ আল্লার মহিমা ছাকি-বাকি দুই ভাইকে বোঝাতে থাকে, তাঁরা এই কথা শুনে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে।

ছাকি বাকি দুইজন শুন সমাচার।  
শুনিয়া দুজনে তারা আনিল ইমান।।  
নবীর কলেমা পড়ে হইল মুছলমান। (পৃ.৫৮)

অন্যদিকে রায়হান সাহা ইনিও মুসলমান হচ্ছে।

নবির এছলামি দিন কবুল করিল।।  
কলেমা পড়িয়া সাহা মুসলমান হৈল। (পৃ.৭৮)

ভারতবর্ষে মুসলমান শক্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে মানুষজন নিরাপত্তা, ক্ষমতার বলীয়ান, অর্থনৈতিক জীবনধারণের জন্য ধর্মান্তরণকে একরকম পস্থা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন,<sup>১৯</sup> তাঁরই প্রকৃষ্ট চিত্র এই কাব্যে তুলে এনেছেন গরীবুল্লাহ।

## গ. ধর্মীয় ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক রচনা ও সংস্কৃতি

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত এই ধরনের কাব্যে ইসলাম ধর্ম, অনুষ্ঠান, নবিদের কথা ইত্যাদি বিষয়ে যেমন জ্ঞান আহৃত হয় তেমনই পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিকগুলি সম্পর্কেও আমরা স্পষ্ট ইঙ্গিত পায়। মরহুম সেখ কমরুদ্দিন রচিত ‘খায়রুল হাশার’ কাব্যে প্রথমেই ‘হামদ ও নাআত’ অংশের মধ্যে দিয়ে জগতের প্রেম সম্পর্কিত বিষয়ে ধারণা দিয়েছেন। স্রষ্টা বা আল্লাহ এবং সৃষ্ট জীবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

ওহে প্রভু পেমময় প্রেমের ভান্ডার।।

প্রেমের কারণে সৃষ্টি করিলে সংসার। (পৃ.৩)

**কলেমা পাঠ:** জিবরীল কলেমা পড়ে নামাজে সেজদা দিচ্ছে। এর ভিতর দিয়ে নামাজের শিক্ষা কেমন তার জ্ঞান এবং কলেমার কথা জানতে পারা যায়।

লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

কালেমা পড়িয়া জিবরীল সেজদায় আইল।। (পৃ.৭)

**তসবী তেলওয়াত:** মুসলমান ধর্মের প্রত্যেক মানুষজন নামাজের পর তসবী পাঠ করে। ইসলামি আচার-রীতি প্রসঙ্গে জানা যায়।

বেহুশ হইয়া তসবী লাগিল পড়িতে।

আওয়াজ আইল বলে আল্লাহ আকবার।। (পৃ.৭)

**বিদ্যাশিক্ষা:** হাবীল ও কাবীলের শিক্ষালাভের পথ আলাদা। হিন্দু-মুসলমান সমাজের ছেলে মেয়েরা যেভাবে শিক্ষালাভ করে আমরা তার কথা জানতে পারি।

কাবীল পড়িল শাস্ত্র হাবীল কোরআন।। (পৃ.২০)

**হজ প্রসঙ্গ:** আদম নিজের দুই পুত্রকে (হাবীল-কাবীল) খুঁজতে মক্কা শরীফে হজ করে। হজ মুসলমান ধর্মের মানুষের কাছে তীর্থ করার মতো।

হজ্জ করে দু-বেটায় ঢুড়িবার তরে।

এত বলে চলে রাহে হয়ে এক দিল।।

হায়রে কোথায় মোর হাবীল কাবীল।

বিছমিল্লা বলিয়া আদম রাহে চলে যায়।। (পৃ.২৭)

**বিবাহ-রীতি:** হজরত ইব্রাহীম নবি হাজেরা বিবিকে বিয়ে করে এবং দেনমোহর হিসাবে তাঁর প্রাপ্য সে পায়। মুসলমান বিবাহ রীতিতে ‘দেনমোহর’ বলতে স্ত্রীকে যে পরিমাণ মূল্য প্রদান করে স্বামী বিয়ে করে। কিন্তু এই কাব্যে পুরুষ বিয়ে করার জন্য দেনমোহর দাবী করে।

হাজেরা নামেতে বেটা দিব আমি শাদী।।

দেনমোহরের জন্যে শর্ত কর যদি।

ছাগল বকরী ভেড়া আদি যত মোর আছে।।

চড়াইতে লয়ে যাবে ময়দানের বিচে। (পৃ.৪২)

**দাই প্রসঙ্গ:** হজরত মোহাম্মদের মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পরিচর্যার জন্য দাই নিয়োগ করা হয়। ধাত্রীমাতা হালিমার তত্ত্বাবধানে তিনি ছয় বছর পালিত হন। আরবদেশে অভিজাত পরিবারের রীতি অনুযায়ী জন্মের পর শিশুকে দাই এর কাছে পালিত হতে হয়।<sup>২০</sup>

এতিম হইয়া নবী জাহানে আইল।

আরবে এমন ধারা ছিল যে দস্তুর।।

শিশুকে পালিতে দিত ধাত্রীর হুজুর।

শিশু নিয়া দাই যেত আপনার ঘরে।। (পৃ.৭৭)

এই কাব্যে জগত সৃষ্টি থেকে আদম-হাওয়ার জন্ম, হজরত ইব্রাহীম, হজরত মোহাম্মদ, হজরত ঈসা প্রভৃতি নবিদের কথা যেমন এসেছে ঠিক তেমনই মুসলমান জাতির অভ্যুত্থান মোহাম্মদের হাত ধরে, ইহুদি (কাফের) জাতির মুসলমান ধর্ম গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে জানা যায়, এই প্রসঙ্গের ভিতর দিয়ে মুসলমান জাতির রীতি-নীতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। পাশাপাশি নারীর গর্ভধারণ, কাফের জাতির পূজা প্রসঙ্গ, নারী জাতির স্বামীর প্রতি সেবা, নারীর বনবাস ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীমনিরদ্দিন আহম্মদ রচিত কাব্য ‘কালন্নবি’ উর্দু গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এই কাব্যের ভিতর ইসলাম ধর্মের বেশ কিছু আচার-অনুষ্ঠানের দিক উঠে এসেছে।

**নামাজ প্রসঙ্গ:** ইসলাম ধর্মের প্রচারক হজরত মোহাম্মদ এর জীবন বর্ণনার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর উত্তরসূরীদের জন্য যে বার্তা দিয়েছেন সেইগুলোই এই কাব্যে গ্রথিত থেকেছে। নামাজ একটি অপরিহার্য অঙ্গ মুসলমান সমাজের মানুষের কাছে। বিভিন্ন নামাজ সম্পর্কে বহু নিয়মের কথা এই কাব্যে উঠে এসেছে।

হাজার আবেদ হৈতে সেজন বেহতর।

আর জারা তাহাজ্জদ নামাজ গোজারে। (পৃ.৪)

তাহাজ্জদ নামাজ এর কথা জানা যাচ্ছে, এই নামাজ পড়লে মানুষের মঙ্গল হয়। বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য এই নামাজ আদায় করে, গভীর রাত্রিতে এই নামাজ শুদ্ধ পোশাক পরিহিত হয়ে আদায় করতে হয়।

**কলেমা পাঠ:** ‘কেয়ামত’ মুসলমান ধর্মের মানুষের কাছে মৃত্যুর পরবর্তী বিচারস্থান। সেই দরবারে যে ব্যক্তি ‘লাএলাহা’ কলেমা পাঠে নিয়োজিত থেকেছে তাঁর উজ্জ্বল অভিব্যক্তির কথা বলা হয়েছে।

ফরমিছেন হাদিছেতে রছুল আল্লার।

লাএলাহা কলেমা জেই পড়ে শতবার।

হররোজ শতবার জেজন মমিন।

পড়িবে এ কলেমাকে করিয়া একিন।

কেয়ামতে সেহ এয়ছা আসিবে উঠিয়া।

পুল্লিমার চান্দ মত ওজালা করিয়া। (পৃ.৫)

**সেরেক প্রথা:** ‘সেরেক’ অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাসকের আরাধনা করা, নামাজ-কলেমা পরিত্যাগ করা এই সমস্ত কর্মকে বোঝায়। কথিত আছে যে ব্যক্তি বা যাঁরা সেরেক থেকে মুক্ত তাঁদের জান্নাতে (স্বর্গ) স্থান হবে।

সেরেক হইতে ছাফ সে জন হইল।

সেরেক জাহের আর বাতেন হইত।

পাক হৈয়া বেহেছাব জাইবে জেন্নতে। (পৃ.৫)



**বিসমিল্লাহ রোওয়াজ:** হজরত মোহাম্মদের নির্দেশিত বাণী গোটা মুসলমান সমাজে প্রচারিত। নবির দেখানো পথই মুসলমানবাসীর আদর্শ। এখানে ‘বিসমিল্লাহ’ কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন কবি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে। মুসলমান সমাজে ‘বিসমিল্লাহ’ কথাটি শুরুতেই ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত প্রতিটি কাব্যেই আমরা এই কথাটির ব্যবহার দেখি।

বেছমেল্লা জদি কেহ বলে একবার।

এক জারা গোনা বাকি না রহিবে তার।

আর এহা বলেছেন নবি পাকজাত। (পৃ.৭)

এই কাব্যটি হাদিস সংক্রান্ত একটি কেতাব, এখানে মুসলমান সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকের কথা উঠে এসেছে। নামজের আগে ওজু কিভাবে করতে হয় তার নিয়ম, আজানের নিয়ম, দরুদের ফজিলত, জমাতের কথা (জমাত অর্থে যে দরবারে ইসলামিক জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে মিলিত হয়), জুম্মা অর্থাৎ শুক্রবার বোঝায় এই দিনের বিশেষ তাৎপর্য, রোজার ফজিলত, ফরজ নামাজ, সুন্নত নামাজ, জাকাত (দান করা), তসবি পাঠ, ছদকার প্রসঙ্গ, পুরুষের নিকাহ করার কথা, মৃত্যুর পর কবরের কথা ইত্যাদি বিষয় এখানে বর্ণিত হয়েছে। এখানে পুরোপুরিভাবে ইসলামিক সংস্কৃতির কথা আমরা জানতে পারি। এই কাব্যগুলি ইসলামিক উদ্দেশ্যেই রচিত।

## গ. জঙ্গনামা ও সংস্কৃতি

### জঙ্গনামা: সংস্কৃতির নানাদিক

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ বিভিন্ন ধারার কাব্য রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের ধারায় গরীবুল্লাহ’র রচনা পাওয়া যায়, জঙ্গনামার ক্ষেত্রেও কবির কবিত্বশক্তিকে লঘু করে দেখব এমনটা নয়, আসলে জঙ্গনামার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করাটাও এক ধরনের কৌশল নির্মাণের ক্ষেত্র একথা বলা যেতে পারে। শাহ্ গরীবুল্লাহ বিরচিত ‘জঙ্গনামা’তে সংস্কৃতির অনেক দিকের উল্লেখ

এসেছে, যা শুধুমাত্র ইসলামি সংস্কৃতির কথা বলে না। এখানে অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গও এসেছে।

**বন্দনা:** গরীবুল্লাহ তাঁর কাব্যে আল্লাহর বন্দনা করেছেন, সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

পহেলা বন্দিণু আল্লা আগে করতার।

দ্বিতীয়ে বন্দিণু যত ফেরেস্তু তাঁহার।। (পৃ.৯৫)

**উৎসব:** ঈদ (রমজান মাসে একমাস উপবাস করার পর যে উৎসব হয়) মুসলমানদের কাছে পবিত্র অনুষ্ঠান।

এক রোজ মোহাম্মদ নবী পয়গম্বরে।

মসজিদে গেল ঈদের নামাজ পড়িবারে।। (পৃ.৯৯)

**মাতম:** মুসলমান ধর্মের মানুষের কাছে একধরনের শোক প্রকাশের উৎসব, মূলত মহরম মাসের চাঁদে এই অনুষ্ঠান হয়। কারবালার ময়দানে শহিদ হওয়া দুই পুত্র (হাসান-হোসেন) তাঁদের স্মরণে রেখেই এই মাতম অনুষ্ঠিত হয়। আজও গ্রামবাংলার বহু জায়গায় মাতম পালিত হয় যেমন-নদিয়া, উত্তর চব্বিশপরগণা জেলা।

ইমাম হোসেন যবে কারবালায় শহীদ হবে

এই সব ফেরেশতা আসিয়া।

বহুত মাতম জহারী করিবে ময়দাবন ঘিরি

ইমামের খবর পাইয়া।। (পৃ.১০২)

**বিবাহ-রীতি:** হজরত মাবিয়া বয়স্কা মহিলাকে বিবাহ করে, এই প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজের বিবাহের রীতি উঠে এসেছে।

আনিয়া যে এক বুড়ি নেকা কৈল সেই ঘড়ি

মোল্লা পড়াইয়া দিল নিকা।। (পৃ.১১২)

**বসার উপকরণ:** মাবিয়ার স্ত্রী স্বামীকে বিছানা পেতে বসতে দেয়।

তাগিদ দিলেন বুড়ি মহল মাঝার।

আওল বিছানা পরে বৈসে গিয়া তার।। (পৃ.১১৩)

গ্রাম-বাংলার বধূর বাচ্চা কোলে নেওয়ার চিত্র: গ্রাম-বাংলার মহিলারা নিজের সন্তানকে কাঁকেতে (কোমরে বসিয়ে নিয়ে ধরে থাকে) নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সেই চিত্র এখানে স্পষ্ট।

রাছুল কহেন তারে হেকমত করিয়া।।

বান্দি বাচ্চা লয়ে ফের কাঁকেতে করিয়া।। (পৃ.১১৫)

ভিক্ষাবৃত্তি: হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর উম্মতেরা নিজেদের খারাপ অবস্থার কথা প্রকাশ করে, তাঁরা দেশে দেশে ভিক্ষা করে খাবে এমন কথা বলে।

ঘরে আর কাম নাই মুখে লাগাইয়া ছাই

দেশে দেশে মেঙ্গে খাব ভিখ।। (পৃ.১২৬)

নামাজ-রোজা প্রসঙ্গ: নবিজি তাঁর উত্তরসূরিদের নামাজ, রোজা এগুলি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। ইসলামি আচার-রীতি'র প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

তামাম ইয়ারে কহে নবী পয়গম্বর।

পড়িবে কোরআন দেলে রাখিয়া খবর।।

নামাজ পড়িবে আর রাখিবেক রোজা। (পৃ.১২৭)

মৃত্যুর রীতি: ইসলাম ধর্মের কোনও ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে সমবেত হয়ে মুসলমানগণ দোয়া পাঠ করে, একেই জানাজা বলা হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর গোছল (স্নান) করানো হয়, কাফনে মোড়া হয় মৃত ব্যক্তিকে।

গোছল কাফন দিয়া জানাজা করিল।। (পৃ.১৩৮)

নারীর রূপ বর্ণনা: গরীবুল্লাহ যুদ্ধ কাব্য রচনায় কলম ধরেছেন কিন্তু এই কাব্যের বর্ণনা অংশের মধ্যে দিয়ে কবির বিদগ্ধ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নারীদের কথা তুলে ধরার সময় তাঁদের রূপের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। জয়নাবের রূপের কথা জানা যায়। ফাতেমার কথাও বলেন।

জব্বারের কবিলা জয়নাব তার নাম।

অতিশয় রূপবতী গুণে অনুপাম।। (পৃ.১৩৯)

**তালাক প্রসঙ্গ:** মাবিয়ার পুত্র (এজিদ) আবদুল জব্বারের সুন্দরী রূপবতী স্ত্রী জয়নাবের রূপে মুগ্ধ, নিজের ক্ষমতাবলে জয়নাবকে পেতে জব্বারকে আদেশ জানায় নিজের স্ত্রীকে তালাক দিতে। লোলুপ জব্বার টাকার বিনিময়ে নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয়।

যদি সে তালাক দিয়া ছাড়ে সেই বিবি।

তবেত কবুল আমি করিব যে আভি।। (পৃ.১৪২)

তালাক দেওয়ার পর জয়নাবের জীবনে দুঃখ নেমে আসে, যা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

ধন মুল্লকের লোভে ছাড়িলে আমারে।

কোন মুখ লিয়া ফের আইলে এ ঘরে।। (পৃ.১৪৩)

**খোতবা পাঠ:** এজিদ তাঁর নামে খোতবা (কোন ব্যক্তির শুভকামনায় কোরান থেকে বিশেষ উদ্ধৃতি পাঠ করা) পাঠ করার নির্দেশ দেয় ইমাম হাসান-হোসেনকে।

আমার নামেতে খোতবা পড় দুই ভাই।

মককা মদিনা লিয়া করব বাদশাই।। (পৃ.১৫৩)

**খাদ্য প্রসঙ্গ:** খাদ্য সংস্কৃতিকেও তুলে এনেছেন, যুদ্ধের পরিবেশের মধ্যেও চরিত্রগুলির বয়ানে খাবারের কথা উঠে আসে।

খানা পিনা কর সবে শুন মেরা বাণী।।

গোলাম সকলে পানি আনিবারে চলে। (পৃ.১৯২)

অথবা

এজিদা বলিল বেটি শুনগো ফাতেমা।

মদীনা হইতে আমি আনিয়াছি খোরমা।। (পৃ.২৫৬)

খোরমা অর্থাৎ খেজুর, আরবের প্রসিদ্ধ খাবার।

**যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র:** যুদ্ধে নানা ধরনের অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে।

কাটারী খঞ্জর নেজা জোড়া তলওয়ার।

কাটিয়া চলিল মর্দ হইয়া বেকারার।। (পৃ.২০০)

**শিক্ষা-প্রসঙ্গ:** জাবেরা নামে এক কুফার ব্যক্তি হজরত হোসেনের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় কিন্তু ছেলেবেলায় তাঁদের একই মক্তবে পড়ার কথা জানা যাচ্ছে। মুসলমান সমাজের

এখনও কিছু ছেলেমেয়ে মক্তব এ শিক্ষা গ্রহণ করে, যেখানে বিশেষভাবে ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়।

তুমি আমি মক্তবে পড়েছি এক ঠাঁই।

এখন লড়িতে ভাই আইলে ধাওয়া ধাই।। (পৃ.২০১)

**যুদ্ধ বর্ণনায় হিন্দু প্রভাব:** গরীবুল্লাহ তাঁর কাব্যে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের সাথে কিভাবে হিন্দুদের তুলনা এনেছেন সেই বিষয়টি জানার, আসলে কবির মানসিকতায় উভয় ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার জায়গা থেকেই এই বর্ণনা।

তলওয়ারে তলওয়ারে লড়ে করে ঝন ঝন।

যেমন করতাল বাজে হিন্দুর কীর্তন।। (পৃ.২০২)

**যুদ্ধে পুরুষের পরিহিত পোশাক:** যুদ্ধের জন্য পুরুষরা নিজেদের সাজিয়ে তুলেছে বিভিন্ন পোশাকে সজ্জিত হয়ে।

জানিয়া কোমর বান্ধে                      দেখিয়া জননী কান্দে

সাজওয়াল পরিল অঙ্গ পরে।।

কোমরে জিঞ্জির পাটি                      জরীর পটকা আটি

তারপর বান্ধে তলওয়ার।

খঞ্জর কাটারী ছুরি                      ডাহিন বামেতে ধরি

গোস্বায় বলেন মার মার।।

শিরেতে লোহার টোপ                      মারিতে লাগিল কোপ

কামান ধরিল বাম হাতে। (পৃ.২১২)

**মৃত্যুর দোওয়া:** মুসলমান ধর্মের কোনও ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর এই দোওয়া পাঠ করা হয়, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' এই কাব্যেও প্রতিটি চরিত্রের মৃত্যু সংবাদে তাঁদের প্রিয়জনদের মুখে এই কথাটি শোনা যায়।

**নারীর অলঙ্কার:** কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে মক্কা শহরের নারীদের অলঙ্কার লুট হয়। সেই সময়ে নারীদের সজ্জিত অলঙ্কারের উল্লেখ এই কাব্যে পাওয়া যায়।

হাতের কাঙ্গন সব আরশ কাঙ্গুরা।

ভাঙ্গিয়া করিব চুর তবেত জোহরা।। (পৃ.২৪১)

অথবা

লুটিল বসন আদি যত অলংকার ॥  
তবে এক কাফের আইল আচম্বিতে ॥  
লাগিলেক সখিনার গহনা কাড়িতে ॥  
ফের এক কাফের সেইখানেতে মিলিল ।  
বানুর গহনা সব কাড়িয়া লইল ॥  
আর ইমামের বেটির গহনা যা ছিল ।  
দুই জনে সেই তাহা লুটিয়া যে লিল ॥ (পৃ.২৪৪)

**ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গ:** এই কাব্যে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের কথা উঠে এসেছে, কুফার জাতি ইমামের শিরচ্ছেদ করার পর যাত্রাপথে এই ব্রাহ্মণের ঘরে আশ্রয় নেয়। চন্দ্রভান নামে ব্রাহ্মণ ইমামের শির দেখে চিনতে পারে এবং সেই শির লুকিয়ে রাখে। কুফারদের নিজের সন্তানের মুণ্ডচ্ছেদন করে তুলে দেয় কিন্তু কুফাররা তা নিতে অস্বীকার করে। ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে কুফারদের যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়। তবে যুদ্ধের আগে ইমামের থেকে সেই দম্পতি কলেমা শিখে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে।

কাটা শিরে বাত কহে বামন হুজুরে ।  
বড়ই একিদা হইল বামন অন্তরে ॥  
কলেমা তৈয়ব সেই পড়ান জবানে ।  
একিদায় কলেমা পড়িল চন্দ্রভানে ॥  
জরু খসম সহিত হইল মুসলমান ।  
হাজার সালাম কইল সাবুদ ঈমান ॥ (পৃ.২৪৯)

এখানে কবির বর্ণনায় হিন্দু-মুসলমান সুগভীর সম্পর্কের কথা উঠে আসে।

**নারীদের যুদ্ধ প্রসঙ্গ:** নারীরাও পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে সেই কথা এই কাব্যে জানা যায়। বিবি হনুফা হজরত আলির সঙ্গে যুদ্ধ করে। তবে শেষপর্যন্ত যুদ্ধে নারীর পরাজয় ঘটে, এখানে নারী শক্তিকে লঘু করে দেখানো হয়েছে।

হনুফা কহেন তবে শুন পাহালওয়ান ॥  
লড়াই করিবে যদি কর না কারার ।  
হারিলে হইবে তুমি নফর আমার ॥

আমি যদি হারি বান্দি হইব তোমার ।  
এয়ছাই কহিয়া বিবি হইল ছওয়ার ।।  
দুইজনে ঘোড়ার উপর হইল ছাওয়ার ।  
বড় জঙ্গ হইলেক দোন বর বর ।। (পৃ.২৬৪)

### গরীব গদাই: সংস্কৃতির নানাদিক

অধীন তৈয়ব, জয়রাম দাস, অধীন বালক রচিত এই পুথি সাহিত্যে কারবালার যুদ্ধের অবতারণা করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের কথা উঠে এসেছে যা সংস্কৃতির চিহ্নকে বহন করে। আসলে যুদ্ধকাব্যে অন্যান্য কাব্যের মতো নারীদের শারীরিক কাঠামোর বর্ণনা তেমন পায় না তাছাড়া এই শোকগাথাতে অত বিলাসবহুল জীবনের ছাপও নেই। সেই কারণেই সংস্কৃতির নানা দিককে কবিরা বর্ণনা অংশে তুলে আনতে পারেননি। যতটুকু বর্ণনা করেছেন তার সবটাই যুদ্ধকেন্দ্রিক পরিবেশের কথা। যুদ্ধ জীবনের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। এখানে যে সরঞ্জাম এর ব্যবহার হয় সেগুলোও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। যুদ্ধ প্রসঙ্গের অবতারণার মধ্য দিয়ে জাতির পরিচয় উঠে আসে, কোনও জাতির পরাক্রম শক্তি কতটা তাও ব্যক্ত হয়।

**ব্যবহৃত আসবাব:** গরীব গদাই বাদসা তক্তের উপর বসে নিজের ক্ষমতা পরিচালনা করে।

গরীব গদাই বাদসা জোনমাত সহরে ।  
বাদসাই করে মর্দ তক্তের ওপরে ।।  
তক্তে বার দিএগ বাদসাই করে নামাকুল ।  
না মানে আল্লাতালা না মানে রছুল ।। (পৃ.১৩৬)

**বেহেস্ত-দোজখ প্রসঙ্গ:** ইসলাম ধর্মে প্রতিটি মানুষের মনে বেহেস্ত ও দোজখ সম্পর্কে কমবেশি আগ্রহ লক্ষ করার মতো।

আমি আল্লা আমি নবি আমি পয়গাম্বরে ।  
ভেহেস্ত দোজখ মেরা দেখহ নজরে ।।  
জে মোরে মানিব তারে ভেহেস্তে রাখিব ।  
নহিলে দোজখে ডেল্যা প্রহার করিব ।। (পৃ.১৩৭)

**বিভিন্ন জাতি প্রসঙ্গ:** কোল, মাল, ডোম প্রভৃতি জাতির কথা এখানে জানা যায়, এঁরা প্রত্যেকেই এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

কোল মাল খএরা ডোম জতেক আছিল।

লাখ দুই জড় কর্যা লড়িতে চলিল।। (পৃ.১৩৯)

**ওজু প্রসঙ্গ:** ফজরে উঠে হজরত আলির ওজু করে নামাজ পড়ার কথা জানা যাচ্ছে। ইসলামি নামাজের রীতি-নীতি প্রসঙ্গ ধরা পড়েছে এই বর্ণনায়।

ফজররে উঠিএগা আলি অযু করিএগা।

আল্লার দরগায় তাত বন্দগি করিএগা।। (পৃ.১৪০)

**দাসপ্রথার চিত্র:** আগেকার দিনে নফর হিসাবে কাজে নিযুক্ত করার জন্য মানুষ কেনা-বেচা হত তারই চিত্র এখানে প্রকট।<sup>২১</sup>

ফকির বলেন সাধু দোজখ হৈল কাল।

পেটের লাগি বেচিতে আনিলুঁ ছত্তাল।।

আপন বেটা আনিলাম বেচিবার তরে।

কেহু জদি কিনে নেয় রাখি তার ঘরে।। (পৃ.১৪৫)

**রসুলের প্রতি শ্রদ্ধা:** ইসলামধর্মের অনুরাগীদের রসুলের প্রতি শ্রদ্ধা লক্ষণীয়।<sup>২২</sup>

নবিকে দেখিএগা আলি চুমিলেন কদম।

নবি বলেন হউক তমায় আল্লার রহম।। (পৃ.১৬১)

### **ওফাতনামা: সংস্কৃতির নানাদিক**

অনন্দি নাগর রচিত এই কাব্যে সংস্কৃতির নানা দিকের প্রসঙ্গ এসেছে।

**বন্দনা:** কাব্যের শুরুতেই আল্লাহ, রসুলের প্রতি শ্রদ্ধাঙ্গাপন করেছেন।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছর্ল্লা আলেহে ছর্লাম।

বিছমিল্লা হেররাহ মানের রহিম।।

করিম রহিম পাক পরবর দেগার।

রছুলের নাম কিছু করিব প্রচার।। (পৃ.৫৫)



নামাজ-কালাম প্রসঙ্গ: মুসলমানদের মধ্যে নামাজ পড়ার যে প্রথা সেই সম্পর্কে জানা যায়।

একচিত্তে উফাতনামা সোনে যে সত্তরে।  
পড়িবেক নামাজ তার দিন পএগাম্বরে।।  
জেই সব য়ুনিবেক কহিব কালাম। (পৃ.৫৫)

চাঁদের উল্লেখ: সফরের চন্দের বর্ণনা পাওয়া যায়।

সফরের চান্দে জহমত হইল আমার।  
রবিত্তল আউলে জাব ইলাহির দরবার।। (পৃ.৫৬)

### ঘ. নীতশাস্ত্রমূলক রচনা ও সংস্কৃতি

ফকির বিলাস: সংস্কৃতির নানাদিক

মরহুম এনাতুল্লাহ সরকার রচিত এই কাব্যটি মারফতি সওয়াল জওয়াব বিষয়ক। এখানে আল্লাহর গুণগান, কোরানের কথা, মুরশিদ-মুরিদ কথোপকথন, হকিকতের কথা, বেহেস্ত-দোজখ প্রসঙ্গ এবং মানব শরীরের নিগুঢ় তত্ত্বকথা বর্ণিত হয়েছে কবির লেখনীতে।

নারীর গর্ভধারণ: সন্তান প্রসবের আগে নারীর গর্ভধারণের দশ মাসের সুন্দর বিবরণ তুলে ধরেছেন।

এক দিনের হইলে বিন্দু শিয়রে যন টলে।।  
দুই দিন হইলে বিন্দু রঙ্গ সঙ্গে মিলে।  
তিন দিনের হইলে বিন্দু ফনার আকার।।  
চার দিনের হইলে বিন্দু দেহের সপ্তগর।  
পঞ্চ দিন হইলে কাজলের প্রায়।।  
ছয় দিনের রঙ্গ ধরে শোনহে তাহায়।  
সাত দিত হইলে বিন্দু শরীরের মহড়া।।  
আট দিন হইলে শরীর হাড়ে মাংসা জোড়া। (পৃ.৪)

স্বর্গ-মর্ত্য প্রসঙ্গ: স্বর্গ ও মর্ত্যের বিস্তারিত বিবরণ এখানে তুলে ধরেছেন।

## ছহি আবুসামা: সংস্কৃতির নানাদিক

জয়নাল আবেদীন এই কাব্যের মধ্যে ইসলামি নীতিশাস্ত্রের কথাকে বিশেষমাত্রায় তুলে ধরেছেন। ইসলামি বিচার-ব্যবস্থার অনেক দিক যেমন স্পষ্ট হয়েছে অন্যদিকে ইসলামি সংস্কৃতিক নানাদিক আলোচনায় এসেছে।

**কোরাণ পাঠ:** আবশ্যামা যেভাবে কোরান পাঠ করে-

সামনে রাখিয়া কোরান করিয়া সালাম।।  
পহেলা বিছমিল্লা পরি পড়ে আলেফলাম।  
ধীরে ধীরে কোরান পড়িল এক ছাফা।। (পৃ.২)

**ইসলামি নীতিতে শাস্তির স্বরূপ:** আবুশামা অন্যায়ের শাস্তি পেয়েছে ইসলামি বিচার-ব্যবস্থার শাস্ত্রকথা অনুযায়ী।

কাজি কহে সবে মেরা শুনহ ফরমান।  
আবুশামার এনছাফ কর দেখিয়া কোরান।  
এতেক হুকুম যখন মোল্লারা পাইল।।  
চারি শত মোল্লা তখন কোরান খুলিল।  
একশত দোররা গুণে মার এর গায়।। (পৃ.১৩-১৪)

## ছহি বড় ছায়েত নামা: সংস্কৃতির নানাদিক

আবদুল ওয়াহাব ফারসি গ্রন্থ থেকে বাংলাতে অনুবাদ করেছেন এই কাব্যটি। মানুষ নানারকম সংস্কার নিয়ে জীবনধারণ করে, সেখান থেকেই বহু বিচিত্র তথ্যের সন্ধান মেলে। এই কাব্যে তেমনই কিছুটা সংস্কারকেন্দ্রিক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

**চাঁদ বা চন্দ্র প্রসঙ্গ:** চাঁদের বিভিন্ন সুফল এবং কুফল সম্পর্কে জানা যায়।

পহেলা মহরমের চান্দ যে দিন উঠিবে।।  
চান্দ দেখে সোনা দেখা ছওয়াব জানিবে।  
মহরমের চান্দে ঘর যে জন বানাবে।।  
সেই ঘর তারে খুব সাজাগারি হবে। (পৃ.২)

দাঁড়কাক ডাকার প্রসঙ্গ: সামাজিক জীবনে মানুষের মধ্যে বেশকিছু নীতি প্রচলিত আছে। এই কাব্যে দাঁড়কাক ডাকার মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবনে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে।

পহেলা পহর কাক পূর্বেতে ডাকিলে।।  
মকছেদ হাছেল হবে জানিবে সকলে।  
দক্ষিণে ডাকিলে খুসির খবর পাইবে।।  
পশ্চিমে ডাকিলে রুজি জেয়াদা বাড়িবে।  
উত্তরে ডাকিলে তার দুশ্মন বাড়িবে।।(পৃ.২৩)

হাঁচির শব্দ: সামাজিক বিধিনিষেধের চিত্র।

কোন কর্ম শুরু কিম্বা যাইতে ছফরে।।  
হাদছ হইলে বাধা হইবারে পারে। (পৃ.২৭)

টিকটিকির আওয়াজ: এই সমস্ত বর্ণনা থেকে মানুষের আচার-আচরণ ও তাঁদের মধ্যকার সংস্কারের কথা জানা যায়।

টিকটিকি কাহার যদি পূর্ব দিকে ডাকে।।  
খুসির খবর কিছু পৌঁছবে তাহাকে।  
আগুনে পুড়িবে ঘর দক্ষিণে ডাকিলে।। (পৃ.২৭)

রাশি ফল: রাশি গণনার মধ্যে দিয়ে ভালো-মন্দের কথা জানতে পারি। মেঘ রাশির নারীরা কেমন সেই কথা উঠে এসেছে।

শুন সবে মেঘ রাশি আওরতের হাল।  
চক্ষু কাল মাজা ক্ষীণ ছেড়ে লম্বা চুল।  
হাছিন আওরত জান হয় সে নাজনী।।  
বাহার দেখিতে হয় তাহার পেশানি।  
মিঠা মিঠা কথা কহে সকলের সাথে।। (পৃ.৪০)

এই কাব্যে বহু রকম দোয়ার কথা উল্লেখিত আছে। বিমারির দোওয়া, চোর ধরার দোওয়া ইত্যাদি। এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আসলে ইসলামি শাস্ত্রকথাকে তুলে ধরা হয়েছে।

## ছহী তেলেছমাত ছোলেমানী: সংস্কৃতির নানাদিক

এই কাব্যে নবিজির জন্মকথা এবং ইসলামি বিবিধ নীতি-শাস্ত্রের কথা জানতে পারি। এছাড়া রোগ নিরাময়ের বহু সুফল সম্পর্কে টোটকার উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রাম্য চিকিৎসা বিদ্যার ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে এই কাব্যে।

## মৌলদ দীল পিজির: সংস্কৃতিক নানাদিক

মাওলানা নুরুল ইসলাম এই কাব্যে ইসলামিক বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। মিলাদের কথা (ইসলামিক সভা), দরুদ শরিফ পাঠ করলে কি হয়, গজলের উল্লেখ করেছেন। গজল মুসলমানদের কাছে গানের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত, গজল গানের ভিতর দিয়ে মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রচার ও ধর্ম-শাস্ত্রের নানা অনুষ্ঙ্গ পেশ করা হয়।

নাতে আহম্মাদ ম্যায় কারু কিয়া মেরাবেতবা কিয়া হয়।।

আফছ খালেকাহি জো ফারমায়ে তু বান্দাহ কেয়া হয়।

জালোয়া নুর নাবিসে মেরি সায়েরি হোয়ায়ে।।

মালেফোল মউত সে কাহদোকে তাকাজা কেয়া হয়। (হিন্দি  
গজল) (পৃ.৮)

## ঙ. পীরকেন্দ্রিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি

### গীত মদন গুড়িয়া: সংস্কৃতির নানাদিক

গরীব তৈয়ব রচিত এই পুথিটি সত্যপীরের কাহিনি নিয়ে রচিত। এখানে কাব্য বর্ণনায় লেখকের মুসিয়ানায় উভয়ধর্মের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার কথা উঠে এসেছে। কিভাবে মানুষের মধ্যে মিলনের সেতু তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই কাব্যের পাঠ নিলে বোঝা যায়। মুসলমান রচনাকারের লেখনীতে উভয় সংস্কৃতির কথা ফুটে উঠেছে।

**বন্দনা:** আল্লাহতালার কাছে ভক্তি নিবেদন করে কাব্য রচনা করেছেন।

আল্লার কউসে এখন নোঙাঐঃঐঃ মাথা। (পৃ.১৬৪)

**বসার উপকরণ:** মদন নিজে প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক, তাঁর স্ত্রীর জীবনধারণে বিলাসিতার চিত্র ধরা পড়ে।

গুড়িআ বসিএগা আছে পালঙ্গ ওপরে।

সোনা রূপার ভাঁড়ি হাতে বিকীকীনি করে।

তকব্বরি করে আছে পালঙ্গ ওপরে। (পৃ.১৬৪)

**নারীর রূপ বর্ণনা:** মধ্যযুগের বেশিরভাগ কবির কাব্যেই নারীর রূপের আলোচনা পাওয়া যায়।

রত্নাবতি নাম তার পরম সুন্দরি।

রূপে গুণে অনুপাম জেন মঞ্জদরি।। (পৃ.১৬৫)

**ভিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি:** দুস্থ মানুষজন আজও ভিক্ষা করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

এই কাব্যে সত্যপীর মদনের গৃহে ভিক্ষার থলি নিয়ে হাজির হয়, রত্নাবতি ফকিরকে ভিক্ষা দেয়।

একমুঠা চালু কন্যা আঁচলে করিএগা।

ফকীরের কাছে কন্যা খাড়া হৈল জেএগা।।

ছাল্লাম করিএগা কন্যা বলেন ধিরে ধিরে।

চালুগুলি নিএগা ছাহেব দোআ কর মোরে।। (পৃ.১৬৫)

**হেঁসেল ঘরের বর্ণনা:** কাব্য রচনা করতে গিয়ে সাহিত্যিকরা যে শুধুমাত্র নায়ক-নায়িকার চিত্রই অঙ্কন করেছেন এমন নয়, একদম আপামর বাঙালির রান্নাঘর থেকে শুরু করে সর্বত্রই তাঁরা কলম চালিয়েছেন। এখানে আমরা সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের রান্নাঘরের বর্ণনা পাচ্ছি।

রত্নাবতি বলে প্রভু য়ুন মোন দিএগা।

কোথা পাব ভাত আমি তোমার লাগিএগা।।

সোভার দুসমোন আমি হাঁড়ি নৈ হাতে।

কদাচিত নাই পাইএ হেঁসেলঘর জেতে।। (পৃ.১৬৫)

**সাধারণ গৃহবধূর জীবনযাত্রা:** রত্নাবতি পুকুরঘাটে জল ভরতে যায় এবং সেখানে ফকিরের সঙ্গে দেখা হয়। সাধারণ বাড়ির গৃহবধূদের পুকুরে জল ভরার চিত্র উঠে এসেছে।

রত্নাবতি কলসি লএগা ঘরে চলে এল।।

ননদিনি ঘরকে জেএগা বলে দৌড়াদৌড়ি। (পৃ.১৬৫)

**পুরুষের জীবিকা:** দূরদেশে বাণিজ্যযাত্রা সেই যুগের পুরুষের জীবিকা ধারণের উপায় ছিল। ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যের কথা আমরা জানতে পারি। এই কাব্যেও তা ব্যতিক্রম নয়।

জানকী বলিঞা তার ছোট বেটার নাম।।  
ঘরে নাই ছিল সেই দুর দেশান্তরে।  
বলদ নিঞা গেলিছিল বানিজের তরে।। (পৃ.১৬৬)

**পুরুষের বহুবিবাহ:** জানকীর পিতা নিজের পুত্রের পুনরায় বিবাহের কথা জানায়, আসলে এই বহুবিবাহের মধ্যে দিয়ে সমাজে নারীদের অবহেলিত হওয়ার চিত্র ধরা পড়ে।

কী ভাবিছ বাছা কী ভাবিছ তুমি।  
হুকুমেতে তোমার বিভা দিঞা আনিব আমি।। (পৃ.১৬৬)

**বনবাস প্রসঙ্গ:** রত্নাবতিকে তাঁর পরিবার অন্যায়ের শাস্তিস্বরূপ বনবাসে দেওয়ার কথা বলে। এই দৃশ্য আমাদের ‘রামায়ণ’ এর সীতা চরিত্রকে মনে করায়। আসলে সেই সময়ে নারীদের শাস্তির জন্য গভীর অরণ্যে বনবাস দেওয়ার চল ছিল, সেই পন্থা কবিও অবলম্বন করেছেন। মুসলমান সাহিত্যিক হয়েও হিন্দু কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

মদন বলেন বাছা ছাড় বছর আষ।  
এই ঘড়ি ছোড়িকে নিঞা দে গা বোনবাস।। (পৃ.১৬৭)

**নারীর গর্ভধারণ:** নারীর সন্তান প্রসবের কথা সব কাব্যেই কম-বেশি বর্ণিত আছে।

মাত্র একটি বাক্য আছে ধরি তুণ্ডা পায়।  
তিন মাসের গর্ভ আছে আমার গায়ে।। (পৃ.১৭০)

**আত্মীয়-পরিজনের কথা:** এই কাব্যে আত্মীয়-পরিজন, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কথা উঠে এসেছে।

গ্যাতি কুটুম্ব সব বলিছে ধিরে ধিরে।  
দোচারিনি কন্নায় কেমনে নিবে ঘরে।। (পৃ.১৭৬)

নারীর স্নান প্রসঙ্গ: মেয়েদের গঙ্গায় স্নান প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন এখানে।

জানবি গঙ্গার জলে সির্নান করিল।

সির্নান করিঞা কন্যার অঙ্গে যুতি হৈল।। (পৃ.১৭৬)

নারীর সতীত্বের কথা: মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীদের বহু ত্যাগের কথা যেমন উঠে আসে, পাশাপাশি নারীদের কোনরকম অন্যায়ের জন্য সতীত্বের পরীক্ষার কথাও জানা যায়। এই কাব্যে রত্নাবতি নিজের সতীত্বের পরীক্ষা দেয়, অগ্নিপারীক্ষার মধ্যে দিয়ে।

পরিক্ষা দাও জদী দসের বরাবরে।

তবে ত খালাস পাবে নিঞা জাব ঘরে।।

যুনিঞা কন্যার ভয় নাই মোনে।

কহিতে লাগিল কন্যা দসের বিধ্বর্জনে।।

কোন পরিক্ষ্যা নিবে যুধাও গা দসেরে।

সেই পরিক্ষ্যা দিব আমি দষ বরাবরে।। (পৃ.১৭৬)

### সত্যনারায়ণের পুথি: সংস্কৃতির নানাদিক

মুসলমান সাহিত্যিকদের পাশাপাশি হিন্দু সাহিত্যিক রচিত কাব্যের দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। একই সময়ে দুই শ্রেণির সাহিত্যিকদের রচনারীতিতে কি ধরনের পার্থক্য এসেছে তা লক্ষণীয়। শ্রীকবিবল্লভ বিরচিত ‘সত্যনারায়ণের পুথি’তে হিন্দু সংস্কৃতি ছাড়া ইসলামি সংস্কৃতির বেশ কিছু ছাপ পড়েছে।

বন্দনা: হিন্দু সাহিত্যিকদের কাব্য রচনায় বহু দেব-দেবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় যেমন আল্লাহর মহিমা প্রকাশ পেয়েছে এখানে ভিন্নরূপ। কাব্য শুরুর আগেই কবি রাধা-কৃষ্ণকে স্মরণ করেছেন।

নারীর অলঙ্কার: মেয়েদের হাতের অলংকার হিসাবে কঙ্কণ এর উল্লেখ আছে।

সুমতি কহেন আপনার প্রাণনাথে।

কনক কঙ্কণ আন্যা দিবে মোর হাথে।। (পৃ.১)

নামাজ পড়ার রীতি: হিন্দু সাহিত্যিক হয়েও তাঁর কাব্যের বর্ণনায় মুসলমান রীতি-নীতিগুলো সুন্দরভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা রেখেছেন।

মৃগছাল পানির উপরে ডাল্যা দিয়া।

চারি ফকির নিমাজ করে পশ্চিমমুখ হয়্যা।। (পৃ.২)

**পুরুষের জীবিকা:** পুরুষদের বহুদেশে সওদাগিরি করার পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্যের কথা জানা যাচ্ছে।

সাধু বলে উওর দেশেতে ঘর করি।

সদা করি সদাগর কারে নাহি ডরি।।

প্রিত হইলে ব্যবসা করিব এইখানে।

নতুবা চলিয়া আমি জাব অন্য স্থানে।। (পৃ.৪)

**খাদ্য প্রসঙ্গ:** কবির বর্ণনায় বাঙ্গাল জাতির খুদ (চালের ছোট দানা ভাজা) খাওয়ার কথা জানা যাচ্ছে।

আর বাঙ্গাল কান্দে হাথ মারিয়া কপালে।

খুদ খাবার মালা মোর ভাস্যা গেল জলে।। (পৃ.৬)

**নারীর গঙ্গাস্নান:** স্বামীর মঙ্গলার্থে স্ত্রীগণ গঙ্গাস্নান করে পূজো করে এছাড়া হিন্দু রমণীগণ কোন শুভ কাজের প্রারম্ভে এই স্নান করে।

গঙ্গাস্নান করি নিত্য পুজে পষুপতি।। (পৃ.৭)

**সামাজিক তিরস্কার:** সত্যপীর শুধুমাত্র মুসলমান সমাজে নয় হিন্দু সমাজেও তাঁর প্রতিপত্তি স্থাপন করতে চাই। এই কাব্যে হিন্দু নারীর জবানীতে পীরের তিরস্কারের কথা উঠে এসেছে।

কোথাকার ফকির দেখ ছেগা কাঁথা গায়।

পীরের সিরিনি দিয়া জাতি নিতে চায়।।

কালাম কিতাব কোন কালে নাহি সুনি।

গন্ধবনিক হয়্যা হব মুছলমানি।। (পৃ.১০)

**বিবাহ রীতি:** রাজকন্যা কুন্তলার বিবাহ উপলক্ষে সয়ম্বর সভার আয়োজন করা হয়।

কুন্তলা নামেতে কন্যা রাজার কুমারী।।

ইচ্ছাবতি হব কন্যা করিব সয়ম্বর। (পৃ.১৪)



**রক্ষন প্রণালী:** সাধারণ গৃহস্থ ঘরে রান্নার কথা উঠে এসেছে।

এত যুক্তি করি ত্বারা জায় দুই জন।

সিঁহগতি গৃহে গিয়া করিল রক্ষন।।

হেম থালে মদনে ভোজন করাইয়া। (পৃ.১৫)

**নারীর সাজসজ্জা:** মেয়েরা নানা ধরনের শাড়ি ব্যবহার করেছে সাজসজ্জার জন্য।

তৎকাল চল ভাই বিভা দেখিবারে।।

আচমন করি দুহে পরি পাট সাড়ি। (পৃ.১৫)

**পুরুষের পোশাক:** পুরুষের ধুতি পড়ে বিয়ে করা এখানে হিন্দু সংস্কৃতির ছাপ এসেছে।

নৃপতি দিলেন তারে পণ দসের ধুতি।।

পুষ্পের ছামনি করি গেলা বাসঘরে। (পৃ.৩৯)

**পুরোহিত প্রসঙ্গ:** কুন্তলার বিবাহে সত্যনারায়ণ রাজপুরোহিতের রূপ ধরে। হিন্দু ধর্মে সত্যনারায়ণ পুরোহিত রূপে হাজির হয় অন্যদিকে মুসলমান সমাজে সত্যপীর মানুষের কৃপা করতে ফকিরবেশে উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণ না দেখিয়া জেন ভাবেন রুক্ষিণী।।

কন্যার একীদা জানি সত্যনারায়ণ।

রাজপুরোহিত রূপ ধরেন তখন।। (পৃ.১৭)

**বিনোদন:** এই কাব্যে পাশা খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজকন্যা পাসা খেলে প্রাণনাথ সনে।

কপাট-নিয়ড়ে দাসী হাসে মনে মনে।। (পৃ.২৫)

**খাদ্য পরিবেশনের চিত্র:** শুধুমাত্র গল্পের প্লট নির্মাণেই প্রত্যেক সাহিত্যিক দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন তা নয়, সমসাময়িক সামাজিক অবস্থানের কথাকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবন জড়িয়ে থাকার নানা অনুষ্ণের কথা বিভিন্ন কাব্যে এসেছে। এই কাব্যে মদনকে কিভাবে খাবার পরিবেশন করা হয়েছে তার চিত্র লেখায় এসেছে।

সুবর্ণথালায় অন্ন দিলেন বাড়িয়া।।

আনন্দে বসিঞা সিম্বু করেন ভোজন। (পৃ.৪২)

## গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথী: সংস্কৃতির নানাদিক

আবদুর রহিম রচিত কাব্যে পীরদের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে তদপ্রসঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতির কথাও উঠে এসেছে। এই পীরদের গল্প বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আসলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের মিলনের কথা প্রকাশ করেছেন। কাব্যের শুরুতেই আল্লাহ এবং নবির (রসুল) বন্দনা করেছেন, এরপর কাহিনি অংশের অবতারণা করেছেন।

**শিকার যাত্রা:** অজুপার পুত্র জুলহাসের শিকারে যাওয়ার কথা জানা যাচ্ছে।

দিনে দিনে এই পুত্র বাড়িতে লাগিল।।

দ্বাদশ অব্দের জবে বয়েস হইল।

এক দিন চলিলেন করিতে শিকার।।

লইয়া অনেক লোক সাতে আপনার।(পৃ.২)

**নারীর সাধভক্ষণ প্রসঙ্গ:** মধ্যযুগের কাব্যে নারীদের সাধভক্ষণের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। নারীদের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ কথা সাহিত্যিকদের রচনায় উঠে এসেছে। এই কাব্যে দ্বিতীয়বার সন্তান কামনায় অজুপা পুনরায় গর্ভবতী হয় এবং তাঁর গর্ভকালীন অবস্থায় সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানের কথা কবির বর্ণনায় এসেছে। মূলত সাতমাস গর্ভকালীন অবস্থায় এই অনুষ্ঠান হয়। হিন্দু সমাজে এই রীতি বিদ্যমান, এখানে হিন্দু কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাব্যের উৎকর্ষতা বাড়ানোর জন্য এই উল্লেখ।

সপ্তম মাসেতে সতি অজুপা সুন্দরী।

নানা ইতি মিষ্ট দ্রব্য করেন ভক্ষন।।

মিষ্ট দ্রব্য আশ্বাদন লাগে কি কখন।

ঘন ঘন হাই আর মুখে উঠে জল।।

খাইতে অধিক সাধ ঠিকরী অম্বল।

হইলেন পাণ্ড বর্ণ নিব্বল সরীর।।

হেলিয়া পড়িল কূচ হৈয়া কালসির।

উদর বাড়িল অতি অসক্তি চলন।। (পৃ.৫)

**পুরুষের পোশাক:** গাজি পীর এই কাব্যে একজন চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, গৃহত্যাগ করার সময় তাঁর পরিহিত পোশাকের বর্ণনা এখানে পাওয়া যায়। পায়ে সোনার খরম জুতো পরেছে।<sup>২৩</sup>

শোনার জিঞ্জির দিয়া কোমর বাঞ্চিল।।

সুবর্ণের আসা আর হাতেতে লইল।

পায়েতে দিলেন গাজি খরম শোনার।।

কান্দেতে লইল ঝোলা হাতে মালা আর। (পৃ.৯১০)

**দেব-দেবী প্রসঙ্গ:** এই কাব্যের বর্ণনায় হিন্দু দেব-দেবীর কথা এসেছে, এঁর থেকে কবির উদার মনস্কতার পরিচয় মেলে। হিন্দু দেব-দেবীর সঙ্গে গাজি পীরের সম্পর্কের কথা জানা যায়। আসলে পীরদের মধ্যে সর্বশক্তি বিরাজমান তাঁদের সর্বরূপে প্রকাশ।

**যবনকে তিরস্কার:** ছাপাই নগরের রাজা শ্রীরাম যবনকে তিরস্কার করে, তাঁর প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেয়। এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ যাঁরা মুসলমানকে অসম্মান করে তাঁদের কথা উঠে এসেছে। বঙ্গদেশের সামাজিক চিত্রপটেও এই ছবি ছিল, যবন দেখলেই তাঁর প্রতি অশ্লীল আচরণ। এই কাব্যেও তা স্পষ্ট। ‘যবন’ সম্পর্কিত এই কথাটিকে ঘিরে বহু আলোচনার পরিসর তৈরি হয়েছে।<sup>২৪</sup>

হেন কালে গাজি কালু দুই পীর গিয়া।।

খাড়া হৈল লাএলাহা জিকির করিয়া।

রাজা বলে দূর দূর কোথারে কোটাল।।

আসিল জবন দেখ তুরায় নিকাল। (পৃ.১৪)

**জ্যোতিষ প্রসঙ্গ:** হিন্দু বাড়িতে মূলত জ্যোতিষের আগমন থাকে, এখানেও শ্রীরাম রাজার অন্তপুরীতে জ্যোতিষ আসে। এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে কবির পান্ডিত্য এবং উদার সমাজ মনস্কতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

অন্তস্পুরে গিয়া দেখে নাহি রাজরাণী।।

চিল্লাইয়া কান্দে রাজা সিরে হাত হানি।

তুরায় জ্যোতিষ এক তখনি আনিয়া।।

আজ্ঞা দিল জ্যোতিষেরে দেখহ গনিয়া। (পৃ.১৫)

**হিন্দুদের কলেমা পাঠ:** পীরদের কাছে হিন্দুরা বশ্যতা স্বীকার করে কলেমা পাঠের মধ্যে দিয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। আসলে পীরের কৃপায় তাঁরা উপকৃত হয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে উভয়ধর্মের মিলনের দিকটি প্রকট হয়েছে।

শুনিয়া শ্রীরাম রাজা স্বীকার করিল।।

তবেত কলেমা গাজি পড়াইয়া দিল।

পাত্র মিত্র গণ সকলি আসিয়া।।

কলেমা পড়িল হাতে গাজির ধরিয়া। (পৃ.১৬)

অন্যদিকে গাজিকে স্বামী হিসাবে পেতে চাম্পাবতীও কলেমা পাঠ শিখে নিচ্ছে।

আসন জিকির গাজি সব শিখাইল।।

চারিটা কলেমা আর পড়াইয়া দিল। (পৃ.৩১)

**খাদ্য প্রসঙ্গ:** হিন্দুশাস্ত্রে গরু দেবতা হিসাবে পূজিত হয়। কিন্তু মুসলমানদের গোমাংস খাওয়ার কথা জানা যাচ্ছে।

যদি বাত মিথ্যা বলি গোমাংস খাই। (পৃ.২৬)

**রামায়ণ কথা:** কবি হিন্দু কবির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং রামায়ণের গল্পের সাহায্য নিয়েছেন।

বিচিত্র নগর দেখে ঘর সারি সারি।।

যেমন লঙ্কাতে ছিল রাবনের পুরি। (পৃ.২১)

**সামাজিক রীতি:** হিন্দু-মুসলিম বিবাহ রীতি সমাজে আজও সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে বিপরীত ধর্মাবলম্বী হলেও বিবাহ সূত্রে অনেকেই আবদ্ধ হয়েছেন। গাজি ও চাম্পার বিবাহ সূত্রে এই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

আমিতো ব্রাহ্মন জাতি সে হয় জবন।

তার সাথে বিয়া মোর কেমনে হইবে।। (পৃ.৩০)

**স্নানযাত্রা:** মধ্যযুগের অনেক কবির কাব্যে স্নানযাত্রা প্রসঙ্গ এক বিরাট ভাবনার ফসল। পুরুষদের স্নানযাত্রার কথা জানতে পারি 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে কিন্তু এই কাব্যে কবি

চাম্পাবতী এবং তাঁর সখীদের স্নানযাত্রার কথা তুলে ধরেছেন। নারীদের স্নানযাত্রা  
কিরকম তা এখানে জানা যায়।

তবে সতী চাম্পাবতী চলিল তখন।।  
পঞ্চ দাসী সাথে চলে মামী নয় জন।  
সাত ভাই বধু চলে হাসিতে হাসিতে।।  
বালিকা সকল চলে নাচিতে নাচিতে।  
পাড়ার পরসী আর যত নারী গণ।।  
সাজিয়া চাম্পার সাথে করিল গমন।  
কেহত লইছে হাতে সুবর্ণের ঝারি।।  
শুগন্ধি ফুলের তৈল তাথে ভরি ভরি।  
শোনার কলশী কক্ষে হেলাইয়া বুক।।  
চলিয়াছে রামাগণ করিয়া কৌতুক।  
গজের গমনে কেহ ধর্য্য রূপে যায়।।  
খঞ্জনের মত কেহ চরন চলায়।  
কেহত চলিয়া যায় হেলিয়া তুলিয়া।।  
একেবারে পরে যেন আট খান হৈয়া।  
দৌড় দিয়া চলে কেহ কেহ ধীরে ধীরে।।  
ঘুমটা কাহার মাথে কেহ লাঙ্গা সিরে।  
লোটন বান্ধিছে কেহ কার কেশ খোলা।। (পৃ.৪০-৪১)

**নারীদের সামাজিক রীতি-নীতি:** নারীদের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যার প্রতিফলন  
তাঁদের জীবনযাত্রায় ফুটে ওঠে, এই কাব্যে চম্পাবতীর মামীদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।  
সেই নারীগণ গাজিকে থেকে লজ্জায় মাথায় ঘোমটা দেয়, জামাইকে সম্মান দিতে এই  
পন্থা অবলম্বন করে।

ছিটাইয়া দেয় জল গাজির দিগেতে।  
জিহ্বাতে কামোড় দিল মামীরা দেখিয়া।।  
পিছ দিয়া দাড়াইল ঘুমটা টানিয়া। (পৃ.৫১)

**নারীর স্নান পদ্ধতি:** চাম্পাবতীর স্নানের সুন্দর বর্ণনা করেছেন, মধ্যযুগের কবিদের রচনায় এই ধরনের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নারীদের জীবনযাত্রার ছাপ যেমন পাই ঠিক তেমনই একদম গার্হস্থ্য জীবনের কথাকে যেন কবির কাব্যে প্রাধান্য দিয়েছেন।

হাত মাজে পদ মাজে মাজে আর মুখ।।  
গাজিকে দেখায়ে মাজে কুচ আর বুক।  
কবরি খুলিয়া কেশ দিল আউলাইয়া।।  
কাল মেঘে চন্দ্র যেন ফেলিল ঢাকিয়া।  
কালী হৈতে কাল কেশ উড়ায় বাতাসে।।  
গাজি দিগে চায় রামা হাত দিয়া কেশে।  
লোটন বান্ধিতে কেশ যখন ঝাড়িল।।  
সিলা বৃষ্টি গগণেতে যেমন গর্জিল। (পৃ.৫১)

**পূজা প্রসঙ্গ:** হিন্দু নারীর মন্দিরে গিয়ে দেবতা আরাধনার কথা উঠে এসেছে।

চাম্পাবতী চলে গেল চণ্ডির মন্দিরে।  
ভিজা পরিধানে বস্ত্রে ঝাড়ু তাখে দিল।।  
পুজার সামিগ্রী সব দাসীরা আনিল।  
আতব তণ্ডুল ধূপ ঘৃত কলা চিনি।। (পৃ.৫২)

**নারীর পেশা:** এই কাব্যে নারীকে পাটুনি রূপে দেখা যাচ্ছে, নদী পারাপারের কাজের সঙ্গে যিনি যুক্ত। কালুকে ঘাট পাড় করে দিতে পাটুনি সোনার একশ কড়ি মূল্য হিসাবে ধার্য করে। পাটুনি প্রসঙ্গ ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের ঈশ্বরী পাটুনির কথাকে মনে কড়ায়।<sup>২৫</sup> এখানে কবির মানসিকতায় সর্ব ধর্মের ধারণা গেঁথে থেকেছে।

খেত্তা ঘাটে গিয়া কালু পৌছিল তুরায়।।  
ছিরা ডরা ছিল দুই পাটনী তথায়।  
কহিতে লাগিল কালু পাটনীর তরে।  
নদী পার করি দেহ জাইব সেপারে। (পৃ.৫৪)

**দক্ষিণ রায়ের পূজা:** দক্ষিণ রায় বলতে বাঘের দেবতাকে বুঝিয়েছেন। এই কাব্যে দক্ষিণ রায় পূজিত হচ্ছে। আসলে হিন্দু সমাজে এই দেবতার কদর ছিল অনেকখানি। কাব্য

বর্ণনায় ধর্ম সমন্বয়ের কথা বোঝাতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। দক্ষিণ রায়ের পূজোর যে নৈবদ্য তার চিত্র কাব্য বর্ণনায় সুন্দরভাবে এসেছে।

হইবে দক্ষিণ রায় তুষ্টিতে যাহাতে।  
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি কলা নারিকেল।।  
সসা বাঙ্গি আনারশ যত ইতি ফল।  
মইস ছাগল মৃগ কবুতর হংস।। (পৃ.৬৪)

দক্ষিণ রায়ের প্রসঙ্গ কৃষ্ণরাম দাস বিরচিত 'রায়মঙ্গল' কাব্যেও উল্লিখিত হয়েছে। এখানে কবি দেখিয়েছেন দক্ষিণ রায় এর পাশাপাশি হিন্দুগণ গাজি পীরের পূজা প্রচার করেছেন।

**পুরুষের সাজসজ্জা:** গাজির বিয়ের মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজের আচার-রীতি জানা যায়। পুরুষের সাজসজ্জায় নানারকম সুগন্ধি, প্রসাধনীর উল্লেখ আছে।

প্রথমে সাজায় সবে সাহেব গাজিরে আনিয়া সুগন্ধি তৈল দিল অঙ্গ পরে।  
আতর গোলাপ চুয়া কস্তুরি কুমকুম।।  
আর কত পুষ্প তৈল উত্তম উত্তম।  
মানিক্য বসন পরে অঙ্গে পরাইল।।  
কোটি শশী যিনি গাজি সাজিয়া বসিল। (পৃ.৭৯)

**নারীর সাজসজ্জা:** পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সাজসজ্জার চিত্র ফুটে ওঠে।

অন্তঃপুরে রামা গণ সাজায় চাম্পারে।।  
প্রথমে হরিদ্রা তৈল দিল অঙ্গ পরে।  
গোলাবের জল দিয়া স্নান করাইয়া।।  
দিলেন সুগন্ধি তৈল পশ্চাতে মাথিয়া।  
উচ্চ করে বান্দিলেক মস্তকে লোটন।।  
তাহাতে গাঁথিয়া দিল সেউতি রঙ্গন।  
পরাইল কত আর রত্ন অলঙ্কার।। (পৃ.৭৯)

এছাড়া নারীরা বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহারে নিজেদের সাজিয়ে তুলেছে।

চক্ষেতে কাজল কার কপালে সিন্দুর।।  
চরনে দিয়াছে কেহ শোনার নেপূর।

রত্ন অলঙ্কার জ্বলে অঙ্গেতে সবার।।

পরিছে পাটেলা সাড়ি মরি কি বাহার। (পৃ.৪৯)

**বিবাহ আচার-অনুষ্ঠান:** গাজি ও চাম্পাবতী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। মুসলিম নিয়মের পাশাপাশি হিন্দু আচার-রীতির উল্লেখও এসেছে। কবুল, শুভদৃষ্টি এই আচার রীতির মধ্যে দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

হরসিতে চাম্পাবতী বসিল সাজিয়া।।

হেন কালে কালু সাহা সময় বুঝিয়া।

তুরিত উকিল সাক্ষি পাঠাইয়া দিল।।

উকিলের কাছে চাম্পা কবুল করিল।

পশ্চাতে সাহেব গাজি করিল স্বীকার।।

বিবাহ বন্ধন দড় হইল দোহার।(পৃ.৭৯)

হিন্দুদের বিবাহের নিয়ম মেনেই গাজি-চাম্পার শুভদৃষ্টি হয়।

পশ্চাতে চাম্পার কাছে তাহারা বসিয়া।।

দেখায় চাম্পার মুখ ঘুমটা খুলিয়া।

গাজি চাম্পা চারি চক্ষু যখন হইল।।

চক্ষু মেলি চক্ষু চক্ষু চাইয়া রহিল।

হইলেন মত্ত দুই দুয়ের রূপেতে।।

বধু গণে উপহাস লাগিল করিতে। (পৃ.৮০)

পীরকেন্দ্রিক কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে মুসলমান সাহিত্যিকরা সংস্কৃতির মেলবন্ধনের দিকটি স্পষ্ট করে তুলেছেন। প্রতিটি কাব্যের বর্ণনা অংশে উভয়সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে যা সাংস্কৃতিকভাবে হিন্দু-মুসলমান দুই জাতিকে একত্রিত করে তুলেছে।

## চ. কিসসা/কেছা সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ছহি নেক বিবির কেছা: সংস্কৃতির নানাদিক

শেখ কামরুদ্দিন রচিত এই কাব্যে ইসলামি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত অনেক সংস্কৃতির কথা উঠে এসেছে।



**আল্লাহর মহিমা:** মুসলিম ধর্মের অনুরাগীদের হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর আদর্শকে অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ধর্মগ্রন্থ ‘কোরান’ এবং হাদিসকে মেনে নিয়ে জীবনে চলার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তার প্রতি মহিমা প্রচার করেছেন।

আল্লা আল্লা বল বান্দা নবী কর সার ॥  
নবীর কলেমা পড় হয়ে যাবে পার।  
মোহাম্মদী দীন ভাই একিন জানিবে ॥  
নবীর তরিক মতে সকলে চলেবে।  
নবীর তরিক যেই করিবে ইনকার ॥  
হাসর হিসাবে তার নাহিক নিস্তার।  
কোরাণ হাদিছ সবে মানিয়া চলিবে ॥ (পৃ.১)

**স্বামীর প্রতি সেবা:** বিবাহিত নারীদের স্বামীর প্রতি যত্ন নেওয়ার কথা জানা যায়। একজন মুসলিম বিবাহিত নারী স্বামীর আদেশ পালন করতে কতটা কঠোর এখানে তা স্পষ্ট। নিজের স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সামনে যাওয়া ঠিক নয় এবং স্বামীর অনুপস্থিতি ছাড়া ঘরের দরজা না খোলা এগুলো তাঁরা অবলীলায় করেছে। যতদূর মনে হয় সামাজিক প্রচেষ্টায় নারীর অধিকার খর্ব করতে সেই সময়ের কবিরাও বোধহয় কলম ধরেছেন, তাঁদের লেখনীতে এই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

কাঠলিয়া কাঠুরিয়া আইলেন ঘরে।  
দেখিয়া উঠিয়া বিবী দৌড়িয়া যে গেল ॥  
লোটাতে লইয়া পানি হাজের করিল।  
কাঠুরিয়া ফেলিতে বোঝা পাও ধোওয়াইল ॥  
আপনার চুল দিয়া পাও যে পুছাইল।  
খড়ম আনিয়া তবে দিল তরিতরে ॥  
পাটি এক বিছাইল আপনার ঘরে  
বসাইয়া বিছানা পরে পাঞ্জ পরে নিলো হাতে ॥  
করিতে লাগিল পাঞ্জ বিবী নেকজাতে।  
কতক্ষণ বাদে বিবী পাঞ্জ রাখিয়া ॥

রাস আর এক বেত রাখে আনিয়া। (পৃ.৩)

স্বামী বাড়ি ফেরার পর তাঁর সেবায় কিভাবে বিবি নিয়োজিত থেকেছেন তা লক্ষণীয় আরও দেখতে পাচ্ছি নিজের ভুলের শাস্তিস্বরূপ বেত, দড়িও যোগাড় করে রেখেছে। স্বামীর সেবা না করলে তাঁর শাস্তির কথাও বলা আছে এখানে।

খছমের তাবেদারী যেবা নাহি করে।।

বেপক চলিয়া যাবে দোজখ ভিতরে।

আর তার জাত পরে লানত খোদার।।

দুনিয়ার মধ্যে জান খারাবি তাঁহার। (পৃ.১২)

নিজের স্বামীদের অল্পসংস্থানের জন্য বিবির কতখানি আত্মত্যাগ করতে পারে তাও পরিস্ফুট হয়েছে -

রহিমার মাথার চুল লিল যে কাটিয়া।

চুল লিয়া খানা দিল সেই কাফের।।

খানা লিয়া রহিমা বিবী হইল বাহের। (পৃ.২১)

**ব্যবহৃত বসার জায়গা:** বিছানা পেতে বসার বেশ রেওয়াজ ছিল।

পাক হাফবিছানা যে বিছাইয়া দিল।

বিছানাতে বসাইল আপে নেকজাতে।। (পৃ.৩)

**পুরুষের রোজগার পদ্ধতি:** কাঠ সংগ্রহের জন্য পুরুষেরা জঙ্গলের মধ্যে যথাসময়ে প্রবেশ করে।

এতেক বলিয়া গেল কাঠ কাটিবারে।।

কাঠলিয়া কাঠুরিয়া আইলেন ঘরে। (পৃ.৩)

বিদেশে বাণিজ্যের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে-

দহর তাহার গেল করিতে ব্যাপার।

বিদেশেতে গিয়া তার ডুবিল জাহাজ।।

ধনে প্রাণে মারা গেল দরিয়ার মাঝ। (পৃ.১৩)

**নারীদের ধর্মের প্রতি আস্থা:** মুসলিম ঘরের মেয়েদের নামাজ পড়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত।

হামেলা পড়েন কোরান, নামাজ কাজা নাহি দেন। (পৃ.৫)

**ভিক্ষা দেওয়ার রীতি:** বাড়ি বাড়ি ফকিরদের ভিক্ষা দেওয়ার যে রীতি প্রচলিত ছিল।

খানা খেলাইতে ছিল খছমের তরে।  
এমন সময় এক আল্লার ফকির।।  
আসিয়া যে দরজায় দিলেন জিকির।  
বিবী বলে দাঁড়াও বাবা ভিক দেব আমি।।  
খানা খাইছে এখন আমার সওয়ামি।  
একথা শুনিয়া দাতা খাড়া যে রহিল।।  
খানা খেলাইয়া বিবী বাসন ধুতে গেল।  
ঝুটা বাসন ধুইয়া সেই নেক বিবী।।  
তিন লোটা ভাল পানি আনিল সেতাবি।  
তিন লোটা পানি ফেলে দক্ষিণ তরফে।।  
ফকির দেওয়া তাজ্জব হইয়া যে আছে।  
চাউল আনিয়া ভিক ফকিরকে যে দেয়।। (পৃ.৬-৭)

**নেশাদ্রব্য:** পুরুষদের বিভিন্ন রকম নেশাদ্রব্যে আসক্তের কথা এখানে জানা যাচ্ছে।

সওয়ামি আছিল তার বড় নেশাখোর।।  
তামাম নেশাতে সেই থাকিতেন ঘোর।। (পৃ.৯)

**রোগ-ব্যাদি:** মানুষের মধ্যে নানারকম ব্যাদি এবং তার প্রভাবের কথা জানতে পারি।

কলেজা হইল ছিয়া মুগ কালা হৈল।  
জজম বাঙ্গালাতে মহাব্যাদি বলে যারে।।  
সেই বিমার আল্লাপাক দিল নবীজিরে।  
শুয়ে থেকে দিনরাত কাটাইতে ছিল।। (পৃ.৯)

**নারীর পেশা:** মেয়েরা স্বামীর অসুস্থতায় বাইরের কাজ করে, কখনো বা লোকের বাড়ি ভিক্ষা করে স্বামীর আহারের ব্যবস্থা করে।

রহিমা বলেন মাগো বলনা জননী।।  
যাহা মেহনত বলু করিব এখনি।  
গৃহস্থ বলেন ধান আছে আমার ঘরে।।  
ধানকে চাউল করে দেহনা আমারে।

এক কোনকি চাউল দিব মেহনত আনা।।

ঘার লিয়া যেয়ে তুমি পাকাইবে খানা। (পৃ.২০)

**নারীর ব্যবহৃত পোশাক ও অলংকার-প্রসাধনী:** মুসলিম মেয়েদের সাজসজ্জায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রকমের প্রসাধনী এবং অলংকারের কথা জানা যায়। বোরখা ব্যবহার করে, রেশমি কাপড়, বেনারসি শাড়ি পড়ার বেশ চল লক্ষ করার মতো। হাতে মেহেন্দি লাগায় যেকোনো অনুষ্ঠানে। চোখে সুরমা ব্যবহার করে। সোনা ও রূপোর বিভিন্ন অলংকারে নিজেকে সাজিয়ে তোলে।

**সংসারে অভাবের চিত্র:** সাংসারিক জীবন ধারণের মধ্যে অভাব দারিদ্র প্রায় লেগে থেকেছে।

আকালে পড়িয়া বড় হইয়াছি লাচার।

তিনদিন ফাকা থেকে আইনু তোমার ঠাই

মারা যায় বেটা মেরা ভুকেতে এয়ছাই।

কিছু যদি কর্জ দেও খাব পিব মোরা।। (পৃ.১৩)

**নারীর সতীত্ব রক্ষা:** মুসলিম মেয়েদের সতীত্ব রক্ষার ব্যাপারে সচেতনার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

খবর দার গায়ে মেরা নাহি দিবে হাত।

তোমার সাথেতে মেরা ছিল যে কারার।।

যেথা সে নাহি থাকে করিবে বেভার।

পাঁচজন দেখে হেথা শৌন মেরা বাত।।

খবরদার আঙ্গ মেরা নাহি দিবে হাত। (পৃ.১৭)

**রক্ষন পদ্ধতি:** সাধারণ গৃহস্থালি পরিবার জঙ্গলের কাঠ এনে রান্নার জোগাড় করে।

লাকড়ি কুড়াইয়া আনে সেই জঙ্গলের।।

খানা পাকাইয়া দিল নবীজির খাতের। (পৃ.২০)

**বেশ্যাবৃত্তি:** মেয়েদের সম্পর্কে সমাজে নানারকম বদনাম রটেছে। কছবি অর্থাৎ বেশ্যার সঙ্গে তারা জড়িত।

ইবলিছ খবিছ বলে শোন পয়গম্বর।।

রহিমা আপনার বিবী কেতাবে খবর।

কছবি গিরি করে বিবী ওই মহল্লাতে।। (পৃ.২২)

**পুরুষের বহুবিবাহ ও সতিন জ্বালা:** বিবাহিত পুরুষ একের অধিক বিবাহ করছে এমন তথ্য উঠে এসেছে। শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই চিত্র পরিস্ফুট নয়। এদেশের হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষের বহুবিবাহের কথা উঠে আসে।<sup>২৬</sup>

পুরুষ খাহেসে যদি দুই নেকা করে।।

উভয় দুবিবি দেখি মাথা কুটে মরে।

চারতক নেকা করা রওয়া মরদেরে।।

এরা নাহি বোঝে মিছেগন্ডগোল করে। (পৃ.২৮)

মেয়েরা সামাজিকভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে। সতিনের জ্বালায় বিষপান করে, আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

কেহ সতিনের ঝালে পতি ছেড়ে দেয়।।

গলে দড়ি দিয়ে কেহ রসাতলে যায়।(পৃ.৩০)

**কলিকালের নারীদের স্বামীর প্রতি অবহেলা:** অনুষ্ঠান বাড়ি যাবার সময় বিবাহিত স্ত্রী নতুন বস্ত্র চেয়ে না পেয়ে স্বামীকে তিরস্কার করে। নারীদের সামাজিকভাবে প্রতিবাদ করার স্পর্ধা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। নারীরা বিভিন্ন রকম আচার-সংস্কার মুক্ত হয়ে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এগিয়ে চলার পথ খোঁজে। নারীদের হাতেই সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। নারীরা প্রতিবাদের ভাষায় স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত।

আমি বলিলাম তারে, দূনিয়া হইতে উড়ে, মুখ পোড়া যাও তুমি মরে।

তোর রুজি রোজগায়ে, আগুন লাগুক ওয়ে, যাওনা মরে ওরে হতভাগা।।

(পৃ.৩১)

**বোন বিবী জল্পরানামা: সংস্কৃতির নানাদিক**

মোহাম্মদ খাতের রচিত এই কাব্যে ইসলামি সংস্কৃতির নানা দিক উঠে এসেছে।

**দরগায় মোনাজাত:** বেরাহিম ও ফুলবিবি এই নিঃসন্তান দম্পতি সন্তানের জন্য আল্লার দরগায় হাত তুলে দোওয়া প্রার্থনা করে।

বেটা বেটি তার ঘরে কিছুই না হয়।  
এই দুঃখে এক রোজ কান্দিয়া কান্দিয়া।।  
আল্লার দর্গায় কহে হাত উঠাইয়া।  
কি গোনা করিনু আই তোমার দর্গায়।।  
আট কুড়া মোর তরে করিলে দুনিয়ায়। (পৃ.২)

**পুরুষের বহুবিবাহ:** বেরাহিম দ্বিতীয় বার বিবাহ করে তবে নিজের ইচ্ছায় নয়, নিঃসন্তান জীবনে সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় আল্লাহতালার স্বপ্ন আদেশে গোলাল বিবিকে দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে রাজি হয়।

দোছরা করিলে সাদী তবে হবে ছেলে।।  
এই বাত বেরাহিমে দেহ গিয়া বলে। (পৃ.৩)

**বিবাহ রীতি:** মুসলিম বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানের দিক বর্ণিত হয়েছে।

ফকির জলিল শাহা খোশালিত হৈয়া।।  
গোছল দিয়া বেরাহিমে দুলা সাজাইয়া।  
আর আর মহলার লোক যত ছিল।।  
সেতাবি করিয়া সবে মাঙ্গাইয়া নিল।  
বলিল আসিয়া সবে মজলিস করিয়া।।  
গোলাল আর বেরাহিমে দেলাইতে বিয়া।  
শরার দস্তুর মত আনিতে এজেন।।  
ভেজিল উকিল আর গাওয়া দুইজন।  
উকিল একজন লিয়া গোলাল বিবীর।।  
মজলিসে আসিয়া যবে হইল হাজির। (পৃ.৪)

এই কাব্যে দুখে বোন বিবির কৃপায় দেশে ফিরে কিভাবে বিয়ের প্রস্তুতি নেয় তা বর্ণনায় সুন্দরভাবে উঠে এসেছে।

দুখে শাহা দুলা সেজে খোসাল অন্তরে।।  
চড়ে বসে সূবর্ণের তক্ত রঙা পরে।  
মহা মধুধামে শাহা লোক জন লিয়ে।।  
ধোনায়ের মাকানেতে পৌছিলেক গিয়া।

দেখে ধোনা খোসালিত হইয়া অন্তরে ।।  
বসায় তাজিম করে সবাকার তরে ।  
জরির বিছানা পরে দুখের বসায় ।।  
কেহ বাও করে কেহ চামর হেলায় ।  
তার পরে খানা পানি খিলাইয়া দিল ।।  
খেতে পিতে রাত সব পোহাইয়া গেল । (পৃ.৩৮)

**নারীর গর্ভধারণ:** গোলাল বিবি আল্লাহর কৃপায় গর্ভবতী হয় এবং সেই সন্তান মাতৃগর্ভে  
কিভাবে জন্ম নেয় ও ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে তাঁর সুন্দর বর্ণনা এখানে তুলে  
ধরেছেন ।

এক মাসে বিন্দু পানি, নাহি হয় জানাজানি, দুই মাসে রক্তের কিরণ ।  
থোড়া দুই দিনে দিন, পুতলির হবে চিন, কিছু এয়ছা হইতে সৃজন ।  
তার পরে তিন মাসে, হয়ে আইল রগরিসে, হাড় আর মাংসের সঞ্চারণ ।।  
(পৃ.৫)

**সতিন-জ্বালার চিত্র:** সতিনের যন্ত্রণা প্রকট আকার ধারণ করে এবং তার ফলস্বরূপ  
গোলাল বিবিকে জঙ্গলে দিন কাটাতে হয় ।

দেখে সতিনের তরে ফুল বিবি জ্বলে ।।  
আগুনের তাপ যেন লাগে তার দেলে ।  
ভালা বুরা বেরাহিমে কিছু নাহি কয় ।।  
গমগিন হইয়া বিবী খামসিয়া রয় । (পৃ.৪)

**ইসলামি আচার-রীতি:** ইসলাম ধর্মের লোকজন তাঁদের নিজস্ব কিছু রীতি-নীতি পালন  
করে যার চিত্র এখানেও ধরা পড়েছে ।

ক. মান্নত- মনের বাসনা পূর্ণের আশায় আল্লাহ'র নিকট অনেকেই মান্নত করে, সে প্রথা  
এই কাব্যে অনুসৃত ।

খ. মাজার/দরগা- বেশিরভাগ লোকজন একরকম বিশ্বাস থেকে এই সমস্ত পীরের  
দরগায় বা মাজারে যায় ।

গ. জিয়ারত- মৃত ব্যক্তির কবরে প্রার্থনা পদ্ধতি ।

ঘ. আজান- আল্লাহ'র বাণী নির্দিষ্ট সময়ে জানান দেওয়া।

ঙ. হাজত- কঠিন সময়ে দুঃখ লাঘবের জন্য মুসলিম পরিবারের লোকজন এগুলো করে, বিশেষ কিছু খাবার তৈরি করে পরিবেশন করা হয়। এখানে দুখের মা তাঁর খারাপ সময়ে চিনি-ক্ষীর দিয়ে খাবার বানিয়ে হাজত সম্পন্ন করে।

চ. সুপে দেওয়া- ইসলামি বিবাহ প্রথায় মেয়ের বিয়ের পর বাড়ির গুরুজন বিদায়ের আগে জামাই এর হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেয়, এই নিয়ম মুসলিম সমাজে 'সুপে দেওয়া' এই অর্থে প্রচলিত।

ছ. খয়রাত- কোন ব্যক্তিকে কিছু দান করা।

**মাতৃস্নেহের বহিঃপ্রকাশ:** গোলাল বিবি স্বামীর কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে গর্ভাবস্থায় জঙ্গলে বসতি স্থাপন করে এবং আল্লাহর কৃপায় ছর পরীদের সহযোগিতায় সে সন্তানের জন্ম দেয় কিন্তু দুই সন্তানের মধ্যে বোন বিবীকে জঙ্গলে একা রেখে শাজঙ্গলিকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ঘরে ফিরতে চায় তখন দুই ভাই-বোন বাবা-মা কে ছেড়ে নিজেদের মতো থাকার কথা জানায় এই কথা শুনে সন্তানের জন্য গোলাল বিবি দুঃখ করতে থাকে-

ভাই বহিন দুইজনে মিলে কতদিনে।  
তার পরে বুঝাইয়া কহে মা বাপেরে।।  
আমা দোহে ছাড়িয়া তোমরা যাও ঘরে।  
খোদার হুকুমে মোরা যাব বাদা বনে।।  
তোমাদের ঘরে পয়দা হইনু তেকারণে।  
মুরশিদ ধরিব এবে জহুরা খাতির।।  
শুনিয়া গোলাল বিবীর চক্ষে বহে নীর।  
গড়াগড়ি দিয়া কান্দে বাছা বাছা বলে।। (পৃ.২০)

**নারীর লড়াই বৃত্তান্ত:** বোন বিবি ভাটির দেশে গিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে নারায়ণীর সঙ্গে লড়াই এ নামে। নারায়ণী দক্ষিণ রায়ের মাতা। দুজন মহিলা লড়াই করছে এবং সেই লড়াই এর সুন্দর বর্ণনা এখানে ফুটে উঠেছে।

হেনকালে নারায়ণী রায়মণি মা জননী ঘরে ছিল খবর পাইয়া।  
এসে বলে বাছা ধন, লড়িবারে প্রয়োজন, নাহি তোর আওরতের সাথে।।



জিতিলে না লাভ পাবে, মরিলে অখ্যাতি হবে, মানে হীন হইবে ভাটিতে ।  
তুমি থাক আমি যাই, হারি জিতি ক্ষতি নাই, আওরত আওরতের লড়া ভাল ।।  
(পৃ.১৩)

**পুরুষের পেশা:** দুখে গ্রামের ছেলে, সে তেমন কাজ-কর্ম জানে না তাই মাঠে গরু চরায় । কৃষি পরিবারের ছবি স্পষ্ট ।

দুখে বলে কাজ কাম কিছু জানি নাই ।।  
গেরস্থের গরু লিয়া চরাইতে যাই । (পৃ.১৬)

**খাদ্যরীতি:** রান্নার নানা রকম পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়, ধোনাই-মোনাই জঙ্গলে মধু সংগ্রহে গিয়ে সেখানেও কিভাবে রান্না করে খাবার খায় তা জানতে পারি । এছাড়া ধোনাই রান্নার জন্য দুখেকে আদেশ করে ।

কেবল ডিঙ্গাতে তুমি বসিয়া রহিবে ।।  
ডাল চাল আছে খোড়া পাকায়ে রাখিবে ।  
ইহা বলে দুখেরে তচ্ছলি কিছু দিয়া ।।  
সকলে বনের বিচে গেল যে চলিয়া । (পৃ.২১)

আরও জানতে পারি দুখে অসহায় অবস্থার সময় সে বোন বিবির নামে হাজত মানে এবং দুখে দেশে ফিরে এলে অনেক ধরনের খাবার তৈরি করে-

হেথায় আসিয়া দুখে আপনার ঘরে ।।  
চিনি ঘিউ দিয়া কহেন মায়েরে ।  
সেতাবি পাকাও ক্ষীর আমি এবে গিয়া ।।  
গেরামের ছেলে সব আনি বোলাইয়া  
শুনে বুড়ি সেই ঘড়ি পাকাইল ক্ষীর ।। (পৃ.৩২)

দুখের বিবাহ বাড়িতে কেমন খাবারের আয়োজন তাও এই কাব্যে জানতে পারছি-

ঠাই ঠাই তামবারি বাবুরচি পাকায় ।।  
কেহবা বসিয়া খায় কেহ লিয়া যায় ।  
এইরূপে সাদী ঘরে হৈল ধুম ধাম ।।

খুশিতে মাতিয়া रहे यत खाछ आम । (पु.७८)

এছাড়া বোন বিবির উদ্দেশ্যে খাবার রান্না করে দুখে বিয়ের পর বিতরণ করে-

তার পরে পাকাইয়া ক্ষীর গোস্তু ভাত ।।

বোন বিবীর নামে কত করিয়া খয়রাত । (পু.৩৮)

দক্ষিণ রায়ের পূজা: ধোনাই জঙ্গলে মধু সংগ্রহের আশায় দক্ষিণ রায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে  
নরবলি পূজা দেয় ।

রায় বলে ওরা ধোনা বহু দিন হৈল ।।

নরবলি পূজা মোরে কেহ নাহি দিল ।

যদি তুমি নরবলি পূজা পার দিতে ।।

সাত ডিঙ্গা মোম দিব তোমার তরেতে ।(পু.১৯)

বিনোদন: বোন বিবির কৃপায় দুখে দেশে ফেরে এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল হলে  
সেই টাকা দিয়ে দুখে গরীবের কষ্ট দূর করে এবং সবাই খুশিতে মেতে ওঠে ।

খুশিতে রায়েত লোক দুখের রাজত্বে ।।

বিনা করে বসবাস করে সকলেতে ।

তাবেদার জমিদার বহুত এয়ছাই ।।

দেশে দেশে কত শত হৈল ঠাই ঠাই ।

মুনশী মৌলবী কাজী কত ফাজেলান ।।

শুনিয়া দুখের নাম ধরিল জোগান ।

কেহ হাসে কেহ খেলে কেহ গায় গীত ।। (পু.৩৫)

দুখের বিবাহ অনুষ্ঠানে লোকজন আনন্দে মেতে ওঠে-

সাদীর খবর সব কহিয়া জানায় ।।

শুনে বুড়ি দেল বিচে খোসালিত হৈয়া ।

দাই দাসী সবাকারে কহে বোলাইয়া ।

সকলে শুনিয়া দেলে হয় আমোদিত ।।

হাসি খেলি হুড়াহুড়ি গায় নানা গীত । (পু.৩৭)

## আবদুল আলী গারলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি: সংস্কৃতির নানাদিক

এই কাব্যটি অন্যান্য কাব্যের তুলনায় ভিন্ন ধরনের মানুষের জীবন ও তাঁদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। পুরো কাব্যটিতে ঘারভালদের জীবনচর্যার দিক পরিস্ফুট হয়েছে।

**ঘারভালদের জীবন:** ঘারভালদের নিত্য দিনের জীবনযাপন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। নিত্যদিন সাপ ধরে তারা জীবন অতিবাহিত করে।

পাহাড়িয়া ঘারভাল তারা, নিত্যকর্ম সর্প ধরা,  
শত শত সর্প রেখেছে খাচাতে আটকাই।। (পৃ.২)

**নারীর প্রয়োজনীয় প্রসাধন:** কাব্য জুড়ে নিবারণ সুন্দরীর (ঘারভাল কন্যা) কথা ফুটে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজেকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার চিত্র ধরা পড়ে।

আর্শী চেয়ে চুল ঝাড়ে চিরণী লাগাই।।

যেছা মেয়ের মুখের ছটা, নারাজি হৃদ্রের গেটা, হুর পরি মোহ যায় থাকুক গোসাই।

কপালে তিল ফোটা, জানু সম কেশের জোটা (পৃ.২)

**দৈনন্দিন জীবনের ছবি:** জীবন-যাপনের অনেক ছবি এখানে উঠে এসেছে, ঘারভালরা প্রতিদিনের জীবনে যে কাজ করে তার চিত্র এখানে স্পষ্ট।

প্রভাতে ঘারভাল সব করে কোন কাম।।

সর্পঝুড়ি কান্দে লিয়া চলিল গেরাম এ সর্পনাচ বায়না যাব সেইখানে হৈল। (পৃ.২)

**অতিথি সেবা:** ঘারভালদের মধ্যেও অতিথি আপ্যায়নের সুন্দর ছবি ধরা পড়ে। আবদুল আলীকে তাঁরা যেভাবে আপ্যায়ণ করে তা বর্ণনায় উঠে এসেছে।

উচ্চ কাষ্ঠ চৌকি নিয়া বসিবার দিল।।

পান তামাক দিয়া কত সান্তনা করিল।

নিজ হস্তে আবদুল আলীর পদ্য যে ধোলায়।।

কেহ কেহ দাড়াইয়া পাজ্জা করে গায়।

যত ঘারভালেরা সব খেমমতে রহিল।।

বহু প্রেম করি পরে খানা খেলাইল। (পৃ.৩)

**বিবাহ অনুষ্ঠান:** ঘরভাল কন্যার বিয়ের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের কথা জানা যায়।

আবদুল আলীর সঙ্গে দিল নিবারণের বিয়া।

রঙ্গে সঙ্গে সমাধা হইল শুভ কাজ।। (পৃ.৩)

**বাসর সজ্জার বিবরণ:** বাসর-সজ্জা বর্ণনার মধ্যে দিয়ে অনেক রীতি উঠে আসে।

আবদুল আলি নিবারণের বাসরে পৌছিল।

নিবারণ আছিলে পন্ত তাকাইয়া।।

হেনকালে আসিয়া পৌছিল প্রাণপিয়া।

দোহানের রূপে দোহে আছিল মগন নিমিষে হইয়া গেল প্রিয়ার দরশন।

মধুপানে উন্মত্ত আছিল তার মন তাহার দ্বিগুণ বুদ্ধি ছিল নিবারণ।

পালঙ্গে যাই কন্যা কোলে করি।। (পৃ.৩)

**নববধূকে আশীর্বাদ পদ্ধতি:** নববধূকে চুম্বনের মধ্যে দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছে।

আবদুল আলী নিবারণ দেশেতে পৌছিল।

আবদুল আলির মায় যদি পাইল খবর।।

পুত্র বধু দেখি বুড়ি খোসাল অন্তর।

তুষ্ট হইবে পুত্র বধু তুলি লৈল কোলে।।

লক্ষ লক্ষ চুম্বন দিল শ্রীকণ্ঠ কপালে।

পুত্র বধু লয়ে বুড়ি খোসালে রহিল।। (পৃ.৪)

**পুরুষের ব্যবহৃত পোশাক:** পুরুষরা সিমাল ধুতি, জরির টুপি, সারা অঙ্গে ভূষণ পড়ে।

**সন্তানের জন্য মাতৃশোক:** নিজের পুত্র আবদুলের মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর মা পুত্রের

জন্য বিলাপ করে। পারিবারিক জীবনে সন্তানহারা মায়ের আকুতি প্রকাশিত হয়েছে।

কে নিল কে নিল মায়ে প্রাণের আবদুল।

কে নিল নিল মোর চক্ষের আঞ্জনা।।

কি হইল মোর নয়নের ধন।

কে নিল নিল মায়ের নয়নের জ্যোতি (পৃ.৬)

**স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর বিরহ:** নিবারণ স্বামীকে হারিয়ে নিজের বেশ-ভূষা ছেড়ে মলিন বস্ত্র

পড়ে, পতিবিরহে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

তৈল শিন্দুর মাথে দিয়ে আসি ধরে চায়।  
সিতার শিন্দুর হইলেক মলিন আকার।।  
হায় হায় স্বামী বিনে জীবন অসার। (পৃ.৭)

**বারমাসী বর্ণনা:** নিবারণের বারমাসী বর্ণনার চিত্র এখানে উঠে এসেছে। স্বামীকে হারিয়ে প্রতিটি মাস দিনের পর দিন একা জীবন অতিবাহিত করার মধ্যে দুঃখপ্রকাশ করেছে। মধ্যযুগের কাব্যে নারীদের বারমাসী বর্ণনা এসেছে, পতিহীন জীবনের চিত্র ধরা পড়ে এই বর্ণনায়।

চৈত্র মাসে স্বাশুরিগো হালিয়ার বনে বিচ।।  
আনগো কোটরা ভরি খাইয়া মরি বিষ।  
একেত রবির জালা প্রচণ্ড অনল।।  
সমুদ্রেতে ঝপি দিলে না লাগে শিতল। (পৃ.১১)

**ছহী রঙ্গ-বাহার বা শাহে আলম ও মাহে আলমের কেছা: সংস্কৃতির নানাদিক**

আবদুল মজিদ ভুইঞা রচিত এই কাব্যে সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

**ঘুমানোর স্থান:** জরি দেওয়া বিছানায় ঘুমানোর যে চিত্র এর মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার একধরনের বিলাসিতা ফুটে ওঠে।

খাওয়া পেত্তা করিয়া শুইল।

জরির বিছানা পরেনিন্দের খোমার জোরে অচেতন হইয়া রহিল।। (পৃ.১১)

**আনন্দ-বিনোদন:** পুত্র সন্তান জন্মানোর আনন্দে চারিদিকে মহল জুড়ে নাচ-গান-বাজনায় ভরে ওঠে।

টাকা কড়ি, গড়া গড়ি, হাজারে হাজারে সাদিয়ানা, বাজে বাজা ঢোল আর মৃদঙ্গ।

বাজে তুরি, সাজে ভেরি রসন চৌসঙ্গ।।

বিনবাজে, ছত্তারি সাজে তাউছের নাচ।

একতারা তানপুরা, চিকারা ইছরাজ।।

সারিন্দার, সোরতার, কসে কতলোক তাল সোর, ভরপুর, তবল ঢোলক।। (পৃ.১৩)

শুকনো খাবার: বিভিন্ন রকমের শুকনো খাবার (কিসমিস, পেস্তা, আখরোট) এর কথা এখানে এসেছে।

কিসমিস ছোয়ারার, মোনাক্কা পেস্তার আখরোট বাদাম ছেব। (পৃ.১৪)

পুরুষের পোশাক: পুরুষের সাজসজ্জা বিচিত্র রকমের। পায়জামা পরিধান করে, মাথায় পাগড়ি দেয় এবং সারাদেহ অলংকারে সজ্জিত হয়ে ওঠে।

জামা জোড়া পাগড়ি পায়জামা পেন্দাইয়া দোপট্টা কোমরে বান্দে জরির চামর।

ঝালবোর ছেহেরাও মাথার উপর।।

ঝলমল করে সোনার মউর ছেহেরা।

গলার কুরছির হার লোম ফেরা ফেরা।।

বাদশাই দস্তুর মতে দোন বর সাজে।। (পৃ.১৮)

বিবাহে খাদ্য-সম্ভার: খাদ্য সম্ভারের তালিকায় মুসলমান সমাজের খাদ্যদ্রব্যের কথা জানা যাচ্ছে।

বিরিঞ্জি পোলাও কোরমা হালুয়া বহুত।।

খাইয়া শাহানা খানা খোষাল খাতির। (পৃ.১৯)

নারীর সাজসজ্জা ও অলংকার: নারীদের সাজসজ্জার সুন্দর বর্ণনা এখানে উঠে এসেছে।<sup>২৮</sup>

মাথায় সিন্দুর দিল পূর্ণচন্দ্র বোধ হৈল আখেতে কাজল পেন্দাইয়া।।

মাথায় দিলেক টিকা, চান্দ দেখে হৈল ফিকা, মাঙ্গে দিল মাঙ্গ ছরাছরি।

দুকানেতে বালি দিয়া তাতে ঝুমকা লাগাইয়া, গলা বিচে হাসলি দোহার।।

বাহুতে বাজুবন্দ দিল, সোনা চুড়ি পেন্দাইল, আঙ্গুলে আংটি দিল ভরা।

কান্দনে যে পৌছি সিথা, গজরা বড়েলা তাতে কমরে জিঞ্জির তিন ফেরা।।

পাঙজের পায়ে কড়া, পায়করে শোভা বেড়া, আঙ্গুলে চুটকি পেন্দায়।

তাহাতে শোভয় মেহদি যেন ফুল গোল দাউদা, গোরা বিচে অতি শোভা পায়।।

তাহাতে নেপুর সাজে, ঝন ঝন শব্দ বাজে, পেন্দাইল শাড়ি পিতম্বর। (পৃ.১৯-২০)

অথবা

তাহাতে সোনার চিক আর যে হাসলী।

বিরাজে বেকট দানা মোহন চাঁপা কলি।।

কুন্দিকার তুলমত দুইবাজু তার।

তার বাজুবন্দ তায় দেখিতে বাহার।।  
হাতে পিন্দাইল তার কনকের চুড়ি।  
তাহার উপরে লাল জতাহের যুড়ি মেহেদির রঙ্গ তার হাতে পায় সাজে।  
আঙ্গুলেতে রঙ্গ রঙ্গ আঙ্গুটি বিরাজে।। (পৃ.১০০)

**মুসলিম বিবাহ-রীতি:** বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মুসলিম বিয়ের রীতি-নীতি জানা যায়।

বাদশা ও উজীর দোন খোষাল হইয়া।  
সুপে দিল দুই বেটী হাত পাকড়িয়া।।  
করিয়া বিদায় দোন দোন দামাদেরে কত কত নেছার দিলেন দোহাকারে।।  
গলায় গলায় সব মেলামেলি হইয়া। (পৃ.২০)

অথবা

বিবি যে কবুল কৈল খুব ধুমে সাদী হইল রাখিয়া সে মাহে আলমেরে।  
আপনার মনে সেই বিচার করেন এই আঙ্গটি বরকতে হেন করে।। (পৃ.৮৫)

**উৎসব পালন:** মুসলিম ধর্মে পবিত্র ঈদ পালন হয় রমজান মাসে।

য়্যায়ছা খুসি হয় মোছলমান ঈদে। (পৃ.৩৮)

**আমল করার প্রথা:** মুসলিম সমাজে কোনও ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা পূরণের আশায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমল করার সিদ্ধান্ত নেয়। খুব নিষ্ঠা সহকারে এই নিয়ম পালন করতে হয়। নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য এই আমল পালন করতে হয়।

এছেম আজম তারে দেও শিখাইয়া আমল করিরে খুব রাতেতে বসিয়া।।

চল্লিশ রোজেতে সেই আমল হইবে।

তার পরে যাহা সে মাঙ্গিবে তাহা পাবে।।

পড়িবেন সেই কামে হবে সেই কাম।

কখন না থাকে যেন নাপাক আন্দাম এবাত কহিল যবে এলাহী জাব্বারে। (পৃ.৩৯)

**রফ্বনপ্রণালী:** উনুনে রান্না করার মধ্যে একদম সাধারণ রান্নাঘরের চিত্র প্রকাশিত।

বড় এক মণি আছেত কড়াই চড়াইয়া চুলাপরে ঘিউ দেয় ভাই।।

আঁচতলে লাগাইয়া খুব জোস করে। (পৃ.৫৫)

## আমির সদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরীর পুথি: সংস্কৃতির নানাদিক

মুন্সী মোয়াজ্জম আলী রচিত এই কাব্যে ইসলামি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক বর্ণনায় এসেছে।

**মাদ্রাসা শিক্ষা:** আমির সাধু মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করে। মুসলিম সমাজের অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে এই মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে।

পড়িবারে দিছেরে সাধুরে মাদ্রাসা মাঝার।  
প্রথমে বিছমিল্লারে সাধু পড়ে আলিফ লাম।।  
চৌদ্দ এলেম পূর্ণ সাধু করিছে তামাম। (পৃ.২)

**পুরুষের বিবাহের পোশাক:** বিবাহের জন্য দাসীরা আমির সাধুকে সমস্ত উপকরণ যথাস্থানে দিয়ে যায়।

রেশমী কাপড় দিছেরে করিবারে সাজ।।  
মাথায় আনি দিলরে সাধুরে হাজার টাকার তাজ।  
গায়ে দিল শালের কোট পিন্দনে চিকন ধুতি।।  
পায়ের মাঝে দিছেরে আনি ভালা চিনার জুতি। (পৃ.৭)

**বিবাহের রীতি-নীতি:** মুসলিম বিবাহ খোৎবা পাঠের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়। এই কাব্যের বর্ণনায় এই চিত্র ধরা পড়েছে।

দুলা দুলাইন করি রাজি, আনিয়া সরার কাজি, পড়াইল খোৎবা বিবাহের  
খোৎবা পড়াইল পরে, বর কন্যা একত্র করে, মিলিলেক যেন রবি শশী  
চক্ষে চক্ষে দেখা হইল, প্রেম আলিঙ্গন দিল, সুখে তথা গুজারিল নিশি।  
(পৃ.৭)

**পারিবারিক জীবনের ছবি:** একেবারে পারিবারিক জীবনের ছবি উঠে এসেছে।

দিবানিশি ঘরে বসিরে ভাবে করতার।  
শ্বাশুড়ী ননদী জানরে যার ঘরে আছে।।  
কোনমতে সুখ নাইরে সেই বধূর কাছে। (পৃ.৮)

**রক্ষন প্রণালী:** ভেলুয়া নিজের স্বামীর জন্য রান্না করে। এখানেও উনুনে রান্নার কথা জানা যাচ্ছে।



তার পরে ভেলুয়ার রে চুলা এক করি।

খিরিসা রাফিল জানরে ভেলুয়া সুন্দরী।। (পৃ.১০)

**শিরনি প্রদান:** শিরনি জাতীয় মিষ্টান্ন খাবার মুসলমানরা পীরের দরগায় মানত করে নিজেদের মনস্কামনা পূরণের ইচ্ছায়। ভেলুয়া পীরের দরগায় সিন্ধি মানত করে।

সিন্ধি মানসা করিয়াছে ভেলুয়ায় তোমার রাইতে রাইতে দেখা কর ভেলুয়ার সাথে।।

(পৃ.১২)

**নারীর সাংসারিক যন্ত্রণার চিত্র:** ভেলুয়ার কষ্টের মধ্যে দিয়ে সামাজিকভাবে নারীদের যন্ত্রণার কথা ফুটে উঠেছে।

মা বাপের ঘরে আমিরে জল নাহি আনি।।

শুনে না বুঝিব দুঃখরে আমার নাহিক জননী।

বানিজ্যেতে গেলরে সাধুরে মোরে করি একাশ্বরী।।

শ্বাশুড়ী ননদী মোর রে হৈল কালবড়ী।

সাত ভাইয়ের ভগ্নি আমিরে মাটিতে নাপরে পাও।।(পৃ.১৪)

**নারীর সতীত্বের পরীক্ষা:** স্ত্রী জাতি চিরকাল সমাজের কাছে বহুরকমভাবে পরিস্থিতির স্বীকার থেকেছে। এই কাব্যেও ভেলুয়াকে নিজের সংসারে ফিরতে পরিবার-পরিজনের কাছে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। লোহার চাল রান্না করে দেওয়ার মধ্যে নারীর সতীত্বের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

প্রথমে পরীক্ষা জানরে শুন কহি সয়ার।।

লোহার চাউল আনি দিলরে ভাত রাফিবারে।

সেই চাউল লইরে ভেলুয়া করিছে গমন।।

পাকশালাতে লিয়ারে কন্যা করিল রন্ধন।

আমির সাধু দেখিরে ভাত বলে চমৎকার।

লোহার চাউলের ভাতরে সতী কন্যা রাফে কি প্রকার। (পৃ.২৫)

## বড় নিজাম পাগলার কেছা: সংস্কৃতির নানাদিক

মুন্শী মহাম্মদ রচিত এই কাব্যে একদম সাধারণ জীবনের প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে। বস্তি জীবনের কথা কাব্য বর্ণনায় তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি নারী জীবনের নানা দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

**নারীর গর্ভধারণ:** নারী জাতির সন্তান প্রসবের কথা এখানে জানতে পারি। মহোন সাধুর স্ত্রী নয় মাসের গর্ভ পূর্ণ করে সন্তানের জন্ম দেয়।

নয় মাস গোজারিলো, খালাছের দিন আইলো, রহে বিবী বড়া পেরেসান।।

খালাছ হইলো বিবী, জেন সে ইউছুফ নবি, পয়দা হৈলো এলাহির সান। (পৃ.৩)

**নাচওয়ালির প্রসঙ্গ:** নাচওয়ালিদের জীবনের কথা জানা যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের নৃত্যের কথা উঠে আসে, এই কাব্যেও সেই একই প্রসঙ্গ এসেছে।

এরূপেতে নাচতালি মহলেতে গায়।।

কোদরত এলাহি রাত গোজারিয়া জায়।

জে জাহার মকানেতে গেলেন চলিয়া।।

তার পরে নজ্জুমেরে আনে বোলাইয়া। (পৃ.৪)

**দাই প্রসঙ্গ:** শিশুদের লালন-পালনের জন্য দাইদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

দুই দাই মোকরোব দুধ পেলাইবারে।

লালোন পালোন দাই লাগিলো করিতে।। (পৃ.৪)

**শিক্ষা-রীতি:** মুসলিম সমাজের ছেলে-মেয়েদের মক্তবে বা মাদ্রাসায় পড়াশুনার প্রথা বেশ প্রচলিত। এই কাব্যে কিঙ্কর মক্তবে পড়াশুনো করে ‘ওস্তাদ’, ‘ওম্মোর (উম্মর)’, ‘এলেম’, ‘তালেম’ ইত্যাদি শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। ইসলামি শিক্ষায় একজন ব্যক্তিকে ‘এলেম’ বা ‘আলিম’ হতে হলে উপযুক্ত মানের ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে হয়।<sup>২৯</sup>

পাচ সালে পাঙ জবে কিঙ্কর দিইলো।

মোক্তোব খানায় তবে দিইলো পড়িতে।।

কাবেল ওস্তাদ পেয়ে পড়ে দিন রাতে।

দশ বরোছের জবে ওম্মোর হইলে।।  
আল্লাতলা এলেমের দরিয়া তায় দিলো।  
বাকি না রহিলো কিছু চৌদা এলেম।।  
একে একে সিখিয়া যে হইলো তালেম। (পৃ.৪)

**পুরুষের পেশা:** বেশিরভাগ পুরুষদের সওদাগিরি এবং ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত থাকতে দেখা যাচ্ছে।

এতেক ভাবিয়া সাধু কিঙ্করে ডাকিয়া।।  
ছওদাগিরি কামে জাহো জাহাজ লইয়া। (পৃ.৫)

**গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা:** বাণিজ্যযাত্রার মূহুর্তে কিঙ্কর পিতার আশীর্বাদ গ্রহণ করে।

ছওদাগর জাদা কহে কদমের বাপের।।  
ছাতিপরে হাত দিয়া করেন জাহের। (পৃ.৫)

**বস্তি জীবন:** নিজাম কমলাবতিকে সঙ্গে নিয়ে বস্তিতে জীবন কাটাতে শুরু করে। এই বস্তি বিভিন্ন ফুলের বাগিচায় ভর্তি।

নেজাম এ বাত শুনে, খোসালিত হয়ে মনে, কমলারে লইয়া সঙ্গেতে।।  
জঙ্গল ছাড়িয়া জায়, শুমুখেতে বস্তি পায়, পৌছিলেন তাহার বিচেতে।  
(পৃ.২১)

**মালিনীর পরিচয়:** এই কাব্যে বস্তিতে বসবাসকারী মালিনীর পরিচয় আমরা পাই। সে পতিব্রতা নারী, মালিকুলে তার জন্ম। ফুলের ব্যবসা তার একমাত্র পেশা।

গরিব মালিনি আমি, পতিব্রথা নাহি স্বামী, এ বাগিচা জানিবে আমার।। (পৃ.২২)

**নারীদের পর্দা প্রথা:** মুসলিম সমাজে নারীদের পর্দা প্রথার চিত্র এখানে এসেছে। লালমতি পর্দার আড়ালে নিজেকে রেখে নিজামের সঙ্গে কথা বলে।

সরম পাইয়া মুখ লিল ছাপাইয়া।  
ঘুমটা হৈতে সাহাজাদি এই কথা বলে।। (পৃ.৩০)

**বিবাহ আচার-অনুষ্ঠান:** নিজাম ও লালমতি একে অপরকে মালা বদলের মধ্যে দিয়ে বিয়ে করে। হিন্দু বিবাহের রীতি উঠে এসেছে।

এতেক বলিয়া বিবি মালা হাতে লিয়া ।।  
নিজামের গলে পরে দিল পরাইয়া ।  
নিজাম আপনা মালা খুলে গলা হৈতে ।।  
পরাইয়া দিল মর্দ বিবির গলেতে । (পৃ.৩০)

**দরগায় মোনাজাত:** হিন্দু রাজা বিপদের সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর দরগায় দোওয়া চাইতে  
অস্থির হয়ে উঠেছে ।

এখানে শ্রীধর রাজা বড়া পেরেসানে ।।  
আল্লার দরগায় দোত্তা মাঙ্গে মনে মনে ।  
আয় আল্লা পাক গণি মেহের বান হও ।। (পৃ.৪১)

**পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ:** পুরুষরা নিজেদের নানারকম পোশাক পরিধানে সাজিয়ে  
তুলেছে ।

চোগা ও চপকান পরা, সোনালির কাম করা, কেনারায় মতি মুক্তা তায় ।  
কি খুবি বাহার লিল, আন্ধারে উজালা কৈল,  
চক্ষু নাহি ঠারে তার জোতে ছাচ্ছা টুপি ছের পরে,  
আহা কিবা সোভা করে; কিঙ্কতি পাথর কত তাতে ।  
পায়েতে জরির জুতা, কি কহিব সেই কথা, মতি মুক্তা এয়াকুত পাথর ।।  
(পৃ.৪৩)

**নারীর বেশভূষা:** মেয়েদের সাজসজ্জার বিস্তর বিবরণ ফুটে উঠেছে ।

সোনার চিরনি লিয়া, কেশ সব আচড়িয়া চুটী ফের মন মতে গাথে ।।  
সোনা ও রূপার ডোরা, জেমন চমকায় তারা, খোপা ফের লাগিল বান্ধিতে ।  
তুলিয়া বান্ধে খোপা, তাহে গন্ধরাজ চাপা, মতি মুক্তা ঝোলে কত তায় ।।  
কপালেতে সিঁতা পাটি, বুঝকা দিল কানে দুটি, নথ ফের দিল নায়িকায় ।  
আহা কি মাশুকি গলে সারি সারি হার দোলে, বলে জেন তারা আকাসেতে ।।  
হাত পরে বাজু বন্দ, আহা কিবা পরি ছন্দ, বাক দিল তাহার কাছেতে ।  
বেলুন হাতের পরে, চুড় দিল থরে থরে, আহা কিবা হাতে সোভা পায় ।।  
(পৃ.৪৫)

## ছহী গুলে বকাওলী: সংস্কৃতির নানাদিক

মুসী আবদুশ্ শকুরের এই কাব্যটি তাজলমুলুকের জীবনকে আবর্ত করে রচিত। এই কাব্যটি কিছুটা রূপকাশ্রয়ী। সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে কাহিনি বর্ণনায়।

**বিদ্যাশিক্ষা:** তাজল শিক্ষালাভ করে ওস্তাদের কাছে। সে ইসলামি শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে ওঠে।

লেখাপড়া সিখাইতে ওস্তাদ রাখিল।  
রোজ রোজ লেখা পড়া লাগিল করিতে।।  
সিখিল বহুত এলেম খোড়াই দিনেতে।। (পৃ.৪)

**গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা:** জয়নালের চারপুত্র পিতার পায়ে সালাম করে বকাওলী ফুলের খোঁজে রওনা দেয়।

ফুলের তালাসে জাইতে হুকুম করিল।।  
বাপের পায়েতে সবে ছালাম করিয়া।  
সাহাজাদাগণ গেল বিদায় হইয়া।। (পৃ.৮)

**বিনোদন:** দেলবর লাঙ্কার প্রাসাদে নাচ, গানের আসর বসে। সেখানে সকলে মিলে আনন্দে মেতে থাকে।

গান বাজনা করে সবে মাতিয়া নেসায়।  
এইরূপে আধারাত গোজারিয়া জায়।। (পৃ.১১)

**জুয়া খেলার চল:** দেলবর লাঙ্কার প্রাসাদে জুয়া খেলার চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এই খেলা নেশার মতন সকলকে গ্রাস করে নেয়।

**বেশ্যা বাড়ির অন্দরমহল:** দেলবর লাঙ্কার প্রাসাদে দাস-দাসীরা সারাদিন অতিথি সেবায় ব্যস্ত। এই বাড়ির অন্দরমহলের চিত্র কেমন তা বর্ণিত হয়েছে।

খোসালে বসায় আনি পালঙ্গ উপরে।  
সরাব কাবাব খায় খোসাল অন্তরে।।  
এইরূপে পহর রাত গোজারিয়া গেল।  
দাসীগণে দস্তর খান আনি বিছাইল।।  
নানারকমের খানা করিল হাজের। (পৃ.১৭)

নারীদের সাজসজ্জা: বকাওলী পরি সুন্দর করে নিজেকে সাজিয়ে রাখে সর্বদাই।

কাজই করিয়া কেশ বান্দিয়া যতনে।

উড়িল দোপাট্টা পরি হরসিত মনে।। (পৃ.৩৫)

নারীর স্নানপর্ব: বকাওলীর স্নানের সুন্দর বর্ণনা তুলে ধরেছেন এই কাব্যে।

এতেক কহিয়া বিবী খোসাল অন্তরে।

গোছল করিতে গেল নদীর কেনারে।।

জামা জোড়া খুলে রেখে নামিল জলেতে।

গোছল করিয়া ফের উঠিল আড়াতে।।

জামা জোড়া পিন্দে খুব আরাস্তা হইয়া।

আস্তে আস্তে চলিলেক রাহেতে হাটিয়া। (পৃ.৩৮)

অর্থ উপার্জনের পন্থা: ছাদ নামক এক কাঠুরিয়ার কথা এই কাব্যে উঠে এসেছে। সে জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করে সেগুলো বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে।

কাষ্ট কাটি বেচি কিনি করি এই কাম।।

ছাদ বলে কাষ্ট দেহ মনিবে আমার। (পৃ.৪১)

সামাজিক মর্যাদার ভীতি: বকাওলী তাজলের প্রেমে অস্থির হয়ে ওঠে কিন্তু তার মা সামাজিক কুলমর্যাদার ভয়ে তার পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখে। পারিবারিক সম্মানহানির কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ডুবালে চাচার নাম তুমি এত দিনে।।

কলঙ্কের টিকা তুমি কুলে লাগাইলে। (পৃ.৭৪)

বিবাহ আচার-অনুষ্ঠান: বকাওলী ও তাজলের বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা এখানে উঠে এসেছে। চারিদিক সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। শহরের সমস্ত ঘরে ঘরে আনন্দের রেশ। রৌশন বাজি, নাচ, গান এর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান চলতে থাকে। বকাওলী বিয়ের জন্য সমস্তভাবেই নিজেকে সাজিয়ে তোলে, হাতে-পায়ে মেহেন্দি, পরনে রেশমি শাড়ি, পায়ে সোনার নুপূর, কানে ঝুমকো, চোখে কাজল, গলায় সাতনরি হার।

তৈয়ার করহে সবে সাদীর ছামান।।

জুলুছ তৈয়ার খুব করো ঘরে ঘরে।

সাহি মাকানেতে আর সহর বাজারে ।।

উজিরান এ হুকুম জখন শুনিল ।

সাদির ছামানা যত করিতে লাগিল ।। (পৃ.৭৮)

সাংসারিক জীবনের ছবি: তাজল পরবর্তীতে চাতরাভূতের সঙ্গে বিয়ে করে এবং তাদের সুখী সংসারের চিত্র এই কাব্যে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

খুসি হালে দুই জনে রহিল শুইয়া ।

নিসী অবসানে দিন পৌছিল আসিয়া ।।

উঠিল বিছানা হৈতে হাম্মামেতে গেল ।

গোছল করিয়া ফের ঘরেতে আইল ।।

খাবার ছামানা যত আনিয়া জোগায় ।।

খোসালিতে দোহে বসী একসাতে খায়

উভয় উভয় খুব পীরিতি হইল । (পৃ.১০৪)

সংস্কৃতির যে পরিচয়ের কথা এই সাহিত্যগুলিতে উঠে আসে তা অনেকখানি তাৎপর্য বহন করে আনে। লোকজীবনের যে বিষয়গুলিকে সাহিত্যিকরা উল্লেখ করেছেন তা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে নিম্নবর্ণীয় মানুষের সঙ্গে যুক্ত। নিম্নবর্ণীয় মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রা, তাঁদের যে দৈনন্দিন জীবিকা, জীবনের যে কাজকর্ম, যে পথচলা এই সবকিছু নিয়েই লোকজীবনের একটা সংস্কৃতির পরিচয় এই সমস্ত নির্বাচিত কাব্যগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যিকরা সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রাকে তুলে ধরেছেন এবং তাঁর হাত ধরেই উঠে এসেছে সংস্কৃতির বহুচিত্র। এই চিত্র এককভাবে কোন ধর্মের সংস্কৃতির মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। শুধুমাত্র হাদিসকেন্দ্রিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে মুসলমান সংস্কৃতির অনেক দিকের পরিচয় পাওয়া যায় যা আলোচনাকে ঋদ্ধ করেছে। আবদুল করিম (Abdul Karim) মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অন্তর্গত বিষয়গুলিকেই সংস্কৃতির আওতাভুক্ত করেছেন, এই সম্প্রদায়ের ভাষা, পেশা, বাসস্থান, আহার, পোশাক, মহিলাদের অবস্থান, সামাজিক সমাবেশ, আর্থিক অবস্থা এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ইত্যাদি সবকিছুই।<sup>৩০</sup> তবে বেশিরভাগ সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকরা হিন্দু কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং বহুমাত্রিক সংস্কৃতির কথাকে তুলে ধরেছেন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দিকগুলি

যেমন আছে ঠিক এর পাশাপাশি আর একটি দিক লক্ষ করার মতো। সেটি হল হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা এই কাব্যগুলির মধ্যে আছে। সব সাহিত্যেই নারী প্রসঙ্গের কথা এসেছে, নারীদের জীবনযাত্রা তাঁদের জীবনশৈলী কবিরা লেখার মধ্যে দিয়ে তুলে এনেছেন। এক ধরনের কাব্য আছে যেখানে দেখা যায় হিন্দু নারীকে মুসলমানরা গ্রহণ করেছে সেখানে ইসলাম ধর্মের যে রক্ষণশীলতার দিক সেটি প্রকাশ পাচ্ছে। একেবারে ধর্মকে কেন্দ্র করে লেখা কাব্য যেমন আছে পাশাপাশি অজস্র কাব্য মুসলমান সাহিত্যিকরা লিখছেন যে কাব্যে এই প্রসঙ্গগুলো নেই। নারীজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সংস্কৃতির বহু দিকের পরিচয় এই আলোচনার মধ্যে গ্রথিত হয়েছে। বিবাহ সম্পর্কিত বহু নিয়ম-নীতির কথা উঠে এসেছে। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের চিত্র তাঁদের সহাবস্থানের প্রেক্ষিত নির্মাণ করেছেন এই সাহিত্যিকরা। পীর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতি উঠে এসেছে তাতে মুসলমান সমাজের প্রতি প্রথম দিকে হিন্দু জনমানসে যে মনোভাব ছিল সময়ের অগ্রগতিতে ধীরে ধীরে সেই মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষিত হয়। যবন (মুসলমান)দের নিয়ে নানা কটুক্তি কবিদের লেখনীতে ধরা পড়েছে। আসলে একটা জাতিকে অন্য সমাজের কাছে প্রতিনিয়ত অবহেলিত হওয়ার চিত্র অঙ্কন করেছেন কবিরা। মুসলমান সমাজের প্রতিপত্তি স্থাপনে পীরদের ভূমিকা যথেষ্ট। তাঁদের অলৌকিক শক্তির ক্ষমতাবলে হিন্দুদের পরাস্ত করে নিজেদের জায়গা তৈরি করে নেওয়া। আবার কেছায় বর্ণিত কাহিনির মধ্যে নানাবিধ হিন্দু অনুষ্ঙ্গ এসে হাজির হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থাদি, হিন্দু সংস্কৃতির কথা, মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ ইত্যাদি। নারীদের জীবনের কথা বেশি করে কেছায় এসেছে সেই সূত্রে নারীর সংগ্রামের চালচিত্র ধরা পড়েছে। এই সংগ্রামের মধ্যে বহু সংস্কৃতি এসে মিশেছে, ‘গুলে বকাওলী’ কাব্যে বকাওলী ইন্দ্ররাজার সভায় নৃত্য করছে, তারজন্য স্বামীকে লুকিয়ে সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করে তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়েছে, এ যেন একরকম অভিসার গমন কিন্তু এই গমন কোনও প্রাণপুরুষকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় নয়। এই যাত্রা দেবতাকে তুষ্ট করার যাত্রা, নিজের প্রেমিক পুরুষকে হারানোর ভয়ে একজন নারী সুদূর ইন্দ্রসভায় দেবতাকে তুষ্ট করতেও ছুটে যাচ্ছে। এই যাত্রা অনন্তকালের, এই সংস্কৃতি বহুমান। আশ্চর্যের বিষয় মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় পুরুষদের একাধিক



বিবাহের কথা জানা যায় সেক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা অন্যরকম। কোন নারী পতিগৃহ ত্যাগ দেয়নি, কেউ কেউ হয়তো বা আত্মহননের পথ খুঁজেছে কিন্তু বেশিরভাগ নারীই সতিন নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর থেকেছে। এই যে নারীদের সহনশীলতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা তার কথা জানা যায়। এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে একটু মুসলমান সমাজের দিকে তাকানো দরকার বলে মনে হতেই পারে, এই সমাজে পুরুষের একাধিক বিবাহের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানের চিত্র উঠে এসেছে। এছাড়া মুসলমান গৃহের রমণীর সঙ্গে অন্যান্য নারীর কি তফাত ঘটে যাচ্ছে এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতে হয়।

‘ছ’ি নেক বিবির কেছা’তে লক্ষ করা যায় প্রথমদিকে নারীরা চুপ থাকলেও সময় যত এগিয়ে এসেছে নারীরা প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাচ্ছে। আসলে আমাদের সমাজের কিছু কিছু কালচার এমন ভাবে বহু আগে থেকেই তৈরি যা ‘সামাজিক ট্যাবু’কে চিহ্নিত করে। তবে মুসলমান সমাজে এই ট্যাবু মাত্রায় অধিক। সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্যে হিন্দু নারীর জীবন এবং মুসলমান নারীর জীবন পর্যালোচনা করলেই তার ছবি উঠে আসে। ‘গাজী কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথী’ এই কাব্যে হিন্দু রমণী চাম্পার স্নানযাত্রার যে চিত্র কবির ভাষায় উঠে এসেছে সেক্ষেত্রে মুসলমান নারী থেকেছে চিরকাল অন্তঃপুরে। আবার এই ট্যাবুকেই গরীবুল্লাহ ভেঙে দিয়েছেন তাঁর রচিত ‘জঙ্গনামা’ কাব্যে, বিবি হানিফা যুদ্ধক্ষেত্রে হজরত আলির সঙ্গে লড়াই করেছে। নারীর পরাক্রম শক্তির কথা বলেছেন কিন্তু শেষপর্যন্ত যুদ্ধে এই নারীর পরাজয় ঘটিয়েছেন। নারীর বীরত্ব এখানেও খাটো করা হয়েছে। তাই সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে যেমন একটা সমাজের একটা জাতির পরিচয় উঠে আসে ঠিক একইভাবে উঠে আসে পুরুষ-নারীর কথা। তাই সংস্কৃতির আলোচনায় শেষপর্যন্ত বলতে হয় “Culture is the widening of the mind and of the spirit.”<sup>৩১</sup> মুসলমান সাহিত্যিক রচিত কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে এই বহু বিস্তৃত বহু ধারার সংস্কৃতির কথা উঠে এসেছে যা এই আলোচনাকে ঋদ্ধ করেছে অনেকখানি।

## তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Basham. A.L, 'Cultural History of India', Oxford, Oxford University Press, 1985. P.2 (Introduction)

২. হালদার. গোপাল, 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ', কলকাতা, মনীষা, ১৯৬০। পৃ.২০০

৩. চট্টোপাধ্যায়. শ্রীসুনীতিকুমার, 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস', কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ২০০৩। পৃ.৬

৪. Gaur. Vinod K, 'Growing Culture Deficit of Contemporary Indian Society', Economic and Political Weekly, Vol. 44. No. 21 (May 23-29, 2009). P.15

৫. রায়. নীহাররঞ্জন, 'কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি', কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৯। পৃ.৪

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Culture বলতে বুঝতেন শিল্পসাহিত্য ইত্যাদি ভব্যতা, ভদ্রতা, চিত্তোৎকর্ষ, refinement ইত্যাদি। 'কৃষ্টি' শব্দে তাঁর বিরাগ, 'সংস্কৃতি' শব্দে অনুরাগ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তিনিও এই একই ধরনের মত পোষণ করেছেন। নীহাররঞ্জন রায় Culture এর সঙ্গে কর্ষণ এর বা কৃতির সম্পর্ক আছে বলে 'কৃষ্টি' শব্দটি পছন্দ করতেন। অন্যদিকে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কৃষ্টি বলতে 'অবিকল' Culture-ই বোঝাতেন। 'কৃষ্টি'র অর্থ তাঁর কাছে মানুষের 'চিত্তভূমির কর্ষণ' এবং সেই কর্ষণের ফলশ্রুতি শিল্পসাহিত্য, ভদ্রতা-ভব্যতা, refinement, চিত্তোৎকর্ষ ইত্যাদি।

সূত্র: তদেব, ১৯৭৯। পৃ.৮

৭. "কালচার ও রিলিজিয়ন এক নয়, বরং সম্পর্কিত হলেও দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির জিনিস।" তিনি মনে করেন কালচার জীবনের তাগিদেই গড়ে ওঠে, আর রিলিজিয়নের লক্ষ হল সৃষ্টি নয় স্থায়িত্ব।

সূত্র: হালদার. গোপাল, 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ', কলকাতা, মনীষা, ১৯৬০। পৃ.২২৫-২২৬

৮. এই বিষয়ে Sumanta Banerjee বলেন- "The elite and the lower orders- and the ambivalence found in their respective cultural expressions, they manifested certain broad social tendencies and artistic styles which set them abart from each other."

সূত্র: Banerjee. Sumanta, 'The Parlour and the streets Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta', Calcutta, Seagull Books, 1998. P.13

৯. Rahman. A, "History of Indian Science, Technology and Culture A.D 1000-1800", New Delhi, Oxford University Press, 2000. P.47

১০. "When the Turks came to India, they not only had a well-defined faith in Islam to which they were deeply attached, they also had definite ideas of government, art, architecture, etc. The interaction of the Turks with the Indians who held strong religious beliefs and had well-developed ideas of art, architecture and literature resulted, in the long run, in the development of a new enriched culture".

সূত্র: Chandra. Satish, 'History of Medieval India' (800-1700), Hyderabad, Orient Blackswan, 2014. P.182

১১. Majumdar. R.C, "History of Mediaeval Bengal", Calcutta, G. Bharadwaj & co, 1973. P.254

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়. শ্রীশ্রীকুমার, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে সাহিত্য', কলিকাতা, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৭। পৃ.৪৫৭

১৩. Chatterji. Suniti Kumar, 'The Cultural Synthesis', 'Aspects of Indian Culture (tagore centenary volume part II), Vishva Bandhu (Gen Editor), Hoshiarpur, Dev Dutt Sastri, 1961. P.21

১৪. Abdul Latif বলেন- "As a Muslim he believes in a path of life, in an order of society called Quranic or Islamic."

সূত্র: Latif. Dr. Syed Abdul, 'Islamic Cultural Studies,' Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, 1953. P.31

১৫. ঘোষ. কবিতা, 'সপ্তদশ শতকের বাঙালির সমাজ ও সাহিত্য', কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪। পৃ.১১৫

১৬. সমকালীন লেখকদের কাব্যে বাজার/হাটের উল্লেখ এসেছে, যেখানে দোকানিরা বিভিন্ন পণ্য বেচাকেনা করতেন।

সূত্র: করিম. আবদুল, 'বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)', ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৬। পৃ.২৭৭

১৭. মুসলমানরা ইউনানী নামে গ্রীক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। এই ইউনানী চিকিৎসকরা হাকিম নামে অভিহিত ছিলেন।

সূত্র: তদেব। পৃ.২৮২

১৮. তদেব। পৃ.২৮৮

১৯. প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বলেন- “Many of the Hindus who were forcibly converted to Islam, were offered high positions and attractive jobs in the administration of the Muslim rules, as a matter of compensation, and also for attracting other Hindus for such beneficial conversion, to which many of the low-caste Hindus responded and accepted Islam.”

সূত্র: Bandyopadhyay. Pranab, ‘Indian Culture And Heritage’, Calcutta, Book club, 1991. P.73

২০. করিম. আবদুল, ‘ইসলামের ইতিহাস পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন (প্রাচীন সভ্যতা থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)’, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২০। পৃ.২৩

২১. আবদুল করিম এ বিষয়ে জানান- “The higher class people used to appoint slaves both males and females for house-hold works. ....The slaves were bought and sold in the market-places.”

সূত্র: Karim. Abdul, ‘Social History of The Muslims In Bengal’ (down to A.D 1538), Dacca, The Asiatic Society of Pakistan, 1959. P.196

২২. তদেব। P.173

২৩. ১৪৩৬ খ্রিস্টাব্দে ফেই-সিন কর্তৃক সংকলিত চৈনিক বিবরণে শিং-চা-শেং-লান বলেছেন- “পুরুষরা সাদা সুতি পাগড়ি ও লম্বা সাদা সুতি শার্ট পরিধান করে। তারা পায়ে সোনার সুতার কাজ করা ভেড়ার চামড়ার তৈরি নিচু জুতা পরে।”

সূত্র: করিম. আবদুল, ‘বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)’, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৬। পৃ.২৮৫

২৪. যবন সম্পর্কিত বিষয়ে শ্রীমতী সরলাদেবী ঘোষাল মতামত প্রকাশ করে বলেন- “Whatever many have been the original application of the term “Native”, its present use as a term of contempt admits of no doubt. In the same way the epithet “Yavana” has become hopelessly pointed.”

সূত্র: মোহাম্মদ. দোহায়েতউল্লা, 'বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান', 'নবনূর' মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কলিকাতা, কার্তিক ১৩১১। পৃ.৩১৫

২৫. এই কাব্যে দেখি ঈশ্বরী পাটুনি খেয়া পারাপারের কাজে নিযুক্ত।

“সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।

তুরায় আনিল নৌকা বামা-স্বর শুনি।।”

সূত্র: গোস্বামী. মদনমোহন (সংকলন ও সম্পাদনা), 'ভারতচন্দ্র', কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৬। পৃ.৬৬

২৬. চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের বিদ্যাসাগরের জীবনী গ্রন্থে বরিশালের এক ব্রাহ্মণের ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত ৫৩ টি বিবাহ প্রসঙ্গ দেখা যায়।

সূত্র: হোসেন. মোহাম্মদ গোলাম, 'বাঙ্গালা দোভাষী পুঁথি', 'মাসিক মোহাম্মদী', মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬। পৃ. ৪৮১

২৭. কৃষি দেশের অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন হওয়ায় বাংলার এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল।

সূত্র: করিম. আবদুল, 'বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)', ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৬। পৃ.২৮১

২৮. ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে হুয়াং সিং সেং সঙ্কলিত চৈনিক বিবরণে সি ইয়াং চাও কেং তিয়েন-লু বলেছেন- “মহিলারা মাথায় খোঁপা বাঁধেন। তাঁরা খাটো জামা পরেন এবং এক টুকরো রঙিন রেশমি বা কিংখাবের কাপড়ে শরীর ঢেকে রাখেন। তাঁরা দামী পাড় বসানো সোনার দুল পরেন। তাঁদের গলায় থাকে লকেট, মনিবন্ধে ও গোড়ালিতে সোনার বালা এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুলে আংটি।”

সূত্র: তদেব। পৃ.২৮৫

২৯. ইসলামি শিক্ষায় একজন ব্যক্তিকে আলিম হওয়ার জন্য যে সব বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয় তার মধ্যে তফসির (ভাষ্য), হাদিস (রসুলের বাণী), ফিকাহ (ইসলামি আইন), উসুল-উল-ফিকাহ (ইসলামি আইনের নীতি), তাসাওউফ (অতীন্দ্রিয়বাদ), আদব (সাহিত্য), নাহও (ব্যাকরণ), কালাম (দার্শনিক রীতি-নীতি) ও মস্তিক (যুক্তিবিদ্যা) অন্তর্ভুক্ত।

সূত্র: তদেব। পৃ.১৩৬

৩০. Karim. Abdul, 'Social History of The Muslims In Bengal' (down to A.D 1538), Dacca, The Asiatic Society of Pakistan, 1959. P.176

৩১. পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সংস্কৃতি বিষয়ক মন্তব্যে এই কথা বলেন।

সূত্র: Bandyopadhyay. Pranab, 'Indian Culture And Heritage', Calcutta, Book club, 1991. P.5

## পঞ্চম অধ্যায়

### মুসলিম বাংলা সাহিত্য: সুফি সাধনার প্রভাব

ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে সুফিদের কথা অনায়াসেই এসে যায়। এদেশের জনসাধারণের উপর সুফি মতবাদ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যযুগের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ কিছুটা ঘটেছিল সুফি সাহিত্য ও গানের মধ্য দিয়ে। সুফিবাদ বিভিন্ন বৈচিত্র্যময়তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। সুফিবাদের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু ঐতিহ্যের জন্ম দেয়, সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও লৌকিক ঐতিহ্যের কথা বলা যেতে পারে।<sup>১</sup> এই সুফিরা কোরানকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা কেমন হবে তার কথা বলেন। সুফি সাধনা কী? এর আগমন কবে এবং কীভাবে? সুফিবাদ জীবনযাত্রার কোন দিকের কথা বলেছে? সুফিবাদের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের কোনও বিরোধ আছে কিনা? এবং সর্বোপরি সুফিবাদ কিভাবে হিন্দু-বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে মিলে গেছে এই বিষয়গুলি আগে জানা দরকার। সুফি সাধনা হল- “ইহা রাগাত্মিকা ভক্তির পথ, মাধুর্যসের সাধনা অর্থাৎ পরমেশ্বরকে দয়িত (beloved) মনে করিয়া, প্রেমিক কিংবা প্রেমিকার আবেগ নিয়া, দিব্যোন্মাদে তাঁহার সহিত মিলনের চেষ্টা।”<sup>২</sup> এনামুল হক সুফিদের সম্পর্কে বলেছেন-

“It is said that whoever came in contact with the saint, accepted Islam and became a devoted follower of the saint.”<sup>৩</sup>

সুফি শব্দের উদ্ভব নিয়ে অনেকেই অনেক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন ‘সুফী’ শব্দ আরবি ‘স্বফা’ ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে- এর অর্থ ‘পবিত্রতা’। সর্ববিষয়ে অন্তরে বাইরে পবিত্র ব্যক্তিরাই ‘সুফী’।<sup>৪</sup> ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভেই সুফিদের আগমন ঘটে। স্যার গিব হ্যামিলটন (Sir Gibb Hamilton) এ প্রসঙ্গে জানান-

‘From the 7th-13th century, moreover, Sufism increasingly attracted the creative social and intellectual energies within the community to become the bearer or instrument of a social and cultural revolution a process hastened on by the destruction of the still vigorous centres of Islamic culture in North Persia during the Mongol invasion of 1220.’<sup>৫</sup>

পঞ্চদশ শতাব্দী এই সময় থেকে শহরে, গ্রামে বাংলার সর্বত্র নিজেদের জায়গা দখল করে নেয় সুফিরা। তুর্কি বিজয়ের পরে সমাজে অস্থিরতা বেড়ে যায়। সে সময়ে বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটে। বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও তান্ত্রিক শক্তিপূজাকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম টিকে থাকে কোনোমতে। ইসলাম ধর্ম এই সময় একটা বিরাট পরিসর তৈরি করে নেয়। ভারতবর্ষে ইসলামের অনুপ্রবেশের সূত্রে জানতে পারি-

“The rise of Islam in the beginning of the seventh century and the unification of the Arab tribes under a centralized state gave a tremendous impetus to the movement of expansion which was going on since pre-Islamic days. Muslim armies rapidly conquered Syria and Persia and began to hover on the outskirts of India. Muslim merchants immediately entered into the inheritance of Persian maritime trade, and Arab fleets began to scour the Indian seas.”<sup>৬</sup>

ভারতে ইসলাম ধর্ম দুইভাবে দেখা যায়- ১. শরিয়ৎ বা শাস্ত্রের অনুমোদিত গোঁড়া ইসলাম, ২. সুফি মতের ইসলাম। বাংলার সুফিদের কথা বলতে গেলে উত্তর ভারতীয় সুফিবাদের প্রসঙ্গ আলোচনা আবশ্যিক। ভারত ছাড়াও সুফিদের প্রভাব বাইরের দেশেও ছিল। উত্তর পশ্চিমভারতে সুফিবাদের বিস্তার ঘটে। দিল্লির সুলতানি রাজত্বের সময়ে সুফিরা ভারতীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে একটা জায়গা দখল করে নেয়। অল-হুজুরী তাঁর ‘কাশফ-উল-মাজহুব’ এ সুফি বলতে তাদেরই বলেছেন-

“যারা প্রকৃত অর্থে সন্ত বা দরবেশ এবং যাদেরকে পরিচালনা করার জন্য আধ্যাত্মিক জগতে বেশ কয়েকজন পির বিশেষ কর্তৃত্ব করেন। সুফি হবেন এমন একজন যিনি আধ্যাত্মিক দিক থেকে একেবারে খাঁটি এবং যিনি সব ত্যাগ করে ভগবানের চিন্তায় বিভোর।”<sup>৭</sup>



সৈয়দ রিজভি (Saiyid Rizvi) বলেছেন সুফিবাদ কোনও কঠোর ব্যবস্থা নয়। সুফি একটি পথ যার দ্বারা তাঁর অনুসারীরা ঈশ্বরের সন্ধান করেন, পুরুষের আত্মা যেখানে উপস্থিত। তপস্বী, শুদ্ধি, প্রেম এবং জ্ঞান সার্বজনীন আত্মাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে সর্বদাই।<sup>১৭</sup> এই মত থেকে আমরা এ. রহমান (A. Rahman) এর বক্তব্যকে তুলে ধরতে পারি-

“Sufism in fact was not one single system. It was as complex as the various trends in medieval life, society and culture woven together.”<sup>১৮</sup>

Idries Shah তাঁর ‘The Way of the Sufi’ গ্রন্থে জানিয়েছেন ১৮২১ খ্রিঃ জার্মান ভাষা থেকে ‘Sufism’ শব্দটি গ্রহণ করা হয়। ‘The Qadris’ শব্দটি অনেকসময় সুফি সম্পর্কিত ধারণাকে বোঝাত। ধর্ম আচরণের কিছু নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন Qadris. তিনি ১১৬৬ খ্রিঃ মারা যান। তাঁর নামেই এই ধর্মকে বোঝানো হত। অনেকসময় ‘The people of Truth’ কিংবা ‘The Masters’ বা ‘The Near Ones’ ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যেত। আরবি শব্দগুচ্ছ ‘মুতাসাউইফ’ (Mutassawif) এর অর্থ হল যে সুফি হওয়ার জন্য সাধনা করে (he who strives to be a sufi). ‘Sufism’ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। পশ্চ্য এবং পশ্চাত্য হাজার বছর ধরে এই ধর্মমত পাওয়া যায় বলে মনে করেছেন অনেকে। সুফি আরবি শব্দ হিসেবে পাওয়া যায়, এর উচ্চারণ ‘সূফ’ (Soof) এর আক্ষরিক অর্থ ‘উল’ (Wool). এই ‘উল’ দিয়ে মুসলিম মিস্টিকরা তাঁদের Robe বা সাধারণ পোশাক তৈরি করতেন। Idries Shah বলেন সুফি সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। নিকলসন (Nicholson) ও জানান সুফি শব্দের কোন উৎপত্তি পাওয়া যায় না। Idries Shah সুফি সাধনা সম্পর্কে বলেন-

“But this kind of thinking will not ultimately succeed on a wide scale because, far from being found only among primitive tribes or buried in books in dead languages, the sufi ideas are in varying degrees contained in the background and studies of over fifty million people alive today: those connected in some way with Sufism.”<sup>১৯</sup>

Mohammed Ali El-Misri, Sufism এর ভিত্তি হিসাবে ‘faith’ এর কথা বলেছেন, এই Faith (বিশ্বাস) এর ৬ টি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন- God Exists: ঈশ্বর আছেন বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসে, God is One: ঈশ্বর এক ‘আল্লাহ্ আকবর’, There are Angels: Angels (দেবদূত) আছেন, There are Prophets: ধর্মপ্রবক্তা আছেন। হজরত মোহাম্মদ একজন ধর্মপ্রবক্তা। There is a Day of Restoration: একদিন সবাই মিলিত হবে। মৃত্যুর পরবর্তী সময় এর কথা বলা হয়েছে। There is Fate: ভাগ্য বা নিয়তি আছে।” সুফিরা মনে করেন এই ৬টি বিশ্বাসই তাঁদের ঈমান (Iman) যা কিনা- ‘Islamic faith’. একজন সুফিকে অদৃষ্টবস্তুরে বিশ্বাসের কথা বলা হয়। শুধু বিশ্বাস নয় পূর্ণবিশ্বাস করতে হবে। অদৃষ্টবস্তুটি কী? এই দৃশ্যমান জগত ও বস্তু ব্যতীত তার বাইরে যে অদৃশ্যমান এক জগত আছে, তার সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে না পারলে, মানুষের সাধারণ জ্ঞান পূর্ণ হয় না। সেই জগত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলে, তার অস্তিত্বের উপর সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়। সুফি সাধনার ধারায় চারটি অবস্থার কথা আমরা জানতে পারি- ক. অদৃষ্ট বস্তুতে বিশ্বাস বা ‘ঈমান’, খ. অদৃষ্ট বস্তুর অনুসন্ধান বা ‘ত্বলব’, গ. অদৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ বা ‘ইরফান’, ঘ. অদৃষ্ট বস্তুতে বিলীন বা ‘ফনা-ফীল্লাহ্’।<sup>২</sup> অর্থাৎ একজন সুফি সাধককে তাঁর অভীষ্ট পূরণ করতে এই স্তরগুলির ভিতর দিয়ে যেতে হয়। যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত চিন্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেন অর্থাৎ বিলীন হয়ে যান তার আনন্দ অনেকটাই আবেগহীন প্রশান্তির বিরোধী, একথা অনেকেই বলেছেন। নিকলসন এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন।

বাংলায় যে সুফি বিকাশ তার পিছনে আরব, সিরিয়া, ইরাক ও খোরাসানের প্রভাব ছিল। পাশাপাশি বৌদ্ধভাবধারার প্রভাবও ছিল। ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষের পরিস্থিতিতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে, এই পরিবর্তনের হাত ধরেই ভারতে সুফিদের আগমন ঘটে। যারা ইসলামধর্মকে অবলম্বন করে ভারতীয়দের মনে এক বিরাট জায়গা করে নেয়। বলা যেতে পারে, সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সুফিবাদ তা মূলত একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর পারস্যে যে সুফিবাদের বিকাশ হয়েছিল

তার মিশ্রিতরূপ। হজরত মোহাম্মদ এর জীবনাদর্শ সুফিদের নানাভাবে প্রভাবিত করে। এই সুফিরা কয়েকটি ধারা মেনে চলার কথা বলেন- ক. শরিয়ত (পন্থা বা পথ), খ. তরিকত (পদ্ধতি), গ. হকিকত (ইহজাগতিক ভোগ-লালসা, দেহভার প্রভৃতি থেকে মুক্ত হওয়াকে বোঝায়), ঘ. মারফত (জ্ঞান বা প্রজ্ঞা)।

সাধারণ ধারণা থেকে মনে করা হয় সুফিরা চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত- ১.চিশতী, ২.কাদেরী, ৩.সুহরাবদী, ৪.নকসবন্দী। যে শ্রেণির সুফি হোক না কেন প্রত্যেকেই এই নির্দিষ্ট ধারা মেনে চলতে হতো স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। বাংলার সুফিদের কথা বলতে গেলে চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লির শাসনব্যবস্থার দিকে চোখ রাখতে হয়। সেই সময় দিল্লিতে চিশতী শ্রেণির আধিপত্য দেখা গেলেও বাংলায় এর আধিপত্য কম ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার মুসলমান সমাজে সুফিদের বিশেষ প্রভাব ছিল, এই সময় মীর সৈয়দ মুহাম্মদ কাদিরি উল্লেখযোগ্য সুফিদের একজন ছিলেন। বাংলার গভর্নর শাহ সুজা এদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরে মতবিরোধ হওয়ার ফলে শাহ সুজা রাজমহল ত্যাগ করে আরাকানে পালিয়ে আসে, ফলে আরাকানেও এই কাদেরী সুফিদের প্রভাব পড়ে কিছুটা। আবার এই সময়ে রাজধানী (দিল্লি)তে হোসেন শাহ এর সময় চিশতী শ্রেণির প্রভাব এসে পড়ে। বাংলায় যে একাধিক সুফির আগমন ঘটে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিশতী সম্প্রদায়। দৌলত কাজি নিজে চিশতী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সুফিরা সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে তারা বিমুখ ছিলেন।

ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশে যে সুফিবাদের বিকাশ হয়েছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ'র (স্রষ্টা) প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। মুসলমান ধর্মের যে গোঁড়ামি, কুসংস্কার ছিল তার থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখায় সুফিবাদ। সুফি সম্প্রদায় বিজ্ঞানমূলক চিন্তাভাবনার পরিচয় দেয়, তবে 'কোরান' থেকে বেরিয়ে এসে নয়। সুফিরা ইসলামকে ভোলেনি, 'কোরান' এর সমর্থনকেই সম্বল করে জীবন ও ধর্মকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছে।<sup>১০</sup> হিন্দু ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যবাদের কাছাকাছি থাকার ফলে সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগতন্ত্রের প্রভাব পড়ে। যোগ ও তন্ত্রের ধারণা পারস্য থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে

পড়ে। এই পারস্য প্রভাব ভারতীয় সুফিদের মধ্যেও দেখা যায়। শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন যে বৈষ্ণবদের কীর্তন, সহজিয়া দোহা, বাউল গান, সুফি সমা একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুফিদের মুর্শিদ ও হিন্দুদের গুরুর মধ্যে কোনও তফাত নেই।<sup>১৪</sup> বাংলার মিশ্র সুফিবাদ গড়ে ওঠার পিছনে হিন্দু-বৌদ্ধভাবধারা প্রভাব বিস্তার করে। তাই মধ্যযুগের সুফিদের উপর হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য) ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যায় না। ইসলামে সুফি চিন্তার উপর ব্রাহ্মণ্য প্রভাব সম্পর্কে বহু আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। একাদশ শতাব্দীর পর থেকে ভারতে সুফি ও যোগীদের মধ্যে যোগাযোগ এবং দ্বন্দ্ব আরও অর্থবহ হয়ে উঠতে থাকে।<sup>১৫</sup> সুফিবাদে যে চিন্তার কথা এটা যেন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের আদব-কায়দার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। চিশতী সুফিদের জীবনযাপন পদ্ধতি তাই অনেকটা হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাবধারা মিশ্রিত। শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন-

“বাংলাদেশে খাটি শরীয়তী ইসলাম কখনো অনুসৃত হয়নি। সুফীমতের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল বাঙালি মুসলমানদের ধর্ম। সর্বেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদের প্রভাব ছিল মুসলমানদের মজ্জায়। মধ্যযুগের সব কবির স্তুতি অংশে আল্লা ও রসুল অভিন্ন সত্তা বলে পরিগণিত হতো।”<sup>১৬</sup>

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে মুসলমানদের ধর্মসাধনায় ইরানের সুফি প্রভাব যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাব ফেলে এছাড়া বৈষ্ণব সাধনায় এই প্রভাব স্পষ্ট। সুফি জীবন দর্শনের অনেক দিকের সঙ্গে বৈষ্ণবদের নাম-জপের মিল পাওয়া যায়। এই ভাবেই বাংলায় সুফি মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং সাহিত্যে তার নিদর্শন আমরা পেয়ে থাকি।<sup>১৭</sup> সুফিরা মনে করেন জীব ও জগৎ সৃষ্টি করে আল্লাহ নিজেই প্রকাশ করেছেন। সুফিদের কথার মূল সারবস্তু প্রেমবাদ। ‘Sufi means love’.<sup>১৮</sup> সে প্রেম আল্লাহ প্রেম। সুফিরা মরমীয়া হলেও ইসলামকে ভোলেনি, কোরানকে আশ্রয় করে বৈরাগ্যের দিকে এগিয়ে গেছে। সৃষ্টি-প্রেমেই স্রষ্টা-প্রেমের বিকাশ। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্ট জীবের সম্পর্ক অদ্বৈত। সুফিরা মনে করেন প্রেমিক-প্রেমিকা বা আশিক-মাশুকের যে সম্পর্ক সৃষ্ট জীব ও স্রষ্টার সম্পর্কও

সেইরূপ। বৈষ্ণবদের কাছে এই ভাবনা বিপরীত, বৈষ্ণবদের কাছে আশিক স্রষ্টা, মাশুক সৃষ্ট জীব।

**সুফি মত:** আশিক(প্রেমিক/ভক্ত/পুরুষ)= সৃষ্ট জীব

মাশুক (প্রেমিকা/ঈশ্বর/নারী)= স্রষ্টা বা আল্লাহ

**বৈষ্ণব মত:** আশিক(প্রেমিক/ঈশ্বর/পুরুষ)= স্রষ্টা বা ভগবান

মাশুক(প্রেমিকা/ভক্ত/নারী)= সৃষ্ট জীব

এই সুফি মতবাদ মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় কতটা স্পষ্ট ছাপ ফেলে তা এই অধ্যায়ের আলোচনায় এসেছে। নারী-পুরুষের যে প্রেম কাব্যের কাহিনি অংশে বর্ণিত হয়েছে তা আসলে সুফি প্রেমতত্ত্বকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই। প্রেমিক পুরুষ তার নায়িকার উদ্দেশ্যে যে যাত্রা করেছে তা সুফিবাদকে ইঙ্গিত করে। এক্ষেত্রে নারী স্রষ্টার ভূমিকা পালন করেছে। স্রষ্টা অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্মানে সুফিরা মরমীয়া হয়ে ওঠে।<sup>১৬</sup> নারীদের ভিতর দিয়েই আসলে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের এক পন্থা খুঁজে নিতে চেয়েছেন প্রেমিক পুরুষ বা সৃষ্ট জীব। অন্যদিকে নারীর যোগিনী রূপের পরিচয় কাব্যের ভিতর এসেছে। ফলে মুসলমান সাহিত্যিকদের কাব্যরচনায় সুফি প্রভাব যেভাবে এসেছে তা হিন্দু বৈষ্ণবমতকেও ছুঁয়ে যায়।

### ক. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে সুফি প্রভাব

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার প্রচেষ্টায় অনেক মুসলমান সাহিত্যিক কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। আরাকান রাজসভার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের অন্যতম দৌলত কাজি। জন্মসূত্রে ইনি আরাকানী নন, দৌলত কাজি চট্টগ্রামের সুলতানপুর গ্রামের বাসিন্দা। দৌলত কাজি রচিত কাব্যের নাম ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’। এই কাব্যে সুফি ভাবনার প্রভাব উল্লিখিত হয়েছে। আবার শুধুমাত্র যে সুফি মতবাদ তা নয়, কোরান উল্লিখিত ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্মের কথাও কাহিনি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দু সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্যে ধর্মকেন্দ্রিক বিষয়গুলি যেভাবে ফুটে উঠেছে, (যেমন- মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি) পাশাপাশি মুসলিম সাহিত্যিকদের

রচিত সাহিত্যে তুলনামূলকভাবে তার প্রভাব কম। মঙ্গলকাব্যগুলির অভীষ্ট হচ্ছে কোনও দেবতার পূজা প্রচার ও মাহাত্ম্যব্যঞ্জক। ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’ সে ধরনের কোনও কাব্য নয়, ধর্মমূলক ব্যাখ্যা কাব্য মধ্যে এসেছে, তবে ধর্ম প্রচারমূলক কোনও অভীক্ষার কথা কাব্যে নেই। মধ্যযুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের বেশীরভাগই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান লিখে কৃতিত্বের জায়গা তৈরি করে নেয়। মুসলমান সাহিত্যিকদের প্রণয়োপাখ্যান রচনায় সুফি প্রভাব কিভাবে এসেছে তা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যের আলোচনায় উঠে এসেছে। গবেষণায় নির্বাচিত সাহিত্যগুলির মধ্যে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ থেকেছে। দৌলত কাজি রচিত ‘লোরচন্দ্রাণী’ গ্রন্থে ‘চন্দ্রাণী দর্শনান্তে যোগীর মূর্ত্তা’ এই অংশে যে সমাধির উল্লেখ আছে তা আপাতভাবে হিন্দু যোগসমাধির ব্যাপার মনে হতে পারে।

সমাধি চরিত নাহি জানি রীত  
কে জানে তাহার মরম।  
যে করে সমাধি হয় সর্বসিদ্ধি  
কি করিব কাল যম।। (পৃ.৪০)

যোগী চন্দ্রাণীকে সমাধির ভিতর দিয়ে সিদ্ধিলাভের পথে পেতে চাইছে। ডামরতন্ত্র অনুযায়ী বলা যেতে পারে সমস্ত অপদেবতারা দেবতার রূপ ধরে সাধকদের ছলনা করে। এই সমস্ত স্তরগুলি বদলাতে বদলাতে সাধক যখন চূড়ান্ত সিদ্ধিতে যায় তখন তার সমাধি হয়। যোগীর সমাধি পার্বতীকে ভেবেই হয়েছে অন্য কোনও ভাবনা থেকে নয়। চন্দ্রাণীকে পার্বতী ভেবে তার উদ্দেশ্যে প্রেমিক পুরুষের যাত্রা শুরু হয়েছে।

সাক্ষাৎ পার্বতী জানি রূপবতী  
ধ্যানে দৃষ্টি করি রহিল।। (পৃ.৪১)

আলোচ্য কাব্যে যোগীর যে সমাধি তা কিন্তু পার্বতীকে পাবার জন্য। এখানে স্রষ্টা পার্বতী, যা বৈষ্ণবমতের বিপরীত ভাবনা। হিন্দু যোগী যেভাবে সমাধি করে সে-ভাবেই সমাধি হচ্ছে, তবে নারীকে ঈশ্বররূপে পেতে চাইছে। ফলে এই হিন্দু যোগীর উপরে সুফিতত্ত্ব Superimpose বা আরোপ করা হয়েছে। এটা কাব্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ

জায়গা, যেখান থেকে সুফি আলোচনার জায়গা উঠে আসে। হিন্দু-মুসলিম ভাবনা মিশে গিয়ে মিশ্রভাবনার রূপ তৈরি করে দিয়েছে, এখানে ভারতীয় যোগদর্শন এবং সুফিতত্ত্ব মিশে গেছে। সতীশচন্দ্রের কথায় জানা যায়-

“Thus, Hindu and Buddhist Practices and rituals seem to have been absorbed and assimilated by the sufis even before they came to India.....there were many similarities in the ideas of the sufis and the Hindu yogis and mystics about the nature of God, and His relationship with the soul, and the material world.”<sup>২০</sup>

লোরক চন্দ্রাণীর সাক্ষাৎ পেতে সমাধি করছে, নিজেকে যোগীরূপে সাজিয়ে তুলেছে।

যোগীরূপে রহ গিয়া যথাদেব স্থান।  
রহিবা সমাধি জুড়ি দেবী বিদ্যমান।।  
দর্শন উপায় তোক্ষা কহিলুঁ নিশ্চয়।  
যোগীরূপে রহ গিয়া সেই দেবালয়।।  
কুমারীহ পরব দিনেত তথা যাইব।  
দুইর দর্শন মনোরথ তথা হইব।।  
মহাযোগী হয় যদি পরম সমাধি।  
তাকে নাহি খেদায়ন্ত হেন আছে বিধি।। (পৃ.৫৯)

সুফিদের যে গুরুবাদের তত্ত্ব তা এই কাব্যে দেখা যায়। সুফিরা গুরুবাদী, সুফিদের মুর্শিদ ও হিন্দুর গুরুর কোন পার্থক্য নেই, অধ্যাত্ম-সাধনা মাত্রই গুরুনির্ভর।  
ড. উরকুহাট গুরুর সম্বন্ধে বলেছেন-

“In course of the development and a result of it, devotion to truth and devotion to the Guru become always synonymous.”<sup>২১</sup>

গুরুর আনুগত্যই সাধনায় সিদ্ধির একমাত্র পথ। সুফিদের গুরুবাদ ও হিন্দু-বৌদ্ধধর্মের অনেকটাই মিল আছে। সুফিরা শাস্ত্রকথার পাশাপাশি পীর বা ফকির বা গুরুকে মান্য করেন। গুরুকে সেবা করার পদ্ধতিতে স্রষ্টার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে চেয়েছেন।<sup>২২</sup> দৌলত কাজি তাঁর কাব্যে গুরুর মহিমা তুলে ধরেছেন।

গুরুভক্ত হয় যে সাধক শুদ্ধমতি।

তাহাকে দেখন্ত স্বর্গ কুপাময় পতি।। (পৃ.১)

বাঙালিদের যে সুফি সাধনা তা হিন্দু-বৌদ্ধতন্ত্রের ভিতর দিয়ে যেমন উঠে আসে ঠিক একইভাবে সুফি মিষ্টিকদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়। হিন্দু সাধনার তিনটি স্তরের কথা জানা যায়- ১. প্রবর্ত ২. সাধক ৩. সিদ্ধি। অপরদিকে সুফি সাধনার চারটি স্তরের কথা জানা যায়- ১. নাসুতী ২. মালাকুতী ৩. জবারুতি ৪. লাহুতি। এই স্তরগুলির সাধ্যসীমায় পৌঁছাতে গেলে মুর্শিদ বা গুরু আবশ্যিক। লোরক চন্দ্রাণীকে পেতে যাত্রাপথে গুরু হিসাবে যোগীকে পথপ্রদর্শক করেছেন। আবার অন্যদিকে দেখা গেছে লোরক বৈদ্য/ধাঐকে গুরু সমতুল্য মনে করেছে। চন্দ্রাণীর সঙ্গে লোরক এর মিলন ঘটেছে ধাঐর সহযোগিতায়।

নৃপতি বোলয় বৃদ্ধা না কর সংশয়।

যাবত আক্ষার জীব তোক্ষার নির্ভয়।।

এহি উপকার কর মাগি পরিহার।

চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিল করাও আক্ষার।।

বৈদ্য হৈলে সকলের গুরু সমতুল। (পৃ.৫৯)

‘চন্দ্রাণীর মিলন’ অংশে জগতের নশ্বরতা সম্পর্কে সুফিমত এক রকমভাবে প্রকাশ পেয়েছে-

দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার।

এক যায় এক আইসে কেহ নহে কার।।

এসব জানিয়া মতিমন্ত বধুজন।

দানধর্মে যায় চারিদিবস জীবন।। (পৃ.১০১)

এছাড়াও দৌলত কাজির ‘সতীময়না’ গ্রন্থে বিরহিনী ময়নার প্রতি মালিনীর উপদেশবাক্য সুফি প্রেম সাধনার আভাস দেয়-

যেবা বোল ময়না তুম্বি মৃত্তিকার কায়া।

মাটি লক্ষ্যে কেলি করে পঞ্চভূত মায়া।।

মাটি মাটি করি ময়না কিবা বাখানসি।



পরমার্থ মাটি ভেদ ময়না না জানসি।। (পৃ.১২১)

মিয়া সাধনের 'মৈনাসৎ' অংশের ২১ নং চৌপাঈ-এ এমন ব্যাখ্যা মেলে-

মাটী মাটী কথা বখানৈ।

মাটী ভেদ ন মৈনা জানৈ।।

মাটী উপর দ্রিব বিধি মেলা।

পরমহংস মাটী মৈঁ খেলা।। (পৃ.১৬৫)

আরও একটি বিষয় কাব্যের মধ্যে লক্ষ করার মতো, লোরক সুফি সাধনার বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে সাধকে পরিণত হতে চেয়েছে, ব্যক্তি মানুষ থেকে সুফি সাধকে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র নিজের প্রেমিকা (মাশুক)কে পাওয়ার জন্য। সুফি সাধনার মূল জায়গার দিকটি হল Transformation বা রূপান্তরিত হওয়া। হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে উপলব্ধির জায়গা হচ্ছে Perception. এই Perception না হলে Transformation হবে না। সৈয়দ রিজভি (Saiyid Rizvi) বলেন একজন নিখুঁত যোগী তার ইচ্ছা অনুযায়ী দেহকে রূপান্তর করতে পারে।<sup>২০</sup> 'দেবীমন্দিরে লোরচন্দ্রাণী সাক্ষাৎ' অংশে লোরক যোগীরূপ ধারণ করেছে চন্দ্রাণীর দর্শন পেতে। ব্যক্তি লোরক যোগীতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

যোগীরূপে লোর যাইব সেই দেবালয়।।

সত্বর সন্ধানে যাই সেই দেবস্থান।

লোরক থাকিব ধ্যানে দেবী বিদ্যমান।।

তাহার তোম্কার তথা হৈব দরশন। (পৃ.৫৮)

কাব্যের শেষের দিকে 'সতীময়না' অংশে ময়নার পরলোকে গিয়ে লোরকের সঙ্গে মিলিত হবার কথা ব্যক্ত হয়েছে। এই মিলিত হবার বিশ্বাস যা সুফি ধর্মের Faith (বিশ্বাস) এর ইঙ্গিত দেয়।

যবে ইহলোকে না মিলে লোরকে

পরলোকে হৈব সঙ্গ। (পৃ.১৪২)

সুতরাং, বলা যেতে পারে বাংলাদেশে সুফিতত্ত্ব ও সুফি সাধনা একটি ব্যাপক রূপ লাভ করেছিল। ভারতে যে সব সুফি সাধক প্রবেশ করেন তাঁদের পক্ষে ভারতীয় হিন্দু অধ্যাত্তত্ত্ব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বৌদ্ধ নাথপন্থ, সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনা, যোগ সুফিদের আকৃষ্ট করে। হিন্দু তান্ত্রিক যে সাধন তত্ত্বের কথা বলে মুসলমান সুফিরাও এই সাধনায় আস্থা রেখেছে। ফলে সুফিতত্ত্বে মিশ্রভাবনার দর্শন মেলে। এ. রহমান এর বক্তব্যে জানা যায়-

“The Sufi tradition had its similarity in practices with the Bhakti, and the ascetic practices of the Brahman.”<sup>২৪</sup>

দৌলত কাজির ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’ কাব্য নিয়ে সুকুমার সেন, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল এঁনারা প্রত্যেকেই কাব্যের মধ্যে সুফি ভাবনার কথা বলেছেন কিন্তু বিস্তারিত তেমন ব্যাখ্যা করেননি। সুকুমার সেন এই কাব্যটিকে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য হিসাবে বিবেচনা করেছেন। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- “সুফীভাবনার প্রকাশ কাব্যের বহিরঙ্গে কোথাও কোথাও থাকলেও অন্তরঙ্গে এটি বিশুদ্ধ প্রণয় রোমান্স।”<sup>২৫</sup> এছাড়া আরও বলেছেন মুসলমান সাহিত্যিক রচিত কাব্যগুলি ধর্মভাববিবর্জিত আখ্যানকাব্য। প্রত্যেকেই প্রায় বলেছেন যে এই কাব্যে সুফি প্রভাব এলেও এটা রূপক আকারে এসেছে, এছাড়া কাব্যের বিচ্ছিন্ন কতগুলো জায়গায় সুফি প্রভাব পড়েছে এবং এটা ধর্মনিরপেক্ষ কাব্য। এই সমস্ত সমালোচক সাহিত্যিকদের মতামত গ্রহণ করে পাশাপাশি Idries Shah এর ‘The Way of The Sufi’ গ্রন্থের বিষয়গুলির দিকে চোখ রাখলে বা গ্রন্থের বক্তব্য অনুসরণ করলে বহিরঙ্গে সুফি সাধনা এবং অন্তরঙ্গে প্রণয়কাহিনি এই মতটি সহজভাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাঁধা আসে। Idries Shah গ্রন্থমধ্যে জানিয়েছেন- সুফি মতবাদ নানারূপে প্রকাশিত। এটিকে একটি সমস্যা হিসাবে দেখা হয়েছে, কোনও একটি প্রথার ভিতরে সুফিবাদ নির্ধারিত নয়। ফলে বিভিন্ন ভাবনাকে এক জায়গায় মেলাতে গিয়ে তান্ত্রিকরা সমস্যায় পড়েছেন। অনেকে সুফিকে ধর্মের আবরণে দেখেছেন, অনেকে দেখেছেন রোমান্টিক কবিতা হিসাবে, কেউ কেউ কৌতুক কাহিনি এবং উপকথার ভিতর দিয়ে লক্ষ করেছেন।

অনেকে আবার শিল্পরূপের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে চান। সমালোচকরা বলেছেন একজন সুফি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারেন এই বক্তব্যগুলি যুক্তিযুক্ত কিনা। ইনি গ্রন্থ মধ্যে জানিয়েছেন অনেক সুফি সাধক রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের ভিতর দিয়ে সুফি সাধনার পথ অনুসন্ধান করেছেন। সুতরাং, এইক্ষেত্রে ‘অন্তরঙ্গ প্রণয়কাহিনি’-ই এক সময় সুফি সাধনার পথ হয়ে দাঁড়ায়।

“Another Sufi idea, producing a problem which many have found impossible to integrate in their minds, is the Sufi insistence that Sufism can be taught in many guises. Sufis, in a word, do not stick to any one convention. Some quite happily use a religious format, others romantic poetry, some deal in jokes, tales and legends, yet others rely on art-forms and the products of artisanship. Now, a Sufi can tell from his experience that all these presentations are legitimate.”<sup>২৬</sup>

দৌলত কাজির ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’ কাব্যে আমরা দুটি দিক পাচ্ছি। একদল সমালোচক বলেছেন কাব্যে সুফি ভাবনা এলেও বিচ্ছিন্নভাবে তার প্রভাব পড়েছে তাই কাব্যটি বিশুদ্ধ প্রণয় রোমান্স এবং ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য। অন্য একদল সমালোচক এই ভাবনাকে সম্পূর্ণ সত্য মনে করেননি। এছাড়াও যদি Idries Shah এর বক্তব্য লক্ষ করি সে ক্ষেত্রেও কাব্যটিকে সম্পূর্ণ ধর্মভাববিবর্জিত গ্রহণেও সমালোচনার পথ খোঁজে। ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’ যেহেতু রোমান্টিক প্রণয়কাব্য, তাহলে এমনও হতে পারে যে এই রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের ভিতর দিয়েই সুফি সাধকরা তাঁদের সাধনার পথ দেখতে পাচ্ছেন এবং এইভাবেও সুফি সাধনা হতে পারে। ফলে যতটা সহজে একদল সমালোচক কাব্যের বহিরঙ্গে শুধু সুফি ভাবনার কথা বলেন এবং কাব্যকে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য বলেছেন Idries Shah এর বক্তব্যকে গুরুত্ব দিলে এই মতামত গ্রহণে বাঁধা আসার কথা। এইসমস্ত সমালোচকদের মতামতগুলিকে কিভাবে গ্রহণ করব, প্রচলিত মতগুলি আমরা কতটা মানব? সেই বিষয়গুলিও ভাবনার একটা জায়গা তৈরি করে। শুধুমাত্র যে দৌলত কাজির গ্রন্থের ক্ষেত্রে এমন চিত্র লক্ষ করা যায় তা বলা বোধহয় ঠিক হবে না।

মুসী শাহ গরিবুল্লাহ রচিত ‘ইউছফ জোলেখা বা মোহাব্বাত নামা’ এই কাব্যটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান পর্যায়ের হলেও এখানে কাহিনি বর্ণনায় সেইভাবে সুফি প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই কাব্যের পুরো অংশ জুড়ে জোলেখার প্রেম বর্ণনায় ছিল কবির মুখ্য উদ্দেশ্য।

আসকে মাশুক হয় মরন সমান।

কেমন গোলাম সে কেমনে বান্ধে হিয়া।।

জোলেখা যৌবন যাচে তাহার লাগিয়া।

কেহ বলে হইবেক নেকের ফরজন্দ গোলাম করিয়া রাখে এতেক পছন্দ।

কেহ বলে জোলেখার প্রথম যৌবন।।

গোলামের রূপ দেখে মজাইল মন। (পৃ.৫৩)

সুফিদের কাছে গুরুর ভূমিকা অনবদ্য, এখানে বড়খাঁ পীরের কথার মধ্যে দিয়ে গুরুর তত্ত্বকথা উঠে এসেছে-

লোভ মোহ কাম ক্রোধ ত্যাজিতে না পারে।।

আখেরে আজাব তার দোজখ উপরে।

শুনিয়া বড়খা বড় বদরের বাত।।

কহেন ফকির তুমি লেহ মেরা সাত।

তুমিত মুরসিদ দেওয়ান আমিত গোলাম।। (পৃ.৭৯)

এই কাব্যে এই অংশটুকু ছাড়া কোথাও সুফি প্রসঙ্গ সেইভাবে আসেনি। তবে পুরো কাব্য জুড়ে জোলেখার প্রেমিক পুরুষকে পাওয়ার জন্য যে যাত্রা তা অনবদ্য মাত্রায় ফুটে উঠেছে। একজন নারী তাঁর প্রেমিক পুরুষের উদ্দেশ্যে যে সাধনার পথে থেকেছে তা হিন্দু সাধনার দিক ইঙ্গিত করে। এ যাত্রা যেন রাখার যাত্রাকে স্মরণ করায়। এখানে নারী হয়ে উঠেছে ভক্ত।

আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ গ্রন্থে সুফি তত্ত্বের প্রভাব যথেষ্ট আছে, যা আলোচনার জায়গা তৈরি করে, পরবর্তীতে এই আলোচনা আমাদের আরও নতুন পথের দিশারি হয়ে উঠবে আশা করা যায়। গবেষণা অভিসন্দর্ভে আরও বেশ কিছু ইসলামি পুথির দিকে নজর রাখা হয়েছে, যেখানে এই সুফি মতের যথেষ্ট ছাপ পড়েছে। ইসলামি বাংলা

সাহিত্যে গোড়ার দিক থেকেই বহু সাহিত্যিক গ্রাম্য নানারকম প্রসঙ্গ নিয়ে এক ধরনের রচনাকর্মে মনোনিবেশ করেন যে শ্রেণির রচনা 'ইসলামি কেচ্ছা/কিসসা' এই নামে প্রচলিত হয়েছে। এই কেচ্ছা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সুফি মতবাদের ছাপ স্পষ্ট, যা একেবারেই অনালোচিত থেকে গেছে। নির্বাচিত গ্রন্থ ধরে বিষয়টি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

### খ. কেচ্ছা সাহিত্যে সুফি প্রভাব

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত কেচ্ছা সাহিত্যের ধারায় সুফি মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে বহুভাবে। আসলে রচনাকারদের চিন্তা-চেতনায় সুফি প্রভাব কিছুটা হলেও গ্রাস করেছিল। সেই জায়গা থেকেই কাব্যের কাহিনি অংশে সুফি মতবাদের কথা এসেছে। এই কাব্যগুলিতে জগত সম্পর্কে সাহিত্যিকদের এক অন্যরকম মানসিকতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। আসলে জগত নশ্বর, প্রভু নিরাঞ্জন এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি কর্তাকে ইঙ্গিত করেছেন। 'সৃষ্টিতত্ত্ব' এখানে আলোচিত হওয়ার জায়গা তৈরি করেছে। নাথ সম্প্রদায়-এ পরম স্রষ্টাকে অলখ-নাথ বা নিরাঞ্জন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখ আব্দুল কুদ্দুস ও একই অর্থে অলখ-নাথ কথাটি ব্যবহার করেন। সুফির সৃষ্টির তত্ত্ব নাথ তত্ত্বের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলিত হয়েছে। সুফিদের মধ্যে জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে এক রকম বিশ্বাস ছিল, সৃষ্টি সম্পর্কিত সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।<sup>২৭</sup> সুফিদের মতে জগত নশ্বর, ঈশ্বরের ধারণা নিরাকার। 'নিরাঞ্জন' বলেছেন প্রভুকে, ঈশ্বরকে আকারহীন জ্যোতির্ময় সত্তা ভাবছেন। সুফিদের ধারণায় জগত সৃষ্টির আগে সবই শূন্যের ধারণায় ছিল এমন মনে করা হয়। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত কাব্যে এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। অন্যদিকে প্রেমের কথা এসেছে, প্রেমিক পুরুষ তাঁর নায়িকাকে পেতে যাত্রা করেছে। মুসলমান সাহিত্যিকদের কাব্যে প্রেমিকের যাত্রার কথা ধরা পড়েছে কিন্তু অন্যদিকে রাধা কৃষ্ণকে পেতে ছুটেছে। এই প্রসঙ্গ ধরে আমরা আশিক-মাশুক তত্ত্বের আলোচনা বিস্তৃতভাবে করতে পারি। শুধুমাত্র রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান নয়, কেচ্ছা সাহিত্যেও সুফির প্রভাব পড়েছে, আসলে মুসলমান সাহিত্যিকরা যে শ্রেণির রচনাতেই

আবদ্ব থেকেছেন তাতে সমসাময়িক পরিস্থিতি, ঘটনার কথা এসেছে। ভারতবর্ষে সুফিদের যে সময়ে প্রবেশ সেই বিশেষ কালপর্বেই মুসলমান সাহিত্যকরা নিজেদের রচনাকর্মে মগ্ন থেকেছেন। সুফি মতবাদের সঙ্গে তত্ত্বকথাকে নিজেদের কাব্যের বিষয়বস্তুকে করে তুলেছেন আরও তত্ত্বনির্ভর। একটা গল্পকে প্লট করে কাব্যের বিষয় ফুটিয়ে তুললেও ইসলামি পুথি সাহিত্যের ধারাকে বুঝতে গেলে সুফির ধারণা সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞান নেওয়া আমাদের দরকার, আর সেই জায়গা থেকেই এই আলোচনা। নির্বাচিত যে কাব্যগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, শুধুমাত্র যে জায়গাগুলি সুফির ধারণাকে ব্যক্ত করে আমাদের সামনে সেই অংশগুলি তুলে ধরা হবে এই আলোচনায়।

মৌলবী হাজী আবদুল মজিদ ভুইঞা তাঁর ‘ছহী রঙ্গ-বাহার বা শাহে আলম ও মাহে আলমের কেছা’ এই গ্রন্থের শুরুতেই হাম্দ-না’ত অংশের বর্ণনার মধ্য দিয়ে জগত এর সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়কে তুলে ধরেছেন। জগত সংসার কিভাবে তৈরি হয়েছে, দোজখ, বেহেস্ত, সমুদ্র, পাহাড়, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে কবি এখানে সুন্দর বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

কেবন্দিতে পারে তাঁরে, কুন্ শব্দে জন্মকরে, চৌদ্ ভুবন এ সংসার।।

আরশ কুরছি আর, লওহ মাহফুজ তার, লওহকলম বানায়াছে।

দোজখ বানায় সাত, বেহেস্ত আট করে জাত, হাওজ কওছার তার বিচে।।

(পৃ.৪)

কনৌজ দেশের বাদশার কন্যা নয়ন বানু যোগীর প্রেমে মজে নিজের স্বামীকে হত্যা করে। এই কন্যা প্রথম প্রেমিক পুরুষ হিসাবে যোগীকেই সম্পূর্ণরূপে পেয়েছে।

যোগীর সহিত প্রেম ছিল পুশিদাতে।।

সেই মন্দিরেতে নেএন বানু চলে গেল।

যবে যে বিবিরে যোগি দেখিতে পাইল।।

কুপিত হইয়া ধরে সে বিবির তরে। (পৃ.২৭)

প্রেমিক পুরুষ শাহে আলম পুনরায় জীবন ফিরে পেয়ে ছুরতন্নেছার প্রেমের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

শুনিয়া যে শাহালম প্রেম ভরে কহে।  
হইনু পাগল এই পিতল বিরহে।।  
এই ছবি আছে যে বিবীর মুরত।  
সে বিবীরে পাই আমি কেমন ছুরত।। (পৃ.৪৬)

এছাড়া এই কাব্যে সুন্দরভাবে আশুক-মাশুক তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে।

প্রেমে রসে প্রেম বশে প্রেমে ভাসে সেই।।  
প্রেমে খাওয়া প্রেমে শোওয়া প্রেমেমত্তথাকে।  
আপনা মাশুকে সেই নিরক্ষয়া দেখে।। (পৃ.৪৭)

এই কাব্যে আমরা দেখি আশিক প্রেমিক পুরুষ, শাহে আলম ছুরতন্নেছা বিবির রূপে মজেছে।

নারী-পুরুষের মিলনের চিত্র প্রকট-

বান্দিকে ছাড়িয়া বিবির খাটেতে শুইল।।  
মেলামেলি হইল সে দোহে বহুতর।  
আশক মাশুক দোন খোসাল অন্তর।।  
ফুলেতে ভোমরা যেন উড়ে বসে সুখে।  
মধ্যে মধ্যে মাছি যেন আগুলিয়া থাকে।।  
প্রেম রঙ্গে মাতে দোহে কহিতে না পারি। (পৃ.৪৮)

শাহে আলম ছুরতন্নেছা বিবিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। নায়িকাকে (মাশুক) পেতে পুরুষের যাত্রা।

শাহে আলম কহে মাশুকের ছুরতন্নেছান বিবিরে।  
চল তেরা বাড়ী যাব হছুরত যে মেটাইব ধুমে শাদি করিব তোমারে।।  
শুনিয়া সে বিবি নেককার প্রেমে খুসি হয় বেসোমার। (পৃ.৯৩)

প্রেমের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে এইভাবে-

প্রেমের তরঙ্গে বেহুস হইনু।

প্রেম সাগর বিচে ডুবিয়া রহিনু ।  
মোরে হেন কিছু মালুম হইল ॥  
প্রেম বিনা আর কিছু নাহি ছিল ॥  
প্রেমে খাত্তা প্রেমে নিদ্রা শুইয়া ।  
প্রেম স্বপন দেখি প্রেমিক হইয়া ॥  
প্রেমের অনল দিন রাত যত জ্বলে ।  
বোঝাইলে না বোঝে প্রেম জ্বলে ॥  
প্রেম আগুনেতে প্রেমে কালি জমে ।  
এক সঙ্গে মিলিলে প্রেম তায়জাগে ॥ (পৃ.৯৪)

নারী যোগিনী বেশ ধারণ করছে, চেয়ন বানু যোগিনী হয়ে শাহে আলম ও মাহে আলমের খোঁজে বার হয় ।

চেএনবানু বিবি তবে, হৈয়া উদাসিনী ভবে, চলিল যে দেশ দেশান্তরে । (পৃ.১১১)

মুসী মোয়জ্জম আলী রচিত ‘আমীর সদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরীর পুথি’ এই কাব্যের প্রথমেই জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কবির বক্তব্য উঠে এসেছে ।

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার ॥  
যেই প্রভু জীব দানেরে স্থাপিল সংসার ।  
সৃজিল পর্বত আদি গিরি সৃজবর ॥  
অঘাধ সমুদ্র মধ্যেরে তরঙ্গ লহর ।  
সৃজিলেক সপ্ত মহি এ সপ্ত ব্রমাণ্ড ॥ (পৃ.১)

এই কাব্যে আমির সদাগর ও ভেলুয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে কিন্তু কাব্যের আলোচনায় প্রেমের স্বরূপ সেইভাবে বর্ণিত হয়নি । এই কাব্যে সুফি প্রভাব সেইভাবে আসেনি ।

মুনসী মোহম্মদ ইউনুছ রচিত ‘আবদুল আলী গারলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি’ এই কাব্যে কবির মানসিকতায় ঈশ্বর আকারহীন সত্তা হিসাবে ধরা পড়েছে । জগত সম্পর্কে কবির ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে-

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার ॥  
ছায়া নাই কায়া নাই সূন্যর আকার ।  
হস্ত নাই পদ নাই নাহি তার শির ।



অখণ্ড মহিমা প্রভুর নির্মল শরীর নাহি খায় অন্য দানা নাহি যায় ঘুম।।  
কি হালেতে চলে বান্দা সদায় মালুম'। (পৃ.১)

মুনশী মহাম্মদ রচিত 'বড় নিজাম পাগলার কেচ্ছা' এই কাব্যে মহোন সাধুর পুত্র  
কিঙ্কর বাণিজ্য যাত্রায় এসে কমলাবতির রূপ-যৌবনের কথা শুনে তাঁর প্রেমে অস্থির  
হয়ে ওঠে। নায়িকার (মাশুক) প্রেমে অস্থির হয়ে পুরুষ-প্রেমিকের (আশিক) উন্মাদনা  
প্রকাশ পায়।

মাসুকের দায়ে জদি জান মেরা জাবে।  
সকলে ছ'ড়িয়া জাবো ফকির হইয়া লইব আল্লার নাম গলে তছবি দিয়া।  
এয়ছাই মছলত করি দেলে আপনার।। (পৃ.১১)

যোগীবেশ ধারণ আসলে ফকির রূপেরই নামান্তর, হিন্দু যোগীদের যে স্বরূপ  
সেই একইরকম স্বরূপ ধারণের মধ্য দিয়ে সুফিরা নিজেদের সত্তাকে খুঁজে পেতে চায়।  
সব পুরুষের মধ্যে তাঁর নায়িকাকে পেতে এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কমলাবতিকে  
পেতে কিঙ্কর এই যোগীবেশ ধরে জীবন অতিবাহিত করে।

একে আমি আছি হিন, যোগি ভেষে চিরোদিন, স্কিন হৈল জিবন আমার।  
মৃত দেহে মারো খাড়া, পৌরষ নাহিক বাড়া, কিবা তোর কঠিন হৃদয়। (পৃ.১৫)  
অন্যদিকে পূর্বদেশে ব্রাহ্মণের পুত্র সুমতির রূপে আকৃষ্ট হয়ে বিরহ জীবন পালন করে।

বামনের বেটা জদি এতেক শুনিল।।  
আসক আগুন তার জলিয়া উঠিল।  
বুকেতে লাগিল তার আসকের তির।।  
জলনেতে রাজ পুত্র নাহি হয় স্তির।  
খাত্তা পেত্তা ত্যাগ দিল সদা জপে মালা।।  
সহিতে না পারে আর বিরহের জালা। (পৃ.৩৬)

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত রোমান্টিক প্রণয়পাখ্যানে এবং কেচ্ছা সাহিত্যে সুফি  
প্রভাব যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। আসলে বঙ্গদেশে সুফি আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান  
লেখকদের ভাবনা-চিন্তায় এসেছে সুফি-দর্শন এবং সুফি জীবনযাত্রার চিত্র। মুসলমান  
লেখকরা তাঁদের রচিত কাব্যে এই সুফি প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেননি, বিশেষকরে

নারী-পুরুষের প্রেমের স্বরূপ বোঝাতে ‘আশুক-মাশুক’ তত্ত্বকে তুলে ধরেছেন। হিন্দু ধর্মের যে বৈষ্ণবমত তার সঙ্গে সুফিমতের বেশ স্পষ্ট মিল আমরা পেয়ে থাকি। আলোচিত কাব্যেও এই চিত্র প্রকট হয়েছে। আমাদের গবেষণার মূল আলোচনার বিষয় হল সংস্কৃতির মেলবন্ধন। আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনার ভিতর দিয়ে সেই সাংস্কৃতিক দিকের বহু ইঙ্গিত পেয়ে থাকি। বঙ্গদেশে মুসলমানদের সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়ে যেমন হিন্দু সংস্কৃতি উঠে আসে প্রসঙ্গক্রমে, সেই রকমই সুফি মতবাদ কাব্যের বর্ণনা সূত্রে সাহিত্যিকরা তুলে ধরেছেন, সুফিদের নিজস্ব যে এক ধরনের সংস্কৃতি তা কাব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। শেখ আবু নসর সররাজ (Sheikh Abu Nasr Sarraj) সুফি সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছেন-

“Sufi culture, which is a self-development, realizing what is relevant, concentration and contemplation, cultivation of inner experience, following the path of search and Nearness”<sup>২৮</sup>

আসলে বঙ্গদেশের সামাজিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে মুসলমান সাহিত্যিকরা কাব্য রচনা করেছেন, এই সময় হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ, হিন্দু বৈষ্ণবমত এবং সুফিবাদ কিছুই বাদ পড়েনি। তবে সুফি মতবাদের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র এককভাবে মুসলিম সংস্কৃতির দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে না বরং সুফিদের ঈশ্বরের ধারণা, ঈশ্বর সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা, প্রেমের স্বরূপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের অনেক দিকের কথা উঠে আসে। ফলে সব মিলিয়ে এক ধরনের মিশ্র সংস্কৃতির দিক গড়ে ওঠে। আসলে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় সুফিদের আগমনের সঙ্গে মুসলিমদের ভীত আরও শক্ত হয়ে ওঠে। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় সুফি প্রভাবের কথা অকপটেই স্বীকার করার মতো। মুসলমান সাহিত্যিকদের হাতে যে পুথি সাহিত্যের ঘরানা তৈরি হয় সেখানে সুফি প্রসঙ্গ বাদ পড়েনি। প্রেমের ভিতর দিয়ে সুফিরা সাধনার চরম সীমায় পৌঁছাতে চেয়েছেন। তাই প্রণয় সম্পর্ক নির্মাণে আশুক-মাশুক তত্ত্ব কাব্যগুলির আলোচনায় উঠে এসেছে। স্রষ্টার কাছে নিজের সত্তাকে চিরতরে বিলীন করে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথ খোঁজেন। একজন প্রেমিক পুরুষ তাঁর নায়িকাকে পেতে প্রতিটিক্ষণ যে সাধনা করেছে তা সুফি

সাধনার নামান্তর। এই মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর পুঁথিগুলি সম্পর্কে এনামুল হক বলেন- “সুফীদের সাধনা পদ্ধতির সহিত হিন্দুদিগের যোগ-পদ্ধতির সংমিশ্রণে এই পুঁথিগুলি রচিত হইয়াছিল।”<sup>২৯</sup>

## তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Ashraf. Syed Ali, ‘Muslim Traditions in Bengali Literature’, Karachi University, Bengali Literary Society, 1960. P.27-28
২. ঘোষ. কবিতা, ‘সপ্তদশ শতকের বাঙালির সমাজ ও সাহিত্য’, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪। পৃ.১৬৮
৩. Haque. Muhammad Enamul, ‘A History of sufi-sim in Bengal’, Dacca, Asiatic Society of Bangladesh, 1975. P.144-145
৪. হক. মুহম্মদ এনামুল, ‘বঙ্গে সুফী-প্রভাব’, ঢাকা, রয়মন পাবলিশার্স, ২০১১। পৃ.২৪
৫. Gibb. Sir Hamilton A. R, ‘An Interpretation of Islamic History’, Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, 1957. P.41
৬. Chand. Tara, ‘Influence of Islam on Indian Culture’, Allahbad, The Indian Press limited, 1946. P.31
৭. ভট্টাচার্য. আনন্দ, ‘বাংলায় সুফি আন্দোলন’, কলকাতা, আকাশপ্রদীপ, ২০১২। পৃ.৩২
৮. সৈয়দ রিজভি বলেন- “Sufism is not, therefore, a rigid system. According to one outstanding sufi, the paths by which its followers seek God: ‘are in number as the souls of men’. Asceticism , purification, love and gnosis. Assist sufis in finding the universal self.”
- সূত্র: Rizvi. Saiyid Athar Abbas, ‘A History of Sufism in India’ (vol-I), New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers pvt. Ltd. 1978. P.20
৯. Rahman. A, ‘History of Indian Science, Technology and Culture AD 1000-1800’, New Delhi, Oxford University Press, 2000. P.425
১০. Shah. Idries, ‘The way of the sufi’, New York, Penguin books, 1979. P.17
১১. তদেব। P.309

১২. হক. এনামুল, 'বঙ্গে সূফী-প্রভাব', ঢাকা, রয়মন পাবলিশার্স, ২০১১। পৃ.৩১
১৩. এ প্রসঙ্গে A.J. Arberry কথায় জানা যায়- "The esoteric exposition of the Koran became a central point in the hard training of the Sufi."
- সূত্র: Arberry. A. J. 'Sufism an Account of the Mystics of Islam', London, George allen & unwin ltd, 1968. P.23
১৪. Dasgupta. Shashibhusan, 'Obscure religious cults', Calcutta, University of Calcutta, 1946. P.193-95
১৫. Rizvi. Saiyid Athar Abbas, 'A History of Sufism in India' (vol-I), New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers pvt. Ltd. 1978. P.323
১৬. শরীফ. আহমদ, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ঢাকা, বর্ণমিছিল, ১৯৭১। পৃ.৩২৬
১৭. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে জানান- "মধ্যযুগের ভারতের ধর্ম-সাধনায় খুব বেশি করে ঈরানের সূফী মতবাদের, সূফী সংঘবদ্ধ সাধনার প্রভাব এসে পড়েছিল- এমনকি বাঙলার চৈতন্যোত্তোর গৌড়ীয় মতের বৈষ্ণব সাধনার উপরেও। ঈরানী সূফী আধ্যাত্মিক সংগীতের ছায়া বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যেও পাওয়া যায়, বৈষ্ণব উদ্দাম কীর্তনের সঙ্গে সূফীদের নামের জিকির বা সমবেত-ভাবে উচ্চৈঃস্বরে নাম-জপের মিল আছে; এইরূপ কীর্তনে যদি কোনও ভক্তের ভাবাবেশ হয়, বাঙলাতে তাকে বলা হয় 'দশা'। এই 'দশা' শব্দ এই বিশেষ অর্থে প্রাচীন সংস্কৃতে পাওয়া যায় না, কারণ এই ধরনের সমবেতভাবে গান গেয়ে ধর্মসাধনার রেওয়াজ বা রীতি প্রাচীন যুগে ছিল না বলেই মনে হয়। এখন ফারসীতে সূফীদের পারিভাষিক শব্দে এইরূপ ভাবাবেশকে 'হাল' বলা হয়- 'হাল' মূলে আরবী শব্দ, এর মুখ্য অর্থ হচ্ছে 'অবস্থা', পরে 'ভাবাবেশ' অর্থে ফারসীতে এর অর্থ-বিস্তার ঘটে।"
- সূত্র: চট্টোপাধ্যায়. শ্রীসুনীতিকুমার, 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস', কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ২০০৩। পৃ.৩
১৮. জালিম আবদুর রহমান (Zalim Abdurrahman) সুফিদের সারবত্তার প্রসঙ্গে প্রেমবাদের কথা বলেছেন।
- সূত্র: Shah. Idries, 'The way of the sufi', New York, Penguin books, 1979. P.294

১৯. “For these mystical texts are the chief encouragement and justification of the Sufi in his belief that he also may commune with God.”

সূত্র: Arberry. A. J. ‘Sufism an Account of the Mystics of Islam’, London, George allen & unwin ltd, 1968. P.17

২০. Chandra. Satish, ‘History of Medieval India (800-1700)’, New Delhi, Orient BlackSwan, 2014. P.188

২১. ব্রহ্ম. তৃপ্তি, ‘বাংলার ইসলামি সংস্কৃতি’, কলকাতা, ফার্মা কে. এল. এম(প্রাঃ) লিঃ, ১৩৯২। পৃ.৫১

২২. কাজী আবদুল ওদুদ এ বিষয়ে জানিয়েছেন- “সুফীমত বহু মতের সমষ্টি। তবে সে-সবের একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে, তাতে গুরুর আনুগত্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়। শাস্ত্রকেও সুফীরা মানেন, কিন্তু পীর বা গুরুকে বিশেষভাবে মানেন; সত্যের সত্যকার ভাঙারী গুরু, এই তাঁদের বিশ্বাস, আর তাঁদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্বের যিনি বিধাতা তাঁর সঙ্গে প্রেমের যোগ বা পরমাত্মীয়তা স্থাপন করা।”

সূত্র: ওদুদ. কাজী আবদুল, ‘বাংলার মুসলমানের কথা’, ‘শাস্ত্রতবঙ্গ’, কলিকাতা, সিগনেট বুকশপ, ১৩৫৮। পৃ.৯৯

২৩. সৈয়দ রিজভি (Saiyid Rizvi) বলেন- “The Perfect yogi can transform his body according to his will and is therefore free of all diseases and death.”

সূত্র: Rizvi. Saiyid Athar Abbas, ‘A History of Sufism in India’ (vol-i), New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers pvt. Ltd. 1978. P.335

২৪. Rahman, A, ‘History of Indian Science, Technology and Culture AD 1000-1800’, New Delhi, Oxford University Press, 2000. P.428

২৫. কাজি. দৌলত, ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা), কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, জুন ২০১২। পৃ.উনত্রিশ

২৬. Shah. Idries, ‘The way of the sufi’, New York, Penguin books, 1979. P.30

২৭. সৈয়দ রিজভি (Saiyid Rizvi) জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন- “The Sufi theory of creation is also neatly reconciled with the corresponding Nath

theory. All Sufis believe in the following explanation of creation, said to have been revealed by God to David.”

সূত্র: Rizvi. Saiyid Athar Abbas, ‘A History of Sufism in India’ (vol-i), New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers pvt. Ltd. 1978. P.340

২৮. Shah. Idries, ‘The way of the sufi’, New York, Penguin books, 1979. P.262

২৯. হক. মুহম্মদ এনামুল, ‘বঙ্গে সূফী-প্রভাব’, ঢাকা, রয়মন পাবলিশার্স, ২০১১। পৃ.৭৯

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### মুসলিম বাংলা সাহিত্য: ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য

বাংলা সাহিত্যের যে সুবিশাল পরিমণ্ডল সেই জায়গা থেকে মুসলমান সাহিত্যিকদের কথা উঠে আসে। মুসলমান সাহিত্যিকরা হিন্দু লেখকদের পাশাপাশি নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিষয়গুলি তাঁদের রচনাকর্মের মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। মুসলিম সমাজে ভাষার বৈপরীত্য বেশ স্পষ্ট, আসলে ধর্মীয় ভাষা আরবি হওয়ায় অনেকেই এই ভাষাকে অধিক আয়ত্ত করেছেন। এছাড়া বাংলার সামাজিক পরিবেশে মুসলিমগোষ্ঠী নিজেদের মানিয়ে নিতে শিখে বাংলা ভাষাকেও নিজের করে নিয়েছেন। মুসলিম লেখক রচিত সাহিত্যে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির ছাপ ফুটে উঠলেও, ভাষাগত দিক দিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়।<sup>১</sup> তবুও মুসলমান সাহিত্যিকরা যতটা সম্ভব নিজেদের মতো করে কাব্য রচনার ধারা বজায় রাখেন কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় এক বিশেষ ধরনের ভাষাকে নিজেদের লেখায় ফুটিয়ে তোলার ব্যাপক প্রচেষ্টা। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে মূলত সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রেখে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকটিকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিশেষ সময়পর্বে আমরা ‘DOBHASI’ (দোভাষী)<sup>২</sup> নামে এক ধরনের ভাষার কথা জানতে পারি। অনেকেই এই প্রসঙ্গে বহু মতামত পোষণ করেছেন নিজেদের মতো করে। কাজী মুহম্মদ আবদুল মান্নান বলেন-

“the fact that in the 18<sup>th</sup> century Muslim poets themselves had begun to adopt Dobhasi as their own peculiar language and that therefore as a literary diction it was slowly being accepted as the preserve of Muslim writers.”<sup>৩</sup>

মুসলমান সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত সাহিত্যকর্মের ভিতর দিয়ে যেমন গোটা বঙ্গদেশে সংস্কৃতির স্বরূপকে আলাদা করে চিনতে অসুবিধা হয়নি ঠিক একই রকমভাবে ভাষার বৈচিত্র্যের দিকটিও পরিস্ফুট হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী এই সময়ে বাংলায়

ফারসি, উর্দু ও হিন্দি ভাষার ব্যাপক প্রভাব পড়ে এবং সাহিত্যে সেই ভাষার চর্চা শুরু হয়। মুসলমান সাহিত্যিকরা নিজেদের রচিত কাব্যে যেভাবে দোভাষী রীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, পাশাপাশি হিন্দু সাহিত্যিকদের কাব্যেও এই আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষিত হয় কিন্তু তুলনায় অনেক কম। এক্ষেত্রে আমরা ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের কথা বলতে পারি-

দেবী বলি দেয় গাছে ঘড়ায় সিন্দুর।  
হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর।।  
বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।  
পান-পানী খানা-পিনা আয়েব না করে।।<sup>৪</sup>

এখানে ‘আখের’ শব্দটি আরবি শব্দ এবং ‘খানা’ শব্দটি ফারসি শব্দের অন্তর্গত।

মোটামুটিভাবে সব দেশের সাহিত্যের আদর্শভাষা হিসাবে লেখ্যভাষাকে ধরা হয়। এই লেখ্যভাষা সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে এক অন্য ধরনের মনোভাবের কথা সৈয়দ এমদাদ আলী ‘মাসিক মোহাম্মদী’ (প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা) পত্রিকার ‘বাংলা ভাষা ও মুসলমান’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন- “লেখ্য ভাষা বিকট, বিশ্রী, উহা বাংলা সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়।”<sup>৫</sup> মুসলিম রচিত বাংলা সাহিত্যকে এক শ্রেণির লেখকগোষ্ঠী লেখ্যভাষার সঙ্গে কথ্যভাষার প্রয়োগ ঘটিয়ে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থেকেছেন। সেই ধারা আমরা কাব্যগুলির পাঠ নেওয়ার ক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে পারি। বলাবাহুল্য মুসলিম রচিত কেছা কাহিনীর বর্ণনায় এই কথ্যভাষার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়ে আমরা পরে বিস্তৃত জানব। ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের বেশিরভাগ মানুষই আরবি ভাষা এবং রাজকার্য পরিচালনা ও অন্যান্য সরকারি কাজকর্মে প্রায় সকল শ্রেণির মানুষ ফারসি ভাষা ব্যবহারে যুক্ত থেকেছেন। ফলে মুসলমান সমাজে মানুষের মুখের ভাষায় আরবি, ফারসি, উর্দুর প্রভাব বেশি এসেছে। সেই মুখের ভাষাকে মুসলমান সাহিত্যিকরা সাহিত্যে স্থান দিতে চেয়েছেন এবং একদম সাবলীল, সরল, হৃদয়গ্রাহী করে নিজেদের কাব্যের বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে এস. ওয়াজেদ আলির বক্তব্যে জানতে পারি-



“বাঙ্গালী হিন্দুর কথ্যভাষায় যেমন সংস্কৃত মূলক শব্দের প্রাচুর্য্য দেখতে পাওয়া যায় ঠিক তেমনই বাঙ্গালী মুসলমানের কথ্যভাষায় আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষামূলক শব্দের প্রাচুর্য্য দেখা যায়।”<sup>৬</sup>

আমরা বলতে পারি ভাষা কোনও একটি জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ঠিক সংস্কৃতির মতোই। এ ও যেন পরিবর্তনশীল সর্বদাই, ভাষা একটি জাতির বাহক-সূচক। ভাষার ভিতর দিয়েই উঠে আসে জাতির নির্মাণের ইতিহাস। তাই ভাষার সূত্র ধরেই আমরা ধাপে ধাপে চিনে নিতে পারি এককভাবে কোনও জাতির/গোষ্ঠীর/ধর্মের মানুষের পরিচয়কে, তেমনই পাশাপাশি ভাষা কিভাবে আমাদের বিপরীতধর্মী/ভিন্নধর্মী মানুষজনদের বেঁধে রেখেছে একই পরিমণ্ডলে নিবিড়ভাবে সে কথাও বলা যায়। গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের সৃষ্টি যেদিন থেকে সেদিন থেকেই ভাষার উৎপত্তি। নানা ভাষা ও নানা বর্ণের দেশ ভারতবর্ষে ভাষার বৈচিত্র্যও কম নয়, বহুজাতি যেমন এদেশে এসে ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কৃতিতে একদেহে লীন হয়েছে তেমনই ভাষাকেও একাত্ম করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে সামাজিক সহাবস্থানে একে অপরের সঙ্গে মেলা-মেশার সূত্রে। বিভিন্ন সময়ে ভাব-বিনিময়ের হাত ধরে ভাষা মানুষের জীবনে এক মাধ্যম হিসাবে কাজ করে এসেছে, আজকের সমাজেও যা বর্তমান। রোমিলা থাপার বলেছেন- “ভাষাতাত্ত্বিক বিনিময়ের ধরন একটি বিশেষ ভাষা ও সংশ্লিষ্ট মানুষের কার্যকলাপ চিহ্নিত করতে পারে।”<sup>৭</sup>

মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ক্রমশ দোভাষী রীতি’র প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানরা নিজেদের সাহিত্যকর্মে এই ধরনের ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনের কথা ভেবে অথবা ধর্মীয় দিকে কিছুটা হলেও আকৃষ্ট হয়ে। এই প্রসঙ্গে বহু আলোচনা উঠে আসে, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বটতলার ‘দোভাষী সাহিত্য’ সেকাল ও একাল’ প্রবন্ধে বলেন-

“ঊনিশ শতকের তিরিশের দশকে ওয়াহাবী বিদ্রোহের প্রভাবও দোভাষী সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করে। এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র কৃষকদের

মুক্তি সাধনই ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মুসলমান সমাজের আচার-  
আচরণ, কথাবার্তায় খাঁটি ঐশ্লামিক ভাবাদর্শে শুদ্ধিকরণের একটা সচেষ্টি  
প্রয়াসও ছিল। ফলে ভাষাতেও আরবি-ফারসি শব্দবহুল ধর্মীয় আলাপ-  
আলোচনার রেওয়াজ দেখা দিয়েছিল।”<sup>৮</sup>

ভারতবর্ষে মুসলমান জাতি প্রবেশের পর তাঁরা এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্য  
দিয়ে নিজেদের টিকিয়ে রেখেছেন। মধ্যযুগের সময়পর্বে বাংলায় মুসলমানদের  
শাসনপ্রণালী তুর্কি, আফগান এবং মুঘল জাতির হাত ধরে ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে  
থাকে। এই শাসক শ্রেণি ধর্মের ভাষা হিসাবে আরবিকে ব্যবহার করলেও প্রশাসনিক  
ভাষা হিসাবে ফারসি-কেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু মধ্যবাংলায় সাধারণ জনমানসের  
দৈনন্দিন মুখের ভাষা হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে বাংলা ভাষা। ফলে এই সমসাময়িক  
কালে রচিত সাহিত্যে ভাষার বিমিশ্রতা বিশেষভাবে ধরা পড়ে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ  
হিসাবে মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনাকে আমরা পেয়ে থাকি।<sup>৯</sup>

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্যের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের দিকে আমরা  
নজর দিতে চাইছি। এইক্ষেত্রে সমাজভাষাবিজ্ঞান (Sociolinguistics) এবং ভাষাগত  
বৈচিত্র্য এই দিকগুলির প্রতি মূলত অবলোকন করা হয়েছে এবং এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে  
ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

## ক. সমাজভাষা

ভাষাবিজ্ঞানী হুইটনির (Whitney, W.D.) মতে ভাষা হচ্ছে একটি সামাজিক সংস্থা-  
‘Language is a social institution.’<sup>১০</sup> জাতি হিসাবে সমাজভাষার বিভিন্ন ধরনের  
বৈচিত্র্য আমাদের চোখে পড়ে। কম-বেশি প্রায় সব রকম ভাষাতেই সমাজের ভেদ  
অনুসারে ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এই বৈচিত্র্য ভিন্ন ভাষা ব্যবহারকে  
ভাষাবিজ্ঞানের কথায় বলা হয় ‘সমাজ উপভাষা’ (Sociolect). ভাষার মাধ্যমে বক্তা তার  
পরিচয় প্রকাশ করে। তার সামাজিক পরিবেশ ও পরিচয় কথা বলার মধ্য দিয়েই

বাহিত হয়। একটি শ্রেণি উপভাষার সঙ্গে যেমন তার সম্পর্ক প্রকাশিত হয় তেমনি অন্য শ্রেণি উপভাষার সঙ্গে তার পার্থক্যও বোঝা যায়।<sup>১১</sup> ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকার তাঁর ‘ভাষা, দেশ, কাল’ গ্রন্থে বলেন ‘সমাজভাষাবিজ্ঞান’ (Sociolinguistics) এই নামটি মার্কিনদেশে ১৯৫২-র আগে বিশেষ ব্যবহৃত হয়নি। সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে উইলিয়াম ব্রাইট এর সংজ্ঞাকে তুলে ধরেন- ....“linguistic DIVERSITY is precisely the subject matter of socio linguistics.”<sup>১২</sup> অন্যদিকে রাজীব হুমায়ুন তাঁর ‘সমাজভাষাবিজ্ঞান’ গ্রন্থে বলেন সমাজ ভাষাবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব হল ভাষা-বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ। সব ভাষাতেই কমবেশি বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বাংলাভাষাসহ বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে ধর্ম-বর্ণের কারণেও ভাষায় বৈচিত্র্য এসেছে। কথা প্রসঙ্গে আরও জানান সমাজ ভাষাবিজ্ঞানে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-সূত্রের সঙ্গে ভাষা-সূত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়।<sup>১৩</sup> বাংলাভাষী হিন্দু মুসলমানের ভাষার ব্যবহারগত বৈচিত্র্য দেখা যায়। নিত্য ব্যবহার্য শব্দগুলি মুসলমান রচনাকারেরা সাহিত্যে ব্যবহার শুরু করেন। তাঁদের রচিত কাব্যে এইরকম শব্দ ব্যবহারের ফলে হিন্দু ও মুসলমানের রচিত কাব্যের পার্থক্য স্পষ্ট হয়। এই বিষয়ে মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী তাঁর ‘বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য’ নামক প্রবন্ধে জানিয়েছেন-

“বাঙ্গালা ভাষার যে সমস্ত শব্দ আমাদের ধর্মমতে বিরুদ্ধ ভাব সম্পন্ন তাহা আমরা কখনও ব্যবহার করিব না, পক্ষান্তরে যে সমস্ত শব্দ আমাদের জাতীয় ভাব প্রকাশের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে আমরা তৎপরিবর্তে আরবি-পারসি শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করিব।”<sup>১৪</sup>

একইভাবে গবেষণা অভিসন্দর্ভে আলোচিত কাব্যেও এর প্রভাব পড়েছে এবং মুসলমান সমাজের ভাষা কিভাবে হিন্দু সমাজের ভাষা থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত হচ্ছে তা দেখে নেবো নিচের সারণি প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে-

সারণি: ১

জাতি	হিন্দু	মুসলমান
ধর্মের ভাষা	স্বর্গ	বেহেশত
	প্রভু	রব
	অমর্ত্যলোক	জান্নাত
	নরক	জাহান্নাম
	মৃত্যু	এন্তেকাল
	শেষ বিচারের দিন	হাশর
	পাপ	গোনা
	পুণ্য	নেকি
	দূত	ফেরেশতা
	মৃত্যু	মউত
	প্রণাম করা	সালাম
	পুরোহিত	মোল্লা
	মালা জপকরা	তছবি
	আশীর্বাদ	দোওয়া
	স্বর্গের অঙ্গরা	বেহেশ্তের হর
	ঈশ্বরের দরবারে প্রার্থনা করা	মোনাজাত
পরকাল	আখের	

মুসলমান সাহিত্যিকরা তাঁদের রচিত কাব্যে ধর্মীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং সেই ভাষা একেবারে নিজেদের ধর্মগ্রন্থের ভাষারই অনুরূপ। সাধারণ মুসলিম জনমানসে যে ভাষায় মানুষ কথা বলতে এবং আলাপ-চারিতায় কর্মতৎপর থেকেছে সেই মুখের ভাষায় সাহিত্যে উঠে এসেছে। আবার অন্যদিকে হিন্দু সাহিত্যিকদের রচনায় সংস্কৃতবহুল ভাষায় ঘুরে ফিরে এসেছে। আসলে প্রতিটি সমাজের মানুষের জীবনপ্রণালীর গঠনে ভাষা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেও প্রত্যেক জাতিই নিজের নিজের ঘরানার মধ্যে বদ্ধ থেকেছে, সেই ক্ষেত্রে ভাষার বৈচিত্র্যে ভিন্নতা এসেছে। আমরা উপরের সারণিতে বেশকিছু শব্দ লক্ষ্য করেছি যা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে

একই অর্থসম্পন্ন ভাষার বৈপরীত্যকে চিহ্নিত করে। আবদুর রহিম তাঁর ‘গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথী’ এই কাব্যে একইভাবে ধর্মীয় ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

সদয় হইয়া প্রভু তাহার কাছেতে।।

পাঠাইল হর গণ বেহেস্ত হইতে।

বেহেস্তের ফল মেত্তা দ্রব্য যত আর।।

আনিয়া দিতেন হর মুখে তুলে তার। (পৃ.৮১)

### সারণি: ২

জাতি	হিন্দু	মুসলিম
আত্মীয়তার ভাষা	মেয়ে	বেটি
	স্বামী	খছম
	বউ	বিবি
	গুরু	ওস্তাদ
	ছেলের পুত্র	পোতা
	বাবা	বাপ/আব্বা
	মা	আম্মাজান
	পিসি	ফুফু
	মাসি	খালা
	ছেলে	বেটা/মর্দ
	বোন	বহিন
	কাকা	চাচা
	বউদি	ভাবি
	বর	দুলা
	বন্ধু	দোস্ত
	কনে	দুলহান
	জামাই	দামাদ
	ঠাকুমা	দাদি
	স্ত্রী	জরু
	দাদু	নানাজি
ভাইপো	ভাতিজা	

আত্মীয়তার ভাষার ক্ষেত্রে মুসলমান সাহিত্যিকরা যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন তা হিন্দু সাহিত্যিকদের লেখায় ব্যবহৃত ভাষার থেকে আলাদা হয়ে গেছে। মুসলমান রচনাকারেরা এই ভাষা নিজেদের কাব্যে ব্যবহার করেছেন, যা মুসলমান সমাজের মানুষজনদের কাছে বেশ বোধগম্য যোগ্য হয়ে ওঠে। আমরা বিভিন্ন লেখকদের রচিত কাব্যে এই ভাষার প্রয়োগ দেখতে পাই। মুন্সী শাহ গরীবুল্লাহ তাঁর 'ইউছফ জোলেখা বা মোহাব্বাতনামা' কাব্যে লিখেছেন-

রাহিলার বহিন এক সেই দেশে ছিল।

এয়াকুবের ঠাই চেয়ে ইয়ামিনেরে লিল পালিবারে লয়ে গেল আপনার ঘর।।

খালা ফুফু বিনে আর কে আছে দোসর।

ইউছফ রহিল তবে বাপের নিকটে।। (পৃ.৫)

### সারণি: ৩

জাতি	হিন্দু	মুসলিম
ব্যবহৃত দ্রব্যের ভাষা	খাবার	খানা
	জল	পানি
	স্নান	গোছল
	জুতো	খড়ম
	চিরুণি	কাজ্জই
	আয়না	আর্শী
	মাংস	গোস্ত
	মদ	শরাব
	দুধ দিয়ে চালের পায়োস	ক্ষীর

দৈনন্দিন জীবন-যাপনে হিন্দু-মুসলিম উভয়সম্প্রদায়ের মানুষজন বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করেছেন, যা তাঁদের প্রত্যেকের জীবনচর্যায় জড়িত। কিন্তু সাহিত্য রচনায় আমরা ভাষার ব্যবহারে ভিন্নতা লক্ষ্য করি। মুসলমান সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনাকর্মে

একদম সাবলীল, সরল ভাষাকেই স্থান দিয়েছেন। মোহাম্মদ খাতের তাঁর ‘বোন বিবী জহুরা নামা নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা’ এই কাব্যে বর্ণনা করেছেন-

শুনে সবে খুশি হয়ে খানা পানি খেয়ে।।  
যার যে চলিয়া গেল বিদায় হইয়ে।  
তার পরে পাকাইয়া ক্ষীর গোস্তু ভাত।।  
বোন বিবীর নামে কত করিয়া খয়রাত। (পৃ.৩৮)

মুসলমান সাহিত্যিকদের হাতে এইভাবে সমাজভেদে ধর্মীয় কারণে ভাষা আলাদা হয়ে গেছে। আমরা মুসলিম রচিত কাব্য পড়লেই এই ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করি। ড. রামেশ্বর শ’ এর কথায় জানা যায়- “ভাষা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়; আমাদের জীবন, মনন, সমাজ, সংস্কৃতির প্রতিটি দিকে তার শিকড় প্রসারিত, সবদিক থেকে রস সংগ্রহ করে ভাষা জীবন্ত বৃক্ষের মতো বিকশিত হয়ে উঠে। মানুষের জীবনের প্রয়োজনে তার সৃষ্টি, আবার মানুষকেই তা জীবনীশক্তি দান করে।”<sup>২৫</sup> এছাড়া ভাষাবিজ্ঞানীদের কথায় জানা যায়- “বিশেষ-বিশেষ ভাষা বিশেষ-বিশেষ সমাজের প্রয়োজন মেটায়।”<sup>২৬</sup> বলা যেতে পারে সমাজের টানেই ভাষা সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ বিশেষ ভাষা বিশেষ সমাজেই প্রধান হয়ে ওঠে। প্রত্যেক জাতির আলাদা স্বতন্ত্র ভাষা গড়ে ওঠে। মুসলমান সাহিত্যিকরা তাঁদের নিজেদের রচিত কাব্যে যে ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তা নিয়ে অনেক সমালোচকের মন্তব্য উঠে আসে। শেখ হবিবর রহমান ‘আল্-এসলাম’ (২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা) পত্রিকায় তাঁর ‘জাতীয় সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান’ প্রবন্ধে বলেছেন-

“বাঙ্গালার অর্ধেকের অধিক অধিবাসী মুসলমান। তাহারা কথিত ভাষায় নিজ যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করে, তাহাদের লিখিত সাহিত্যে তাহার ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইবে কোন যুক্তি বলে? বাঙ্গালা যদি তাহাদের নিজের ভাষা হয়, তবে তাহাদের প্রাত্যহিক ব্যবহৃত ভাষা নিশ্চয়ই তাহাতে স্থান পাইবে।”<sup>২৭</sup>

## খ. সাহিত্যে প্রাপ্ত মৌখিক ভাষার ব্যবহার

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কিছু ভাষা আছে যা সেই সমাজে প্রচলিত। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত যে সমস্ত কাব্য সম্পর্কে আমরা এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে জেনেছি তার মধ্য দিয়ে যেমন ইসলাম জাতির সংস্কৃতি আলাদাভাবে আমাদের সামনে উঠে এসেছে, অন্যদিকে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই একদম ঘরোয়া বেশ কিছু শব্দ আলাদাভাবে ইসলাম জাতিকে চিহ্নিত করেছে। আমরা বেশ কিছু শব্দের সঙ্গে পরিচিত হব যে শব্দগুলি আজও মুসলমান সমাজে প্রচলিত। মুসলমান সাহিত্যিকরা সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী এই সময়ে যে কাব্যগুলি রচনা করেছেন তাতে বেশিরভাগই অন্ত্য মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তবে এই সময়ের ভাষায় নানা রকম স্বরগত বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। মৌখিক সাহিত্য বলে প্রচলিত থাকার ফলে বহু সাহিত্যেরই ভাষার মধ্যে নানা ধরনের বদল ঘটে গেছে। তাই একই লেখার মধ্যে বিভিন্ন যুগের স্তরচিহ্ন ভাষার মধ্যে বিদ্যমান। এছাড়া মুসলমান সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধারণ জনমানসে যেভাবে মুখের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা কাব্যের ভাষা হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল বলেন-

“বটতলার সাহিত্যের মধ্যে একধরনের ‘ওরাল’ বা ‘কথ্য’ সংস্কৃতি ছিল, যেটার মধ্যে এক ধরনের সাবলীলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা রয়েছে এবং একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায় লেখা।”<sup>১৮</sup>

ইসলামি সাহিত্য বটতলাকেন্দ্রিক হওয়ার সুবাদে এই কাব্যগুলির মধ্যে এই চিত্র পরিস্ফুট।

### বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ভাষা:

ফকির জলিল শাহা খোশালিত হৈয়া ।।  
গোছল দিয়া বেরাহিমে দুলা সাজাইয়া ।  
আর আর মহলার লোক যত ছিল ।।  
সেতাবি করিয়া সবে মাঙ্গাইয়া নিল ।



বসিল আসিয়া সবে মজলিস করিয়া ।।  
গোলাল আর বেরাহিমে দেলাইতে বিয়া ।  
শরার দস্তুর মত আনিতে এজেন ।।  
ভেজিল উকিল আর গাওয়া দুইজন ।  
উকিল একজন লিয়া গোলাল বিবীর ।।  
মজলিসে আসিয়া যবে হইল হাজির ।

[বোন বিবী জহুরা নামা, পৃ.৪]

বেরাহিম গোলাল বিবিকে দ্বিতীয় বার বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নেয় তাঁর চিত্রই এখানে পরিস্ফুট এবং বেশ কিছু শব্দ নজর কাড়ছে যেমন- গোছল, সেতাবি, মজলিস, কাজি, দোওয়া ইত্যাদি ।

**মাতৃগর্ভে শিশুর গঠনে ব্যবহৃত ভাষা:**

এক মাসে বিন্দু পানি, নাহি হয় জানাজানি, দুই মাসে রক্তের কিরন ।।  
থোড়া থোড়া দিনে দিন, পুতলির হবে চিন, কিছু এয়ছা হইতে সৃজন ।  
তার পরে তিন মাসে, হয়ে আইল রগরিসে, হাড় আর মাংসের সঞ্চর ।।  
চারি মাসে হস্ত পদ, পাঞ্জর ইত্যাদি যত, হইল সেই মাংসের মাঝার ।  
যেখানে যেমন সাজে, হৈল সব ভার মাঝে, নাড়ি ভূড়ি যত স্থানে স্থান ।।  
পাঁচ মাসে পঞ্চদয়, কিছুই না বাকি রয়, নাক মুখ হইল চক্ষু কান ।  
প্রাণ যে বসিল ঘরে, তখন রহিতে নারে, হৈল ভাটি উজানির মেলা ।।  
ছয় মাসে রগ হাড়ে, জোড়া লেগে জোড়ে জোড়ে, নির্মল হৈল তনু থানি ।।  
সাত মাসে নর নারী, বহে অঙ্গ সারি সারি, হেলা দোলা করে যাদু মণি ।  
আট মাসে অষ্ট ঘাটে, হাওয়াতে তরঙ্গ উঠে, দুই ঘাটে হাওয়া দেয় নাই ।।  
সে বড় প্রবল ঘাট আজব তাহার ঠাট, সেই ঘাটে চিন্তিতের ঠাই ।  
নয় মাস অন্ধকারে, রহিতে নাহিক পারে, বন্ধ আখি খুলিবারে চায় ।।  
দশ মাস হৈল যবে কষ্ট বড় পায় গর্ভে, কহে আর না রব হেথায় । [বোন বিবী  
জহুরা নামা, পৃ.৫]

এই রচনাকারেরা এখানে বেশ কিছু শব্দকে আলাদাভাবে তুলে ধরেছেন কাব্য রচনায় এবং একজন নারী গর্ভবতী হওয়ার পর তাঁর পেটের ভিতর শিশুর গঠন কেমন হয় তা শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে বর্ণনা করেছেন।

সেখ কমরুদ্দিন তাঁর ‘খায়রল হাশার’ কাব্যে শিশুর গঠনের ব্যাখ্যা করেছেন।  
প্রথম মানব হিসাবে আমরা আদমের নাম জানি সেই আদমের সৃষ্টি বর্ণনা করেছেন-

পুতলা বানাও তুমি আপনার হাতে।।  
রুহ্ বখশি করি আমি ঐ কালেবেতে।  
শুনে আজাজিল করে পুতলা তৈয়ার।।  
শির মোবারক গড়ে দেখিতে বাহার।  
হাত পাও নাক কান তৈয়ার করিল।।  
চোখ মুখ আদি যত সব বানাইল।  
এই রূপে তরো তরো হইল গঠন।।  
দেমাগ হইতে বরি আপে নিরঞ্জন।  
রুহ্ নিকালিয়া দিল আদমের পরে।। [খায়রল হাশার, পৃ.১০]

এই একই কাব্যে বিবি হাওয়ার গর্ভধারণের কথাও জানা যায়।

পরে বিবী হাওয়া আপে হৈল বারদার।।  
হামেহাল হইল ভারি শোন সমাচার।  
পহেলাতে বিবী যবে হামেল হইল।।  
কুদরত ইলাহী তাতে জাহের করিল।  
এই রূপে দিনে দিন যায় গোজারিয়া।।  
বারদার ছিল বিবী দেখনা বুঝিয়া।  
দশ মাস দশ দিন পুরিল যখন।।  
খালাসের দরদে বিবী হৈল অচেতন।  
ইলাহী আলমিন আল্লা রহম করিল।।  
বেটা বেটা দুই সন্তান তাওলাল্লাদ হইল। [খায়রল হাশার, পৃ.২০]

কোরান পাঠে ব্যবহৃত ভাষা:

পড়িতে লাগিল কোরান জুজদান খুলিয়া ।  
সামনে রাখিয়া কোরান করিয়া সালাম ।।  
পহেলা বিছমিল্লা পরি পড়ে আলেফলাম ।  
ধীরে ধীরে কোরান পড়িল এক ছাফা ।।  
জার জার হইয়া কান্দেন মোহাম্মদ মোস্তফা ।  
ভিজিল গায়ের জব্বা আঁখের পানীতে ।।  
কোরান শুনিয়া সবে লাগিল কান্দিতে । [ছহি আবুসামা, পৃ.২]

নারীর সৌন্দর্য বর্ণনায় ব্যবহৃত ভাষা: জয়নাল আবেদীন তাঁর কাব্যে পিঞ্জিরার দেহের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ।

সোনার বরণ তনু সুন্দরী পিঞ্জিরা ।।  
মৃগের নয়ন তার ভুরু দুটি জোড়া ।  
মুখ পূর্ণিমার শশী যেন কাচা সোনা ।।  
ঘরেতে করেন বিবি এলাহি ভাবনা ।  
অপূর্ব চিকন খোপা তার সোনার ঝাপা ।।  
লোটনে মল্লিকা ফুল গন্ধরাজ চাঁপা ।  
কপালে টিকাল যেন বিজলি হেন জ্বলে ।।  
সূর্যের উদয় যেন বিহানের কালে । [ছহি আবুশামা, পৃ.৬]

নারী দেহের সুন্দর বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ ইউনুছ তিনি তাঁর কাব্যে ঘারভাল কন্যা নিবারণ সুন্দরীর বর্ণনা তুলে ধরেছেন-

আর্শী চেয়ে চুল ঝাড়ে চিরণী লাগাই ।।  
যেছা মেয়ের মুখের ছটা, নারাজি হুদ্রের গেটা, হুর পরি মোহ যায় থাকুক গোসাই ।  
কপালে তিলক ফোটা, জানু সম কেশের জোটা ।

[আবদুল আলী গারলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি, পৃ.২]

স্ট্রী জাতির শোক প্রকাশের ভাষা: হাবীলের মৃত্যুর পর আকলিমা স্বামীকে উদ্দেশ্য করে এইভাবে দুঃখপ্রকাশ করে ।

আকলিমা কান্দিয়া উঠে কোথা রৈল স্বামী ।

হয়গো প্রাণের পতি এই ছিল লেখা ।।  
বেওয়া করে গেলে মোরে না হইল দেখা ।  
আছাড় কাছাড় খায় কান্দে জারে জার ।।  
পাগলিনী হইল যেন হয়ে বেকারার ।  
সোনার সুরত বিবী লুটাইল থাকে ।।  
এ দুঃখিনী অনাথিনী ডাকে যে তোমাকে ।  
আমাকে সঙ্গিনী করে সঙ্গে লেহ তুমি ।।  
কি সুখেতে দুনিয়াতে রব বেঁচে আমি । [খায়রল হাশার, পৃ.২৯]

এই একই কাব্যে বিবি হাজেরা বনবাসে গিয়ে একাকিনী বনের মধ্যে যেভাবে দুঃখ করে-

আহা গো প্রাণের পতি কি দোষ পাইলে ।।  
বিনা দোষে কেন মোরে বনে পাঠাইলে ।  
পতি হয়ে মোরে যদি দিলে এত দুঃখ ।।  
কাহারে বলিব আমি ফেটে যায় বুক ।  
মাতা পিতা নাহি এথা নাহি দোস্তু ভাই ।।  
এ দুঃখ বলিব কারে কেহ মোর নাই ।  
কিসেতে খাইবে মোরে কিসেতে মারিবে ।।  
বিপদের কালে হেথা কেবা বাঁচাইবে ।  
আমি বনে মরি যদি তাতে নাহি দুঃখ ।।  
মারিলে দুধের ছেলে ফেটে যাবে বুক । [খায়রল হাশার, পৃ.৫৫]

নিজের প্রিয়জনকে হারানোর দুঃখ এক নারীর কণ্ঠে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা শেখ কামরুদ্দিন তাঁর কাব্যে বর্ণনা করেছেন-

বিবি বলে এন্তেকাল বাবাজির হয়েছে সেই শোকে দেল বড় বেকারাহ আছে ।  
আপনার একরারে আমি ছিনু যে বাহাল ।।  
মরন কালে না দেখিনু বাপের জামাল ।  
একথা শুনিয়া সেই খোদা সওদাগর গমগিন হইল বড় দেলের মাঝার ।

[ছহি নেক বিবির কেচ্ছা, পৃ.২৭]

আবুশামার শাস্তির কথা শুনে তাঁর মা সন্তান হরানোর ভয়ে যেভাবে শোক প্রকাশ করে।

কি দোষে মারেন কাজি আমার বাছারে।  
আবুশামা বিনে মোর কে বলিবে মায়।।  
হায় হায় করে বিবি দরবারেতে যায়।  
চুল নাহি বান্ধে বিবি কাপড় নাহি ছেরে।।  
কান্দিতে কান্দিতে গেল কাজির হুজুরে।  
যেখানেতে ছিল কাজি দরবার বসিয়া।।  
সেখানে পড়িল গিয়া আছাড় খাইয়া।  
আছাড় খাইয়া পড়ে খছমের পায়।।  
বাছার হাতে রসি দেখে ছাতি ফেটে যায়।  
তকছির ছাবেত এর হইল কি মত।।  
কোন দোষে বাছা মোর মারহ হজরত।  
বাছা মোর নেক ভাল তাহা জানি আমি।।  
কি জন্যে বাছারে মোর খুন কর তুমি।  
পুত্রদান দেহ আমি অভাগিনী মাই।।  
আবুশামা গেলে আর জীব নাই। [ছহি আবুসামা, পৃ.১৫]

গোলাল বিবিকে বনবাস দিলে বনের মধ্যে অসহায় অবস্থায় স্বামীকে হারিয়ে

যেভাবে দুঃখপ্রকাশ করে-

নিদ্রা হৈতে চেতন পাইল কতক্ষণে।  
বেরাহিম নাহি আছে দেখিবারে পায়।।  
বেকারার হয়ে বিবী চারিদিকে চায়।  
কোন দিকে কিছুই না উদ্দেশ পাইয়া হায় হায় করে কান্দে মাথায় মারিয়া।  
কহে হায় একি দায় ঘটিল আমারে।।  
কি হইবে কোথা যাব জঙ্গল ভিতরে।  
এনে মোরে ভুলইয়ে হায় প্রাণ প্রিয়া।।  
রেখে গেলে জঙ্গলেতে বনবাস দিয়া।  
এই কি হে প্রাণনাথ ছিল তব মনে।।

এ হালে ফেলিলে মোরে দুঃখের আগুনে।  
একেত অবলা বালা নারী ছার জাতি।।  
তাহে এলাহির চাহা আছি গর্ভবতী।  
কেমনে এমন হালে দিলে মোরে বন।।  
জানিলাম নিদারুণ পুরুষের মন। [বোন বিবী জহুরা নামা, পৃ.৭]

দুঃখের মৃত্যুর খবর শুনে তাঁর মায়ের শোকপ্রকাশ-

হায় হায় বলে মুখে, জমিনেতে ছের ঠুকে, কান্দে আখে আছু বহাইয়া।  
ওরে ধোনা কি কহিলি, কলেজা হইল কালি, হানিলি শোকের তীর বুকে  
কাজালের ধন লিয়া, কোথা আইলি হারাইয়া, মা বলিয়া কে ডাকিবে মোকে।  
হায় রে নয়ন তারা, কোথা গিয়া হৈলিহারা, দুখিনীরে দেখা দে আসিয়া।।  
ডাক এসে মা মা বলে, বাছা বলে কার কোলে, আখি ঠান্ডা হউক দেখিয়া।  
পুত্র শোকে কান্দে বুড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি, ছের ঠুকে বাছা বাছা বলে।।  
ওরে দুখিনীর দুখে, দেখা দে আসিয়া মোকে, কলেজা কাবাব হোল জ্বলে।  
বুড়া কালে মোরে এবে দেখা শোনা কে করিবে, কেহ আর না আছে আমার।।  
যাইব কাহার দ্বারে, কে ভাল বাসিবে মোরে, তোমা বিনে সকলি আন্ধার।  
[বোন বিবী জহুরা নামা, পৃ.২৮]

স্বামীকে হারিয়ে নিবারণ যেভাবে দুঃখপ্রকাশ করে-

কেমন সাপে খায় জানি পতি প্রাণধন।।  
আহা প্রভু দুঃখিনি যে ত্যজিবজীবন।  
সে সর্পের সন্ধান পাইলে মারিতাম কাছাড়ি আহা বিধি হইলাম বুঝি কাছা বয়সে রাড়ি।  
এমত বিলাপ কন্যা কান্দে উভরায়।।  
তৈল শিন্দুর মাথে দিয়ে আসি ধরে চায়।  
সিতার শিন্দুর হইলেক মলিন আকার।।  
হায় হায় স্বামী বিনে জীবন অসার।

[আবদুল আলী গারলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি, পৃ.৭]

**নারীর তিরস্কারের ভাষা:** কলিকালের বিবিরা স্বামীর কাছে প্রয়োজনীয় জিনিস চেয়ে না পেয়ে যে ভাষায় কথা বলে-

আমি বলিলাম তারে, দুনিয়া হইতে উড়ে, মুখ পোড়া যাও তুমি মরে।  
তোর রঞ্জি রোজগারে, আগুন লাগুল ওয়ে, যাওনা মরে ওরে হতভাগা।।  
বিজলি তোর মাথায়, ফেলুক যে খোদায় করিতে পারিব তবে নেকা।  
এমন হতভাগায় সাদী দিল বাপ মায়, মনের দুঃক্ষ রহিল মনেতে।

[ছহি নেক বিবির কেচ্ছা, পৃ.৩১]

**গানের ভাষা:** বেশ কিছু কেচ্ছায় গানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মুসলমান সাহিত্যিকদের কাব্যে ব্যবহৃত গানগুলির বক্তব্যে কি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, কি জন্য গান গাইছে, গান গাওয়ার ফলে চরিত্রগুলির মধ্যে কোন মনস্তাত্ত্বিক দিকের পরিচয় ফুটে ওঠে তা বুঝে নেওয়ার মতো। গানগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়েছে, প্রেমিক পুরুষকে উদ্দেশ্য করে, কখনও বিরহে, কখনও সখীদের উদ্দেশ্যে অথবা মিলনের আনন্দে গানের অনুষ্ঙ্গ এসেছে। এই ধরনের কেচ্ছায় ধ্রুপদি সংগীত এর পাশাপাশি লোকগীতি সংগীতও ব্যবহার হয়েছে। বিভিন্ন রাগ যেমন- ললিত, বেহাগ, বাহার, সিন্ধু, ভৈরবী, ও বিভিন্ন তাল যেমন- খেরাবাদী, তেতলা, একতলা ব্যবহারে গান লেখা হয়েছে। গানগুলি রচনার মধ্য দিয়ে কবিদের লোকগানের সঙ্গে জড়িত জীবনের কথা উঠে আসে। গানগুলি যেভাবে লিখিত হয়েছে কাব্যে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল-

ধুয়া- বন্ধু আড়নয়নে ও নাথ আড়নয়নে। তোরে আড়নয়নে দেখিলামনা।।

[আবদুল আলী গারলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি, পৃ.১১]

ইংরেজি ‘Refrain’ শব্দটি বাংলায় ‘ধুয়া’। এই বাংলা ‘ধুয়া’ শব্দটি এসেছে ‘ধ্রুব’ শব্দ থেকে। ‘ধুয়া’ হল ‘কীর্তনাদি গানের যে পদ দোহারগণ বারবার গায়’। অর্থাৎ ‘ধুয়া’ কীর্তন গানের একটা বিশেষ গায়ের রীতি বা ভঙ্গী।<sup>১৬</sup>

আবদুল মজিদ ভুইঞা রচিত ‘ছহী রঙ্গ-বাহার’ এই কেচ্ছায় গানের ব্যবহার বেশি মাত্রায় লক্ষ করা যায়, নারীদের উদ্দেশ্যে গান, প্রেমের গান, বিরহের গান, বিবাহের গান ইত্যাদি নানা রকম প্রেক্ষিতে গানের মধ্যে দিয়ে বক্তব্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

### নারীদের উদ্দেশ্যে গাওয়া গানের ভাষা:

নারী না হয় আপন, ওহে বন্ধুগণ।  
দুঃখ ভাবি থাকে সদা কুকর্মেতে মন  
নাহি জানে ক্রিয়া কর্ম, নাহি কিছু লজ্জা ধর্ম,  
নাহি রাখে দয়া ধর্ম, বড় নিদারুণ। (পৃ.৩১)

### বিরহের গানের ভাষা:

হায় হায় কোথা এবে যাইব এখন।  
এতদিন পরে বুঝি হলোরে মরণ।। (পৃ.১১১) [রাগিনী- বেহাগ, তাল- একতালা]

### মিলনের গানের ভাষা:

অনেক দুঃখেতে দোহে মিলন হইয়া ছিল।  
সংসার তাপিনী তাহে তাপিত করিয়া দিল।। (পৃ.১০৩) [রাগিনী- বেহাগ, তাল- তেতালা]

### বিবাহের গানের ভাষা: হিন্দি গজলের সুরে এই গান গাওয়া হয়েছে।

সাদিয়ে জেলভায়ে দেলদার মোবারক হবে।  
আয়েস আসরতকা সারাঞ্জাম মোবারক হবে।। (পৃ.১০১) [রাগিনী- শাহান, তাল- পোস্তা]

### দুঃখের গানের ভাষা:

ভোর হইল, নিশী গেলে, প্রিয় বন্ধু কোথা।  
না দেখিয়া প্রাণ যায় প্রাণে হৈল ব্যাথা।। (পৃ.১০৭) [রাগিনী- ভৈরবী, তাল- খেরাবন্দী]

মুন্সী মোয়াজ্জম আলী রচিত 'আমির সদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরীর পুথি' এই  
কেছায় বিভিন্ন গানের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

### মুরশিদী গান:

মন জাগনিয় সমনে গণে দিন।।  
নিদ্রা গতে বিষম চোরা ঘরে দিল সিঙ্গও  
(মনরে) আকাঠা মাদারের নাও, কোন জনে বানাইলরে।। (পৃ.২৯)



### ফকিরী গান:

কোথা হইতে আইলিরে বান্দা কোথায় তোর বাসা ।  
মিছা দুনিয়ার সঙ্গে প্রেম, ভোজের তামাসা ।।  
জরু লাড়কা জমিদারী, পেয়ে হইলি বেহুশিয়ারী,  
মজা মারলি দিন দুই চারি, গলায় লইয়া ফাস ।। (পৃ.২৯)

### মনমোনের গান:

ফকিরী কি গাছের গোটা ।  
ঢেকি যদি স্বর্গে যাইত, বাড়া বানত তবে কেঠা ।।  
ফকিরী বড়ই শক্ত, ফকির ছিল আজাদ রক্ত, (পৃ.৩১) [তাল- একতারা]

### বাউল সুরের গান:

ওরে আমার সাধের মন পাখী, আল্লা বলে ডাক দেখি ।  
আমি এত করে বুঝাই তোরে, ভেবে একবার দেখ দেখি ।। (পৃ.৩২) [তাল- খেমটা]

### রসিকের গান:

তুমি কিসের গুমান কর ওলো সুন্দরী ।  
তোমার চিরদিন রবেনা লো রূপের মাধুরী ।। (পৃ.৩৪) [তাল- কাওয়ালী]  
মুনশী মহাম্মদ তাঁর 'বড় নিজাম পাগলার কেচ্ছা'তে বেশ কয়েকটি গানের  
প্রয়োগ ঘটিয়েছেন ।

### আল্লাহর মহিমা প্রকাশের গান:

অগো কে বুঝিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার ।।  
সকোলি করিতে পারো অগো নৈরাকার । (পৃ.২)

### প্রেমের গান:

জে জোন জানে না প্রেম সে মজা জানে কি তার ।।  
জে মজেছে সেই জানে অল্পে কি জানিবে আর । (পৃ.১০)

### বিরহের গান:

কোথা ওগো শশি, দেখা দেও আসি, নয়ন জলে  
ভাসি, ওগো রূপসি ।। তোমারি কারন, জায়গো জিবন  
দেখা দিয়ে মন, রাখগো আসি । না হেরে তোমায় ।। (পৃ.১৮)

### দুঃখের গান:

এসহে প্রাণ, হৃদয়েরী ধন, হেরি তোমারে; ভরি দুনয়ন।

তোমারি তরে, এ হৃদি বিদরে, ভাসে দু নয়ন।। (পৃ.৩৩) [রাগিনী- বেহাগ, তাল- খাম্বাজ]

**গজল গান:** বিবাহ-অনুষ্ঠানে গজল গাওয়ার বেশ চল দেখা যায়। এখানে গজল মজুরা গাওয়া হয়েছে।

আজ হয় রং হয় মেরি জান আরমান সবকা হোবে।।

আরসে ছে ফারসে জমি বুলবুলে নিজাম চামান হোবে। (পৃ.৪২)

মুনশী আবদুশ্ শকুর ‘ছহী গুলে বকাওলী’ কেছায় বেশ কয়েকটি গানের ব্যবহার ঘটিয়েছেন।

### দুঃখের গান:

হায়রে দারুন বিধী নছিবতে কি এই ছিল।

রাজ রাণী হৈয়ে এখন ঝাড়ু কসি বক্তে হলো।।

আছিলাম রাজ রাণী, হলেম এখন কাঙ্গালিনী। (পৃ.৬) [রাগিনী- বেহাগ, তাল- আড়া]

### প্রেমের গান:

বলো দেখি প্রাণ নাথ কি দুখ তোমারি মনে।

হাস্য মুখে বাক্য রে প্রাণ বলো নাহি কি কারণে।। (পৃ.২৮)

[রাগিনী- বেহাগ, তাল- আড়াঠেকা]

এছাড়া আবদুর রহিম তাঁর ‘গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথী’তে গানের ভাষা ব্যবহার করেছেন।

### ধূয়া:

ঠমকে ঠমকে চলে সব পরি নারী।।

বলমল করে রূপ আহা মরি মরি। (পৃ.২১)

### খেমটা গান:

গুমরি গুমরি কান্দে রাজার কুমারি।। কেশ এল, চক্ষে জল,

পড়ে ঝরঝরি।। ত্যাজে সাড়ি, ভূমে পড়ি, যায় গড়া গড়ি

ক্ষনে উঠে, ক্ষনে লোটে, হৈয়া দিগাম্বরী। (পৃ.৩৪) [তাল- আড়া]

## আত্মা তালের গান:

আহা মরি প্রাণ প্রিয়া ও প্রাণ বিধুমুখী।।

ইকি রতি বিপরিত তোমার চরিত্র দেখি। (পৃ.২৬)

লোকগানের সঙ্গে সাহিত্যিকদের যে একটা সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটা এখানে আমরা ধরতে পারছি কারণ সাধারণ মানুষের যে জনজীবনের সঙ্গে যেখানে যেখানে আমরা যুক্ত হতে চাই সেই জায়গা থেকেই এই সাহিত্যিকরা তাঁদের কাব্যকে দেখতে চেয়েছেন। এই গবেষণায় আমরা দেখতে চেয়েছি সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রা, ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছেদ, ব্যবহৃত জিনিসপত্র ইত্যাদির পাশাপাশি তাঁদের জীবনের যে গান সেটাও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছে, কাব্যে বর্ণিত গানগুলি এর ব্যতিক্রম নয়। যে গান তাঁরা ভালোবাসে, সেই গানই এই কাব্যের ভিতরে চলে এসেছে। গানের ভিতর যে শব্দগুলি আমরা পাই, যে বিষয়গুলি পাওয়া যায় সেখানেও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্তযুক্ত শব্দ সাহিত্যিকরা ব্যবহার করেছেন। গানগুলির মধ্য দিয়ে যে শব্দগুলি পাচ্ছি তা লৌকিক জীবনের কালচারকেই প্রকাশ করে। পাশাপাশি কিছু গান আছে যেগুলো ধ্রুপদি বা ক্লাসিক্যাল গান এগুলোর রাগ-তাল দেখে আমরা বুঝতে পারি। এই ধ্রুপদি গান ইসলামনির্ভর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ ইসলামিক সংস্কৃতিতে এই গানের একটা অন্যতম দিক আছে।<sup>২০</sup> আর সাধারণ মানুষের জীবনের যে বাউল গান, রসিকের গান, মুরশিদী গান, মনমোহনের গান, গজল তার একটা প্রভাবও এখানে আছে। কিছু গান আছে ইসলাম সম্প্রদায়ের লোকেরাই গায় যেমন- গজল, মুরশিদী ইত্যাদি। বাউল গান আবার উভয়ধর্মের লোকেরাই গায়। মানুষ হচ্ছে আসল অর্থাৎ মানুষের পরিচয় এই গানগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সেকথাও বলা যায়। আর আমরা কাব্যগুলোতে তারই প্রতিচ্ছবি দেখি।

গ. দোভাষী সাহিত্যে ভাষাগত বৈচিত্র্য ও শব্দ ব্যবহারের প্রায়োগিক দিক  
(আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি-সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার ও তাঁর অর্থ)

মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনাকর্মের ক্ষেত্রে পাঠককূলে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে চোখে পড়ে এর ভাষা, এই সাহিত্যগুলিতে আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি শব্দবহুল ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণায় নির্বাচিত কাব্যগুলিতে এই শব্দের সমাহার লক্ষণীয়। আনিসুজ্জামান জানিয়েছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বিদেশি শব্দকে ব্যবহার করে বাংলার মুসলিম সাহিত্যিকরা কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের এই ধরনের কাব্য রচনা পরিচিত হয়ে থেকেছে বিভিন্ন নামে অনেক পণ্ডিত এই কাব্যকে অনেক ভাবে নাম দিয়েছেন, কেউ বলেছেন- ‘মুসলমানি বাংলা কাব্য’, কেউ বলেছেন- ‘বটতলার পুথি বা দোভাষী পুথি’। আনিসুজ্জামান যে নামে পরিচয় দিতে চেয়েছেন তা হল- ‘মিশ্র ভাষারীতির কাব্য’।<sup>২১</sup> তাহলে বলা যেতেই পারে শুধুমাত্র জাতিগত বিভেদের কারণেই মুসলিম সাহিত্য/ ইসলামি সাহিত্য নাম হয়নি, ভাষার এই ধরনের বৈচিত্র্যও একটা প্রধান কারণ। ‘দোভাষী পুথি’ বলে যাকে আমরা জানি সেই ভাষা শুধুমাত্র একটি বা দুটি ভাষার আদলে তৈরি নয়, বিভিন্ন ভাষা যেমন- (আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি) নিয়ে গঠিত ভাষা। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই ফারসি ভাষা শিখেছেন কিন্তু শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনায় আরবি ও সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য বেশি ছিল। সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির ব্যবহারিক জীবনে শাস্ত্রের ভাষা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, মুসলমান সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুনীতিকুমার চ্যাটার্জীর কথায় আমরা জানতে পারি মুসলমানদের বাংলা সাহিত্য ধর্মীয় রচনা, ফারসি ভাষার গল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে। মুসলমান সাহিত্যিকরা কাব্য রচনায় আরবি-ফারসি গ্রন্থের অনুসরণ করেছেন কিন্তু বর্ণমালা হিসাবে ব্যবহার করেছেন বাংলা ভাষা। ফলে কাব্য রচনায় ভাষার বৈচিত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।<sup>২২</sup> আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন এই ভাষা নিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করে বলেছেন- আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দবহুল ছন্দোবদ্ধ ইসলামি ভাবসমৃদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় রচিত এক বিশেষ ধরনের সাহিত্যকে বলা হয়

‘দোভাষী’ বা ‘মুসলমান’ পুথি সাহিত্য। এককালে এই সাহিত্য আসাম, পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার বাঙ্গালা ভাষা-ভাষী মুসলিম সমাজে জনপ্রিয় ছিল। আরও জানতে পারি গৌড়ের স্বাধীন সুলতানগণের উৎসাহে হিন্দু সাহিত্যিকরা একদিকে যখন প্রধানত সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ দ্বারা বাংলা সাহিত্যের রসভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলেন অন্যদিকে মুসলিম সাহিত্যিকরাও আরবি, ফারসি, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় রচিত কিসসা কাহিনি ও অন্যান্য বিষয়ে নানা গ্রন্থের অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সহায়তা করেছিলেন।<sup>২৭</sup> মুসলমান সাহিত্যিকরা এই ধারাকে অবলম্বন করেই বাংলা সাহিত্যে নিজেদের বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হন। তাঁরা নিজেদের শাস্ত্রের ভাষাকে যেমন ব্যবহার করতে শিখেছেন অন্যদিকে বাংলায় শাসনকার্য পরিচালনায় নিজেদের ‘বাঙালি’ পরিচয়ে আবদ্ধ করতে বাংলা ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রবেশের ফলে ইসলামি সাহিত্যের প্রসার ঘটে এবং বাংলা সাহিত্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এর মাধ্যমে এদেশে আরবি-ফারসি শব্দের প্রচলন শুরু হয়। কাজী রফিকুল হক বলেন-

“বাঙালি মুসলমানদের দেশীয় সাহিত্য রচনায় তাদের আরবী-চর্চার প্রভাব দেখা যায়। বাংলা ভাষায় যেসব আরবী শব্দ প্রবেশ করেছে, তা বাংলায় ব্যাপকভাবে আরবী-ভাষাচর্চার ফল। মুসলমানগণ ইসলামি শরা-শরিয়ত সম্বলিত কাব্য এবং মুসলিম ঐতিহাসিক কাহিনি কাব্য রচনায় হাত দেন। এ-সমস্ত কাব্যে স্বাভাবিকভাবেই আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।”<sup>২৮</sup>

মনে করা হয় ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের অধীনে আসে বাংলাদেশ। রাজকার্য পরিচালনার জন্য ফারসি ভাষাকে গ্রহণ করা হয়। তার ফলে বাংলা কথ্যভাষায় প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ প্রবেশ করে। উনিশ শতকের প্রথমেই রামরাম বসুর গদ্যে আরবি-ফারসি বহুল শব্দযুক্ত ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ১৮৩৮ খ্রিঃ নাগাদ রাজকার্যের ভাষা ইংরাজি হওয়ার ফলে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার কমে যায়।<sup>২৯</sup> আবদুল হাকিম এর কথায় আরও জানতে পারি-

“....he says that, after Arabic and Persian, Bengali is the language of Islam. Those who do not know Arabic and Persian, should read Islamic literature in Bengali, otherwise they cannot have ‘faith’, they will remain in ‘darkness’. This shows that the tradition of Islamic literature in Bengali had become well-established during the time of his composition.”<sup>২৬</sup>

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সমস্ত পুথিগুলিতে আরবি, ফারসি ও উর্দু গ্রন্থের অনুকরণে ও ইসলামি শিক্ষার প্রভাবের ফলে রচিত হয়েছে বলে প্রথমে আল্লাহ’র বন্দনা বা হামদ, তারপর রসুলের প্রসংশা বা না’ত এছাড়া সমসাময়িক শাসনকর্তার কথা বলেন। বেশিরভাগ সাহিত্যিকই পুথি কথাটি বলেছেন। এই পুথিগুলি বাঙ্গালা হরফে লেখা এবং পঙ্ক্তিগুলি বাংলা নিয়মে বামদিক থেকে ডানদিকে লেখা কিন্তু পৃষ্ঠাগুলি পড়ার সময় আরবি নিয়মে ডানদিক থেকে বামদিকে সাজানো। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন-

“Dinesh Chandra Sen who supported the use of perso-Arabic vocabulary elements on many occasions and strongly condemned the Hindu writers who avoided them as an orthodox Brahan avoids the touch of a Muhammadan.”<sup>২৭</sup>

সময়ের হিসাবে বিচার করলে দেখা যায় অন্ত্য মধ্যবাঙলার ভাষার বৈশিষ্ট্য এই সময়ের মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে। পাশাপাশি আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে লেখার ক্ষেত্রে। Syed Ali Ashraf এর কথায় জানা যায় অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহার সাহিত্যের দরবারে নতুন দিক উন্মোচন করলেও সময়ের গতিতে মুসলমান আধিপত্য শেষ হতেও থাকে একটা সময় পর। ক্ষমতার হস্তান্তর হয় এবং মুসলমানরা যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন সেই ভাষাকে বাংলা ভাষা থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেন একদল শাসক শ্রেণি। ফলে মুসলমানদের জন্য এই সময়ের শেষের দিকটা ছিল হানিকর।<sup>২৮</sup> মুসলমান সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত নির্বাচিত সমস্ত কাব্যজুড়ে কম-বেশি যেভাবে এই আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে নিচে তালিকা তৈরির মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হল।

## আরবি শব্দের প্রয়োগ

কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ	উৎস	বাংলা অর্থ
তরিক	আরবি 'ত্বারিক'	পদ্ধতি
ইনকার	আরবি 'ইনকার'	অস্বীকার
খছম	আরবি 'খসম'	স্বামী
দীন	আরবি 'দীন'	ধর্ম
নবী	আরবি 'নবী'	পয়গম্বর
আওরত	আরবি 'আউরাত'	নারী, মহিলা
কওল	আরবি 'ক্বাওল'	কথা, বাক্য
আলমে	আরবি 'আলম'	দুনিয়া, পৃথিবী
কেয়ামত	আরবি 'ক্বিয়ামত'	অন্তিম বিচার
তামাম	আরবি 'তামাম'	সমগ্র
তকছির	আরবি 'তাকসির'	ভুল, ত্রুটি
রসি	আরবি 'রিশা'	রজ্জু, দড়ি
শোকর	আরবি 'শুকর'	কৃতজ্ঞতা
মালুম	আরবি 'মা'লুম'	বোধ
হামেলা	আরবি 'হামিলাহ'	গর্ভবতী
জিবরিল	আরবি 'জিবরাঈল'	একজন উল্লেখযোগ্য ফেরেস্টা
এন্তেকাল	আরবি 'ইনতিক্বাল'	মৃত্যু
ইমান	আরবি 'ইমান'	বিশ্বাস
ছেকের	আরবি 'সিহর'	মন্ত্রশক্তি, যাদু
রেজেক	আরবি 'রিজক'	জীবনোপকরণ
খেদমত	আরবি 'খিদমত'	পরিচর্যা
জিকির	আরবি 'জিকর'	উচ্চকণ্ঠে আল্লাহর নাম স্মরণ
তাজ্জব	আরবি 'তা'আজ্জুব'	বিস্ময়
শরিফ	আরবি 'শরিফ'	ভাগীদার
কাদির	আরবি 'ক্বাদির'	শক্তিশালী
কুদরত	আরবি 'ক্বুদরত'	ক্ষমতা
দোওয়া	আরবি 'দু'আ'	মঙ্গলকামনা
রহমত	আরবি 'রহম'	অনুগ্রহ

বরকত	আরবি 'বরকত'	প্রাচুর্য
আখের	আরবি 'আখির'	মৃত্যুকাল
তওবা	আরবি 'তাওবাহ'	অনুশোচনা
মাজুল	আরবি 'মা'জুল'	পদচ্যুত
ছুরত	আরবি 'সূরত'	চেহারা
জামাল	আরবি 'জামাল'	সৌন্দর্য্য
ফজর	আরবি 'ফাজর'	প্রাতঃকাল
ওক্ত	আরবি 'ওয়াক্ত'	নির্ধারিত সময়
জুমা	আরবি 'জুম'আহ'	শুক্রবার
গায়েবি	আরবি 'গায়বি'	অদৃশ্য
ফরিদ	আরবি 'ফরিদ'	বন্ধু, প্রিয়জন
মুরিদ	আরবি 'মুরিদ'	ধর্মপুরুষ
আরজ	আরবি 'আরয'	প্রার্থনা
খাদিম	আরবি 'খাদিম'	ভৃত্য
ওহি	আরবি 'ওয়াহি'	আল্লাহর বাণী
লানত	আরবি 'লা'নত'	ধিক্কার, অপমান
খারাবি	আরবি 'খরাবি'	অনিষ্ট
হালাক	আরবি 'হালাক'	সর্বনাশ
আখেরাত	আরবি 'আখির'	মৃত্যুকাল
ওফাত	আরবি 'ওয়াফাত'	পরলোকগমন
কবুল	আরবি 'ক্ববুল'	সম্মতি, স্বীকার
এন্তেজার	আরবি 'ইনতিজার'	প্রতীক্ষা
মাশুক	আরবি 'মা'শুক'	প্রিয়তম
আশক	আরবি 'ইশক'	প্রেমিক
তারিফ	আরবি 'তা'রিফ'	প্রশংসা
নুর	আরবি 'নুর'	জ্যোতি
হাসর	আরবি 'হাশর'	শেষ বিচারের দিন
কেছা	আরবি 'ক্বিসসহ'	কাহিনি
তাবেদারি	আরবি 'তাবিদার'	অধীনতা, বশ্যতা
জান্নাত	আরবি 'জান্নাত'	স্বর্গ
মিছকিন	আরবি 'মিসকিন'	দুঃস্থ



হারাম	আরবি 'হারাম'	ইসলামে অবৈধকাজ
ওয়াদা	আরবি 'ওয়া'দাহ'	অঙ্গীকার
অদুল	আরবি 'উদুল'	বিচ্যুতি
জইফ	আরবি 'জয়িফ'	দুর্বল
আহকাম	আরবি 'আহকাম'	নির্দেশাবলি
দোররা	আরবি 'দুররাহ'	চাবুক
আয়েব	আরবি 'আইব'	দোষ
ওয়ালেদ	আরবি 'ওয়ালিদ'	পিতা
হেকমত	আরবি 'হিকমত'	চাতুর্য
হকিকত	আরবি 'হাক্কিকত'	বাস্তব
মক্কর	আরবি 'মক্কর'	লীলা
আমির	আরবি 'আমির'	নেতা
এবাদত	আরবি 'ইবাদত'	উপাসনা
মরতবা	আরবি 'মরতবাহ'	সম্মান
তওফিক	আরবি 'তাউফিক'	ক্ষমতা
মাবুদ	আরবি 'মা'বুদ'	উপাস্য
তারিফ	আরবি 'তা'রিফ'	প্রশংসা
এতিম	আরবি 'ইয়াতিম'	পিতৃমাতৃহীন সন্তান
হাবিব	আরবি 'হাবিব'	প্রিয়জন
নাজেল	আরবি 'নুজুল'	উপস্থিতি
মোমিন	আরবি 'মুমিন'	বিশ্বস্ত
ছফর	আরবি 'সফর'	আরবি বর্ষের দ্বিতীয় মাস
মোকাম	আরবি 'মক্কাম'	গৃহ
হালাল	আরবি 'হালাল'	বৈধ/পবিত্র
গওর	আরবি 'গওর'	গভীর চিন্তা
সুন্নত	আরবি 'সুন্নাত'	হাদিসোক্ত কর্ম
মাহের	আরবি 'মাহির'	দক্ষ
সাহাবা	আরবি 'সাহাবি'	অনুচর, অনুগত
মুরাব্বি	আরবি 'মুরাব্বি'	অভিভাবক
মোকাম	আরবি 'মক্কাব'	গৃহ
সালাম	আরবি 'সালাম'	অভিবাদন, আশীর্বাদ

বাদা	আরবি 'বাদিয়াহ'	জলাভূমি
কেতাব	আরবি 'কিতাব'	পুস্তক, পুঁথি
আওয়াল	আরবি 'আওতাল'	প্রথম
মজলিস	আরবি 'মজলিস'	আসর, বৈঠক
মুনশি	আরবি 'মুনশি'	কেরাণি
মান্নত	আরবি 'মান্নত'	মনোবাসনা বা বিপদ থেকে মুক্তির জন্য সংকল্প
ইজাব	আরবি 'ইজাব'	ক্ববুল ও মঞ্জুরকরণ
জহুরা	আরবি 'যহুরাহ'	অলৌকিক শক্তি
মক্কা	আরবি 'মক্কাহ'	আরবদের অন্যতম প্রধান নগর
আজান	আরবি 'আজান'	ঘোষণা
মহব্বত	আরবি 'মহব্বত'	ভালোবাসা
রওজা	আরবি 'রওয়াহ'	সমাধি
খেলাফত	আরবি 'খিলাফত'	খলিফার পদ বা মর্যাদা
তওহিদ	আরবি 'তাওহিদ'	একেশ্বরবাদ
কুওত	আরবি 'কুওত'	শক্তি
মছলত	আরবি 'মুসলেহাত'	প্রকৃত অর্থ
খয়রাত	আরবি 'খয়রাত'	ভিক্ষা, দান
ছওয়াব	আরবি 'সাওয়াব'	পুণ্য, মঙ্গল
কুদরত	আরবি 'ক্বুদরত'	ক্ষমতা
জওয়াব	আরবি 'জওয়াব'	কৈফিয়ত
ফকির	আরবি 'ফকির'	দরিদ্র
এলাহি	আরবি 'ইলাহি'	আল্লাহ, প্রভু
আরজ	আরবি 'আরয'	প্রার্থনা
মওত	আরবি 'মওত'	মৃত্যু
রওজা	আরবি 'রওয়াহ'	সমাধি
হুর	আরবি 'হুর'	স্বর্গের অঙ্গরী
আওলাদ	আরবি 'ওয়ালাদুন'	সন্তান-সন্ততি
শরাব	আরবি 'শরাব'	মদ
উম্মত	আরবি 'উম্মত'	অনুচর, শিষ্য
গোছল	আরবি 'গুসল'	স্নান
হয়াত	আরবি 'হয়াত'	পরমায়ু
তহুরা	আরবি 'তহুরাহ'	পবিত্র

মছলত	আরবি 'মুসলেহাত'	তাৎপর্য
জানাজা	আরবি 'জানাযাহ'	মুসলমানদের মৃতদেহের কবরস্থ করার পূর্বে যে নামাজ পড়া হয়
দোররা	আরবি 'দুররাহ'	চাবুক
জহমত	আরবি 'জহমত'	দুঃখ
ফানা	আরবি 'ফানা'	ধ্বংস
তছবি	আরবি 'তসবিহ'	মুসলমানদের ব্যবহৃত আল্লাহর নাম জিকিরের জপমালা
তওবা	আরবি 'তাওবাহ'	খেদ
তদবির	আরবি 'তদবির'	ব্যবস্থা
মোলাকাত	আরবি 'মুলাকাত'	সাক্ষাৎ
রব	আরবি 'রব'	প্রভু, পালনকর্তা
খেতাব	আরবি 'খিত্বাব'	সরকার বা রাজা প্রদত্ত উপাধি
কাজি	আরবি 'কাজী'	মুসলমান বিচারপতি
আরশ	আরবি 'আরশ'	উচ্চতম স্বর্গীয় অবস্থান
মোক্তার	আরবি 'মখতার'	মোকাদ্দমা চালানোর জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি
জোহরা	আরবি 'জুহরাহ'	উজ্জ্বল, দীপ্তিমান
একিন	আরবি 'ইয়াক্বিন'	সুদৃঢ় প্রতীতি, অবিচল বিশ্বাস
হাসর	আরবি 'হাশর'	আল্লাহর শেষ বিচারের দিন
কলেমা	আরবি 'কালিমাহ'	ইসলামে বিশ্বাসমূলক স্বীকারোক্তি
হাদিছ	আরবি 'হাদিস'	হজরত মুহাম্মদ (সঃ) অনুমোদিত কার্যাবলি
কাজা	আরবি 'কাজা'	কোন কারণে নির্ধারিত সময়ে নামাজ-রোজা আদায় করতে না পারা
জিয়ারত	আরবি 'জিয়ারত'	মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা

সূত্র: মোহাম্মদ হারুন রশিদ (সংকলন ও সম্পাদনা), 'বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান', ঢাকা, বাংলা একাডেমি প্রেস, ২০১৮।

## ফারসি শব্দের প্রয়োগ

কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ	উৎস	বাংলা অর্থ
বান্দা	ফারসি 'বন্দাহ'	গোলাম, দাস
বাহার	ফারসি 'বাহার'	সৌন্দর্য
মরদ	ফারসি 'মরদ'	পুরুষ
বেহেস্ত	ফারসি 'বিহিশত'	স্বর্গ
দেওয়ান	ফারসি 'দিওয়ান'	খাজনা আদায়ের জন্য নিযুক্ত সর্বপ্রধান কর্মচারী
নাজাত	ফারসি 'নজাত'	মুক্তি, নিষ্কৃতি
শাওহর	ফারসি 'শাওহর'	স্বামী/ পতি
বেজার	ফারসি 'বেজার'	বিরক্ত, রুগ্ন
নেক	ফারসি 'নেক'	পুণ্য, মঙ্গল
তামাম	ফারসি 'তামাম'	সমগ্র
খানা	ফারসি 'খানহ'	গৃহ, ভবন
সিয়া	ফারসি 'সিয়াহ'	কৃষ্ণবর্ণ
মেহেরবান	ফারসি 'মিহরবান'	দয়ালু
ফরমান	ফারসি 'ফরমান'	হুকুম
হামেসা	ফারসি 'হামিশাহ'	সবসময়
আন্দেশা	ফারসি 'আনদিশেহ'	ভয়
আজার	ফারসি 'আজার'	দুঃখ
পয়গম্বর	ফারসি 'পয়গাম্বর'	বাণী বা বার্তাবাহক
সেতাবি	ফারসি 'সিতাব'	অবিলম্বে
মরদানা	ফারসি 'মরদানাহ'	পুরুষোচিত
রওয়ানা	ফারসি 'রওয়ানহ'	যাত্রাকরা
পেরেশানি	ফারসি 'পেরেশান'	উদ্বিগ্ন
রওশন	ফারসি 'রওশন'	উজ্জ্বল
খাওন্দ	ফারসি 'খাওয়ান্দ'	প্রভু
বদ	ফারসি 'বদ'	খারাপ
পরওয়ার	ফারসি 'পরওয়ার'	পালনকর্তা
দরিয়া	ফারসি 'দরয়া'	সমুদ্র
পয়দা	ফারসি 'পয়দা'	সৃষ্ট

নওকর	ফারসি 'নওকর'	চাকর
ফরিয়াদ	ফারসি 'ফরইয়াদ'	নালিশ
দোজখ	ফারসি 'দোযখ'	নরক
সরওয়ার	ফারসি 'সরওয়ার'	নেতা
দরবেশ	ফারসি 'দরবেশ'	সংসারত্যাগী মুসলমান ফকির
জমিন	ফারসি 'যমিন'	ভূমি
বিমার	ফারসি 'বিমার'	রোগ
নেকবত্ত	ফারসি 'নেকবখত'	সৌভাগ্যবান
বেশুমার	ফারসি 'বেশুমার'	অগণ্য
লঙ্গর	ফারসি 'লংগর'	নৌকা বাঁধার শিকল
সুরমা	ফারসি 'সুরমাহ'	চোখে দেওয়ার গুড়োবিশেষ প্রসাধন
শরম	ফারসি 'শরম'	লজ্জা
জেওর	ফারসি 'জেওয়ার'	অলংকার
খুবি	ফারসি 'খুবি'	সৌন্দর্য
খায়েশ	ফারসি 'খাওয়াহিশ'	তীব্র ইচ্ছা
গোর	ফারসি 'গোর'	সমাধি
দরগা	ফারসি 'দরগাহ'	পীর/দরবেশের কবর
গাওয়া	ফারসি 'গাওয়াহ'	সাক্ষ্য
জোরওয়ার	ফারসি 'জোরওয়ার'	শক্তিশালী
বিয়াবান	ফারসি 'বিয়াবান'	শূন্য ময়দান
মেওয়া	ফারসি 'মিওয়াহ'	বেদানা
দরুদ	ফারসি 'দরুদ'	আল্লাহর নিকট প্রার্থনা
জায়গির	ফারসি 'জাইগির'	বেতনের পরিবর্তে প্রদত্ত ভূসম্পত্তির অধিকার
জলদি	ফারসি 'জলদি'	শীঘ্র
জঙ্গ	ফারসি 'জঙ্গ'	যুদ্ধ
বেওয়া	ফারসি 'বেওয়াহ'	বিধবা
তালাব	ফারসি 'তালাব'	পুকুর
জাহান	ফারসি 'জাহান'	জগত
আছমান	ফারসি 'আসমান'	আকাশ
চিকন	ফারসি 'চিকিন'	কাপড়ের ওপর সুতোর সূচিকর্ম
খোদা	ফারসি 'খুদা'	আল্লাহ
নাপাক	ফারসি 'নাপাক'	অপবিত্র

ফেরেস্তা	ফারসি 'ফিরশতাহ'	আল্লাহর আজ্জাবহ সত্তা
পরওয়ানা	ফারসি 'পরওয়ানাহ'	আদেশ
আফতাব	ফারসি 'আফতাব'	সূর্য
মাহতাব	ফারসি 'মাহতাব'	চন্দ্র
রাহা	ফারসি 'রাহা'	ব্যবস্থা
মখলুক	ফারসি 'মখলুক'	সৃষ্টজগত
নজ্জুম	ফারসি 'নজ্জুমি'	গণক
আফত	ফারসি 'আফত'	বিপদ
বাদশা	ফারসি 'বাদশাহ'	মহারাজ
হপ্তা	ফারসি 'হফতাহ'	সাতদিন
হররোজ	ফারসি 'হররোয'	প্রতিদিন
আঞ্জাম	ফারসি 'আনজাম'	পরিণতি
জেয়াদা	ফারসি 'জিয়াদাহ'	প্রচুর
ছয়লাব	ফারসি 'সয়লাব'	প্লাবিত

সূত্র: মোহাম্মদ হারুন রশিদ (সংকলন ও সম্পাদনা), 'বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান', ঢাকা, বাংলা একাডেমি প্রেস, ২০১৮।

### উর্দু-হিন্দি-সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ

কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ	উৎস	বাংলা অর্থ
বাহার	উর্দু 'বহার'	প্রবাহ
খানা	উর্দু 'খানা'	খাবার
ছাতি	উর্দু 'ছাতি'	বক্ষঃস্থল
ওয়ান্তে	উর্দু 'ওয়ান্তে'	উদ্দেশ্যে
আচানক	উর্দু 'আচানক' হিন্দি 'আচানক'	অপরিচিত, আজগবী
মদদ	উর্দু 'মাদাদ'	সাহায্যকারী
বহুত	উর্দু 'বহুত'	অনেক/অজস্র
গেছ	সংস্কৃত 'গোধুম'	গম

সূত্র: মোহাম্মদ হারুন রশিদ (সংকলন ও সম্পাদনা), 'বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান', ঢাকা, বাংলা একাডেমি প্রেস, ২০১৮।

### সাহিত্যে হিন্দি শব্দের প্রয়োগ:

১. মেরা ভি পয়গাম লিয়া যাহ না আপনি [গরীবুল্লাহ রচিত জঙ্গনামা, পৃ.১৪৫]
২. আঁখি ঠারে কেয়ছা বাত কহরে কমজাত [গরীবুল্লাহ রচিত জঙ্গনামা, পৃ.১৪৬]
৩. মেরা ভি কপাল গুনে নাহিক দেল বন্দ।। যাহা থাকে নছিবে আল্লার ইয়াদে থাকি  
[ছহী রঙ্গ-বাহার, পৃ.১১]
৪. কেয়া তেরা হুসনুকা খুবিসে, দেল মেরা মামুর হুয়া।।  
এস্কেকা খাঞ্জারমে মুজকো, আবতো চুর চুর কিয়া।  
কলেজা হুয়া টুকরা, কিচ্ছছে কাহ এ মাজেরা জেছম তো পারা পারা,  
[বড় নিজাম পাগলার কেছা, পৃ.৪৪]

এছাড়া জানা যায় বেশকিছু তুর্কি শব্দও মুসলমান সাহিত্যিকরা তাঁদের কাব্যরচনায় ব্যবহার করেছেন যেমন- খাতুন, বিবি, বেগম ইত্যাদি।

### উদাহরণ:

১. এতেক বলিয়া বিবি খানা নেকালিল।। খছমের ছমনেতে হাজির করিল। [ছহি নেক বিবির কেছা, পৃ.৪]
২. দুছরা বেগম এক আছিল বাদসার। খোদার ফজলে বিবি ছিল বারদার।। [ছহী গুলে বকাওলী, পৃ.৩]
৩. তাজল মুল্লকের ছবি বাহির করিয়া জমিলা খাতুনের হাতে পট তুলে দিয়া। কহিতে লাগিল তবে বয়ান করিয়া সরকস্থানের সাহা জাদার তছবির জানিবে। [ছহী গুলে বকাওলী, পৃ.৭৬]
৪. ফাতেমা খাতুন তাহা দেখিল নজরে। দেখিয়া ফাতেমা বিবি হইল খোশাল।। আমা হতে এই বিবি হয় নেক আমাল। [ছহি নেক বিবির কেছা, পৃ.৪]

## ঘ. উপসর্গ ব্যবহার

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বিভিন্ন কাব্যে উপসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। ফারসি উপসর্গ হিসেবে 'বে' 'গড়', 'ব' এবং 'না' ইত্যাদি পাওয়া যায়। এখানে 'বে'- 'না' অর্থে বা নিন্দনীয় অর্থে এই কাব্যগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এই রকম ফারসি 'বে' উপসর্গযুক্ত বেশ কিছু শব্দের তালিকা নিচে দেওয়া হল-

ফারসি 'বে' উপসর্গযুক্ত শব্দ	বেজার, বেআদব, বেগর, বেগুমার, বেশক, বেওফা, বেহেস্ত, বেওয়া, বে-দীন, বেহেশত, বে-ইনসাফ, বে-ঈমান, বেসরম, বে-সোমার, বেহুশ, বেধড়ক, বেওজর, বেছর, বেসর, বে-কছুর, বেহদতার, বেখুদি, বে-আজল, বে-ছামানা, বে-শির
-----------------------------	--

### উদাহরণ:

১. বেসরম হইয়া কহি শুন সর্বজনা। ইউছুফের দোষ নাহি আমি গোনাগার।। [ইউছুফ জোলেখা বা মোহাব্বাত নামা, পৃ.৬২]
২. কারে বদ কারে বেঈমান। কারে অন্ধকারে সঙ্গত কারে বহরা কান।। কাতরা ভর পানিতে অজুদ করে জন্ম। [ছহী রঙ্গ-বাহার শাহে আলম ও মাহে আলমের কেছা, পৃ.৯]
৩. বেগর মেহনতে খোরাক দিলেন আমায়।। আপনি করিম আনে করম করিয়া। এয়ছা লতিফ খানা দিলেন ভেজিয়া।। এত বলি দেও জাত খুসি অতিশয়। তাজলমুলুক গিয়া পৌছিল সেথায়।। [ছহী গুলে বকাওলী, পৃ.২৪]
৪. বেহুস হইয়া বিবী গিরিল তখন। হোসগোস না রহিল জেন মরা লাস।। জান খালি ধড়ে আছে নাক পরে সাস। [বড় নিজাম পাগলার কেছা, পৃ.৫৫]
৫. বোন বিবী শাজঙ্গলি আছিল বেহেস্তে।। হুকুম করিল আল্লা দোহার তরেতে। গোলাল নামের বিবী বেরাহিম ঘরে।। পয়দা হও গিয়া দোহে ছাহার উদরে।। [বোন বিবী জহুরা নামা, পৃ.৫]



৬. বে-কছুরে তারে আমি দিনু বনবাস।। এতদিন গোজারিল না লিনু তল্লাস। বড়া  
গোনা হবে মেরা এই বাত পরে।। [ বোন বিবী জহুরা নামা, পৃ.১০]

৭. শওহর আইলে ঘরে খুলিব দুয়ার।। হুকুম দিলে মোলাকাত করিব তোমার। আপনি  
যে এই বাতে না হবে বেজার।। [ছহী নেক বিবির কেচ্ছা, পৃ.২]

৮. এক মগজ দুই পোস্তু যেমন বাদাম।। বেসোমার মাল মাত্তা তার ওর নাই। কারুনের  
গঞ্জ যত দিয়াছিল সাঁই।। [ছহী রঙ্গ-বাহার বা শাহে আলম ও মাহে আলমের কেচ্ছা,  
পৃ.১০]

৯. জান রাখা সংসারে ফরজ না মানিয়া মেরা বাতে, আইলে আমার হাতে নাহিক  
মরিবে বে-আজলে। শুনিয়া এ বাত বিবি, জানিতে পারিল সবি, দুত্তারেতে যে লেখা  
দেখিল।। [ছহী রঙ্গ-বাহার বা শাহে আলম ও মাহে আলমের কেচ্ছা, পৃ.১২৫]

১০. আগে কার যে কারখানা হয়ে ছিল বে-ছামানা নয় হইয়া হইল আবাদ।। [ছহী রঙ্গ-  
বাহার বা শাহে আলম ও মাহে আলমের কেচ্ছা, পৃ.১৪০]

১১. নহে তোমাদের তরে; ফাসী দিব একেবারে, পরে হাল কিবা হবে জান কিভাবি  
দোহাই দিয়া; ফাসী বন্ধকর গিয়া; কহ তার তামাম বয়ান শুনে দোন চোর বলে; বে-  
ধড়ক দেল খুলে, কহিতে লাগিল সমাচার। [ছহী রঙ্গ-বাহার বা শাহে আলম ও মাহে  
আলমের কেচ্ছা, পৃ.৩৪]

১২. ইমামের তন বিবি বে-শির দেখিয়া। [শাহ গরীবুল্লাহ বিরচিত জঙ্গনামা, পৃ.২৩৮]

### ঙ. ছন্দ প্রয়োগ

বাংলা সাহিত্যে বহুপ্রকারের ছন্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্য প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায়।  
বাংলা কাব্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহিত্যিকরা ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ‘বাক্যস্থিত  
পদগুলিকে যে ভাবে সাজালে বাক্য শ্রুতি-মধুর হয় ও তার মধ্যে একটা কাল-গত ও  
ধ্বনি-গত সুষমা উপলব্ধ হয়, বাক্যে পদ সাজানোর এই পদ্ধতিকে ছন্দ বলা হয়।’<sup>২৯</sup>

আমরা বলতে পারি বাংলায় মোটামুটি সৃষ্টি লগ্নের প্রথম দিকে যে ছন্দরূপ প্রচলিত ছিল বর্তমানে তা বিলুপ্ত। তাই এই ধারণার সূত্রে ছন্দরূপকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি-

১। প্রাচীন ছন্দোবন্ধ (Old metrical structure)

২। নবীন ছন্দোবন্ধ (New metrical structure)

**প্রাচীন ছন্দোবন্ধ:** বাংলা সাহিত্যের গোড়া থেকেই অর্থাৎ চর্যাপদ সাহিত্য রচনার সময় থেকেই মধ্যযুগের সমস্ত রচনা নির্দিষ্ট কয়েকটি রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এই রূপগুলোই পরিচিত হয়ে থেকেছে ‘প্রাচীন ছন্দোবন্ধ’ হিসাবে। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন প্রাচীন ছন্দোবন্ধ মূলত পদবিন্যাসের নিরিখের বিচারেই গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ছন্দোবন্ধকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে- একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী, মিশ্রপদী। এই একপদী ছন্দ আবার দুই ভাগে বিভাজিত হয়েছে-সাধারণ একপদী ও একাবলী। অন্যদিকে দ্বিপদী ছন্দের কয়েকটি ভাগ আছে- সাধারণ দ্বিপদী, পয়ার, মহাপয়ার, পূর্ণ দ্বিপদী। এছাড়া ত্রিপদী ছন্দের দুটি ভাগ যেমন- লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী। এই ছন্দোবন্ধগুলির মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে দ্বিপদীবন্ধ ‘পয়ার’ ও ‘ত্রিপদী’ ছন্দ এছাড়া একাবলী ছন্দও বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত  $৬+৫=১১$  মাত্রার ছন্দরূপকেই ‘একাবলী’ ছন্দ বলা হয়ে থাকে।  $৮+৬=১৪$  মাত্রার ছন্দরূপই হল ‘পয়ার’ এছাড়া দুটি পদযতির দ্বারা তিনটি পদে বিভক্ত ছন্দকে বলা হয় ‘ত্রিপদী’ ছন্দ ( $৮+৮+৬$ ), এই ত্রিপদী ছন্দকে ‘লাছাড়ী’ ছন্দও বলা হয়ে থাকে। পয়ার ছন্দ আদি মধ্য বাংলার প্রধান ছন্দ, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে পয়ার ছন্দ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গোটা মধ্যযুগ জুড়ে পয়ার ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

গবেষণা অভিসন্দর্ভে যে সমস্ত কেছা সাহিত্যের আলোচনা হয়েছে সেখানে পূর্ণ মাত্রায় বার বার চোখে পড়েছে ‘পয়ার’ ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার, এছাড়া ‘ত্রিপদী’ ছন্দের প্রয়োগ মুসলমান সাহিত্যিকদের কাব্যজুড়ে আছে। বেশিরভাগটাই ‘পয়ার’ ও ‘ত্রিপদী’

ছন্দের ব্যবহার তবুও এগুলো ছাড়াও ‘চিতং মিল’, ‘একাবলি’, ‘ছুটকি’, ‘ভঙ্গ ত্রিপদী’, ‘পঞ্চম’, ‘ছক্কা/ছয়পদে মিল’ ইত্যাদি বহুপ্রকার ছন্দের ব্যবহার হয়েছে।

মুসলমান সাহিত্যিকরা নিজেদের রচনায় যে সমস্ত ছন্দ ব্যবহারের নিপুণতা দেখিয়েছেন তা কোন অংশেই কম নয়। কেচ্ছা সাহিত্যে যে সমস্ত ছন্দের ব্যবহার হয়েছে তা উদাহরণের সাহায্যে নিচে বর্ণনা করা হল-

#### পয়ার ছন্দের উদাহরণ:

গলায় মতির হার কি হইল আমার।  
এলাহি আলমিন যারে দয়া মায়া করে।।  
এক দুঃখ না যাইতে আর দুঃখ পরে।  
আল্লার এসারা এই সকলে জানিবে।। [ ছহি নেক বিবির কেচ্ছা, পৃ.১৪]

#### ত্রিপদী ছন্দের উদাহরণ:

খোসালিত হয়ে দুখে, খেদমতে রহেন সুখে, বোন বিবী মায়ের নিকটে।।  
ধোনা হেথা ডিঙ্গা লিয়া, দেশেতে পৌছিল গিয়া লাগাইল আপনার ঘাটে।  
[বোন বিবী জহুরা নামা, পৃ.২৮]

#### একাবলি ছন্দের উদাহরণ:

এইরূপে কত দিন যায়। কিছু খুসি কিছু গমি উজির বাদশায় নামি আপনার দেলকে  
ছমজায়। বাদসা উজির এই হালে। এক দিন জুমেরাতে রোজা রাখেন একসাথে  
মোনাজত করে ছাফ দেলে।। [ছহী রঙ্গ-বাহার বা শাহে আলম ও মাহে আলমের কেচ্ছা,  
পৃ.১১]

#### চিতং মিল ছন্দের উদাহরণ:

এমত বিলাপ করে, ধৈর্য্য ধরাইতে নারে, আবদুল আলীর মায়, পোড়ামুখি কপাল তোর  
মন্দ হয়ে যায়।। [আবদুল আলী গারলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি, পৃ.৭]

#### ছুটকি ছন্দের উদাহরণ:

হাটে বাটে, ঘাটে মাটে, লোক ভরে গেল। চেরাগেতে, যে রূপেতে, কিটেতে ঘিরিল।  
[ছহী রঙ্গ-বাহার বা শাহে আলম ও মাহে আলমের কেচ্ছা, পৃ.১৩]

### ভঙ্গ ত্রিপদী:

মুখে হাসি হৈল; আবচচি কৈল, গোজারিল একসাল। ওঠাবসা করে, হামড়াইয়া ফেরে;  
বড় শোভা বাল্য কাল।। করিয়ে ফিকির। [ছহী রঙ্গ-বাহার বা শাহে আলম ও মাহে  
আলমের কেছা, পৃ.১৪]

### পঞ্চম ছন্দের উদাহরণ:

আসে যদি আমার হুজুর, হব তবে তাহার মজুর। মোলাকাত করে যদি, তার সাথে হবে  
সাদী, এই তার দেলের মঞ্জুর।। [ছহী রঙ্গ-বাহার বা শাহে আলম ও মাহে আলমের  
কেছা, পৃ.৯০]

### ছক্কা ছয়পদে মিল ছন্দের উদাহরণ:

এ সংসারে মানুষ তামাম।। আওরতের স্বামী যার নাই। তবে কিছু শোভা পায় নই  
মুখেনাক নাহি থাকে তবে কেমন শোভা দেখে প্রথম হতে আন্না করে দুই।।

[ছহী রঙ্গ-বাহার বা শাহে আলম ও মাহে আলমের কেছা, পৃ.৯৫]

কাব্যপাঠে যতদূর মনে হয় ইসলামি সাহিত্যে বিদেশি ভাষার যথেষ্ট প্রভাব  
আছে। সাধারণত জানা যায় আরব জাতির ‘আরবি’ ভাষা ছিল প্রয়োজনের ভাষা,  
কাজের ভাষা এবং কথোপকথনের ভাষা। এছাড়া মুসলমান সাহিত্যিকদের কাব্যে  
ফারসি, উর্দু ভাষার প্রভাবও আছে। এই আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি এই ভাষাগুলি  
মূলত অপভ্রংশের মধ্যে দিয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে একটা সময় অতিবাহিত  
হওয়ার পর। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে এই ভাষাগুলির জন্ম। এই প্রসঙ্গে  
ইতিহাসের হাত ধরে আর্য জাতির জনজীবন উঠে আসে। দেখা যাচ্ছে সংস্কৃতির মতোই  
ভাষার ইতিহাসও সুদূরপ্রসারী এবং বিস্তৃত। এখানেই আরও চোখে পড়ার মতো যে  
ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির এক নিবিড় যোগ আছে একথা আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে।  
ভাষার ভিতর দিয়েই তো জাতির ইতিহাস গড়ে ওঠে, পাঠকমহলে ধরা পড়ে তার চিত্র।  
তাই আরও বলতে পারি ভাষা ও সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক, পরস্পর  
সম্পর্কযুক্ত। ভাষা = জাতির ইতিহাস = সংস্কৃতি। কাব্যে ব্যবহৃত বেশ কিছু ভাষা  
ব্যবহারের সূত্র ধরে আমরা ইসলামি জাতির সংস্কৃতিকে বুঝে নেবো।

**দৃষ্টান্ত:** রোজা ও নামাজ করে, হামেসা ওফিজা পড়ে, আরজ করে উঠাইয়া হাত।  
কুদরত কামাল তুমি, কি আর কহিব আমি, কুদরতে করিল এ সংসার।। উপরে আকাশ  
বাকা, চন্দ্র, সূর্য্য তারা রেখা, ঘোর নিশি সব অন্ধকার। ভাবিয়া খোদার নবি, একিদি  
ইমানে বিবি ছাড়িয়া আপন মান, মুখের যে গুয়া পান, ছেড়ে সোয় মাথার বালিস।

[ইউছফ জোলেখা বা মোহাব্বাতনামা, পৃ.২]

মুসী শাহ গরীবুল্লাহ তাঁর কাব্যে এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে ইসলাম জাতির রীতি-  
নীতি এবং তাঁদের ব্যবহারিক জীবনের কথা তুলে এনেছেন, যা ইসলামি সংস্কৃতির  
পরিচয় বহন করে।

### চ. লিঙ্গ বাচক শব্দের ব্যবহার

মুসলমান সাহিত্যিক রচিত কাব্যগুলিতে সাধারণ কথোপকথনের ক্ষেত্রে দেখা যায়  
নারীরা নিজের স্বামীকে বিভিন্নভাবে সম্বোধন করেছে, সেই সম্বোধনের ভাষা কখনও  
স্ত্রী-বাচক শব্দের মতো উচ্চারিত হয়েছে। নিচে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে স্ত্রী-বাচক  
শব্দগুলি তুলে ধরা হল-

#### উদাহরণ:

১. এনে মোরে ভুলইয়ে হয় প্রাণ প্রিয়া  
রেখে গেলে জঙ্গলেতে বনবাস দিয়া  
এই কি হে প্রাণনাথ ছিল তব মনে।

[বোন বিবী জহুরা নামা, পৃ.৭]

২. এমত আক্ষেপ মনে, কান্দে সদা নিবারণে মুখে সদা করে হয় হয়।।  
কোথা রৈল প্রাণপিয়া, অভাগিরে পাসরিয়া, মন দুঃখে বারমাসী গায়।।

[আবদুল আলী গারলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি, পৃ.১১]

৩. শুনে উজিরের বেটি বড় হৈল ছট ফটী, ইয়াদ করে যৌবনের জোস।  
কহে হয় কি হৈল, প্রিয়া মেরা কি করিল, কি বুঝিয়া করিল এই কাম।  
ফজর যখন হবে, প্রিয়া মেরা ফাসি যাবে, মুলুকেতে হোইবে বদনাম।।

[ছহী রঙ্গ-বাহার বা শাহে আলম ও মাহে আলমের কেচ্ছা, আবদুল মজিদ ভুইঞা,  
পৃ.৩২]

প্রত্যেক স্ত্রী নিজের প্রাণপুরুষকে ‘প্রাণপিয়া’ বলেছেন, স্ত্রী-বাচক শব্দের ব্যবহার হয়েছে পুরুষের ক্ষেত্রে।

## ছ. বানান রীতি

### (ইসলামি সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য)

মুসলমান সাহিত্যিকরা প্রতিটি কাব্যের আলোচনায় বানান রীতিতে এক ধরনের বৈপরীত্য ঘটিয়েছেন। বলা যেতে পারে শুধুমাত্র মুসলমান নয় প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুথিতে বাংলা ভাষা যখন লিপিবদ্ধ হতে শুরু হয় তখনই বাংলা বানানে নানারকম বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। ফলে বাংলা বানান ব্যবহারের ভিন্নতা এই পর্বেই উঠে আসে। মধ্যযুগের সাহিত্যিকদের কাব্যে আমরা দেখি মুখের উচ্চারণের সঙ্গে বানানের কোনোরকম মিল নেই, ফলে বানানের বৈচিত্র্য এসেছে। বাংলা বানান নিয়ে অনেকে মনে করেন যেমনভাবে বানানের ব্যবহার হয়ে চলেছে সেভাবেই বজায় থাকলে বোধহয় ভালো কিন্তু অনেকেই আবার মনে করেন মুখের উচ্চারণ অনুসারে বানান হবে। কারও মতে আবার তৎসম শব্দকে ঠিক রেখে বাকি বানানের ক্ষেত্রে উচ্চারণ অনুসরণ করতে হবে।<sup>১০</sup> মুসলমান সাহিত্যিকদের এই বানান বিষয়ক সমস্যা নিয়ে মুহাম্মদ মর্তুজা বলেন, মুসলমানদের ব্যবহৃত অনেক শব্দের অপপ্রয়োগের পরিবর্তে বিকৃতি ঘটেছে বেশি মাত্রায়। বাংলা বানানের এই রকম উচ্চারণের সঙ্গে ব্যবহৃত বানানের পার্থক্যের কারণ হিসাবে আমরা অনেক কথা জানতে পারি। প্রথমত, বানানের ক্ষেত্রে সমতাবিধানের সমস্যার উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয়ত, লিপিকরদের নিজেদের ইচ্ছেমতো বানান ব্যবহার। এই সময় লেখার ক্ষেত্রে অতটাও মান্যরূপের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রয়োজন মনে করেননি এক শ্রেণির মুসলমানগোষ্ঠী। ফলে তাঁদের রচিত কাব্যে বানানের এই রকম প্রভাব লক্ষণীয়।

তবে উনিশ শতকের প্রথম দিকে আধুনিক বাংলা গদ্য ভাষা ও সাহিত্য যখন গড়ে ওঠার মুখে সেই সময়ে লেখায় ও মুদ্রণে বাংলা ভাষায় মান্যরূপ দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠে আসে। আমরা সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান সাহিত্যিকদের

রচনাকর্মের দিকে তাকালে বানানের এই হেরফের লক্ষ্য করি। যোগেশবাবু বর্ণাবলী সম্বন্ধে যে সমস্ত সংস্কার শুরু করেছিলেন তার মধ্যে বর্ণসংস্কারের ক্ষেত্রে তিনটি পন্থা অবলম্বন করার কথা বলেন- বর্ণসংখ্যার নূন্যতাসাধন, কতকগুলি বর্ণের রূপান্তরবিধান এবং নতুন বর্ণের প্রচলন।<sup>১১</sup> মুসলমান সাহিত্যিকরা তাঁদের কাব্যের আলোচনায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ঘটান এবং এই শব্দগুলি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার ক্ষেত্রে বানানের বিকৃত উচ্চারণ সহযোগে লিখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মোহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর ‘বাঙ্গলা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা’ প্রবন্ধে যোগেশবাবুর মন্তব্যকে তুলে ধরেন- যোগেশবাবুর মতে আরবি, পারসি প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষার অক্ষরান্তরকরণে শ(Sh) কার উচ্চারণস্থানে ষ লেখা উচিত।<sup>১২</sup> গবেষণা অভিসন্দর্ভে এই একই চিত্র বানান ব্যবহারে উঠে আসে, সেই জায়গা থেকেই বানানের এই রকম ব্যবহারগুলি কোথায় কিভাবে হয়েছে তা আমরা দেখে নেব। বানানের এইরকম বৈপরীত্য ব্যবহারের নিয়মকে ভাষাবিজ্ঞানের কথায় অনেকেই ‘বানানে বর্ণগত বিচ্যুতি’ এই নামে অভিহিত করেছেন। গবেষণায় নির্বাচিত কাব্যগুলিতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এইসব বানান ব্যবহৃত হয়েছে কাব্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে। কিছু নিয়মের প্রভাব এখানে রয়েছে। উদাহরণ সহযোগে আমরা তা বিশ্লেষণ করব।

### নিয়ম-১

- কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ‘য’ এর ব্যবহার ‘জ’ এর মতো হয়েছে। আসলে ‘য’ এর পরিবর্তে ‘জ’ ব্যবহৃত হয়েছে বানান লিখনে।

কাব্যে ব্যবহৃত বানান	শুদ্ধ বানান
জোগ্য	যোগ্য
জবন	যবন
জাব	যাব
জার	যার
জত্নের	যত্নের
জখন	যখন
জুবতী	যুবতী

জবে	যবে
জাই	যাই
জুক্তি	যুক্তি
জমালয়	যমালয়
জৌবন	যৌবন
জোগিনী	যোগিনী
জাচিয়া	যাচিয়া
জুবা	যুবা
জাইতে	যাইতে

### উদাহরণ:

১. সৃজিয়া সকল জীব আহার জোগায়।। দুঃখ সুখ মৃত্যু রোগ তাহার অঞ্জায়। মৃতিকা গগণে নাহি তার সমতুল।। পুজিবার জোগ্য সেই সকলের মূল।
২. বলিরাজা দর্প করে কহিলেন জবনেরে, রাজ কর না দিব কখন।।
৩. এদিগ সেদিগ কিছু দেখিতে না পায়।। বিপাকে পড়িয়া জুবা করে হয় হয়।
৪. জবনের তুল্য আর নাহি আছে জাতি।। জাহাকে করেন মান্য গঙ্গা ভাগিরথী।
৫. ফেরেস্তা সিয়রে বসি, চাম্পাকে কহেন হাসি, দুঃখ তব জাইবে এখন।
৬. ভরা কুম্ভ কক্ষে জাচ্ছে সধবা রমনী। এক বর্ণ গাভি বৎস দেখে চেয়ে আর।।

### নিয়ম-২

- অনেক জায়গায় ‘ন’ এর ব্যবহার করা হয়েছে ‘ণ’ এর পরিবর্তে, অর্থাৎ বর্ণগত বিচ্যুতি ঘটেছে।

কাব্যে ব্যবহৃত বানান	শুদ্ধ বানান
করণা	করণ
পরান	পরাণ
লাবন্য	লাবণ্য
চরন	চরণ



প্রনাম	প্রণাম
কতক্ষন	কতক্ষণ
প্রান	প্রাণ
পন	পণ

### উদাহরণ:

১. অমনি পড়িয়া বাঘ কালুর চরনে।। লুটিয়া লুটিয়া ভূমে কান্দে জনে জনে।
২. বসন বান্ধিয়া গলে তবে চাম্পাবতী।। পতিকে প্রনাম করি চলিলেন সতী।
৩. বসিছেন দুই ভাই কদম্বের তলে।। সেই পারে চাইতেই প্রান গেল চলে।
৪. করণা করিল প্রভু গাজির উপরে।। অগ্নিকে নিষেধ দিল তাহাকে পুড়িবারে।

### নিয়ম-৩

- ‘স’ ব্যবহার লক্ষ করার মতো, যেসব প্রচলিত বানানে ‘শ’ ব্যবহৃত হয় তার পরিবর্তে ‘স’ এর ব্যবহার হয়েছে। এছাড়া ‘স’ এর পরিবর্তে ‘শ’ ব্যবহৃত হয়েছে অনেকক্ষেত্রে।

কাব্যে ব্যবহৃত বানান	শুদ্ধ বানান
সোভা	শোভা
আকাসের	আকাশের
সিকার	শিকার
সোগেতে	শোকেতে
সান্ত	শান্ত
সরম	শরম
সুনিয়া	শুনিয়া
সরীর	শরীর
সুইয়া	শুইয়া
সুভক্ষণ	শুভক্ষণ
আদেস	আদেশ
সজ্যা	শয্যা
শুখ	সুখ

হাশ্য	হাস্য
সহর	শহর
সকতি	শক্তি
রৌসন	রৌশন
সুন্য	শুন্য
সাডি	শাডি
নিসাকালে	নিশাকালে
সাস্ত্রে	শাস্ত্রে

### উদাহরণ:

১. কি কহিব তার দুংখ, দুনিয়ার যেই শুখ সেই বানি যাইবেক মারা।
২. জলেখা করিল যাত্রা মেছের সহর।। আড়ে দিগে ষোল কোস চলিল লস্কর।
৩. হাশ্য পরিহাশ্য দোন পরাণে পরাণ। ইউছুফ ভজিতে চাহে জেলেখা পলায়।।
৪. অন্তরে চলিল সেই ইউছুকে নিয়া সাত। ইউছুফে রাখিল উজির আপন হুজুরে।।  
জেলেখা সরম পাইয়া রহিল অন্তরে।
৫. হইলেন পাণ্ড বর্ণ নিব্বল সরীর।। হেলিয়া পড়িল কূচ হৈয়া কাল সির।
৬. পালঙ্গ ছারিয়া থাকে সুইয়া ধরায়। এই মতে দশ মাস আসিয়া পরিল।।
৭. সুনিয়া জল্লাদগণ ভাবে হেট সিরে।। বাদসার আজ্ঞা নাই পারে টালিবারে।

### নিয়ম-৪

- বিশেষ কিছু জায়গায় ‘স’ এর পরিবর্তে ‘ছ’ বর্ণের ব্যবহার হয়েছে।

কাব্যে ব্যবহৃত বানান	শুদ্ধ বানান
ছালাম	সালাম
মছজিদ	মসজিদ
ছদ্দি	সর্দি
আছমান	আসমান
ছামনে	সামনে

### উদাহরণ:

১. আকাশের মাঝে চান, সূর্য আর তারাগন, সাজিয়াছে আছমান উপরে।।
২. বাছারে ইয়াকুব নবী দেখেন নজরে। বাপের কদমে গিয়া করেন ছালাম।।
৩. মেরা এক বাত কহ বাদশার ছামনে। মেরা এহি বাত ভাই কহিও বাদসার।।

### নিয়ম-৫

- বেশ কিছু জায়গায় বানানে 'ই' কার 'ঈ' কার হয়েছে এবং কোথাও আবার 'ঈ' কার 'ই'- কার হয়েছে।

কাব্যে ব্যবহৃত বানান	শুদ্ধ বানান
শীব	শিব
পুরি	পুরী
সৃষ্টী	সৃষ্টি
বিপরিত	বিপরীত
অতিত	অতীত
আখেরী	আখেরি
উপনিত	উপনীত
সৃষ্টী	সৃষ্টি
ভগিনি	ভগীনি

### উদাহরণ:

১. সেই দিন রাজা সেই বসিয়া ঘাটেতে।। স্নান করি শীব পূজা আছিল করিতে।
২. আখেরে দুনিয়া পরে, আখেরী রছুল কোরে, ভেজে তারে সহর মক্কায়।।
৩. মিছা মায়া জালে কেন মন বদ্ধ হৈলে।। যে তোরে করিল সৃষ্টী তারে না চিনিলে।

এই নিয়মগুলির বাইরেও আমরা দেখতে পাই কিছু ক্ষেত্রে বর্ণলোপ এর মতো বিষয় ও ঘটেছে, যেমন-

- ছর্দি-সর্দি [এখানে 'স' এর পরিবর্তে 'ছ' এর ব্যবহার হয়েছে, এছাড়া বর্ণলোপ হয়েছে যুক্তব্যঞ্জন (দ) এককব্যঞ্জে (দ) পরিণত হয়েছে।]

- রাজত্ব<রাজত্ব [এখানে যুক্তব্যঞ্জন (ত্র=ত+ত) যুগ্মব্যঞ্জনে (ত্ব=ত+ব) পরিণত হয়েছে।

### উদাহরণ:

১. অধিক না হয় জির্ণ কিছু জদি খায়। ছর্দি কাস তরা স্বাস উঠে উদগার।।
২. তোমা বিনে পুত্র আর না আছে আমার।। এহেন রাজত্ব নাহি কর ছারখার।

মধ্যযুগীয় বানান পদ্ধতিকে মুসলমান সাহিত্যিকরা অনুসরণ করেছেন। বর্ণবিশ্লিষ্ট এর মতো কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়, এই প্রসঙ্গে ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী বলেছেন- “প্রাচীন ভারতীয় আর্যের যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি মধ্যভারতীয় আর্যে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত হত। অর্থাৎ দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি স্বরধ্বনি নিয়ে এসে সহজে উচ্চারণ করার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। বাংলা ভাষায় অশিক্ষিত উচ্চারণে, মেয়েলি কথাবার্তা কিংবা কবিতায় যুক্ত ব্যঞ্জনের বা যুগ্ম ব্যঞ্জনের মাঝখানে স্বরধ্বনি আনা হয়। একেই স্বরভক্তি বলেছেন।”<sup>৩৩</sup> মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় এর প্রভাব লক্ষ্য করার মতো।

**উদাহরণ:** গাজি বলে কালু ভাই, চলিতে সকতি নাই, রব এই কাঠোরিয়া ঘরে।।

সকতি<শক্তি [এখানে বর্ণবিশ্লিষ্ট হয়ে স্বরভক্তি ঘটেছে।]

এছাড়া কাব্যের মধ্যে বেশ কয়েকটি জায়গায় দেখা যায় ‘ও’ কার ‘উ’ কারে পরিণত হয়েছে এবং ‘ষ’ এর পরিবর্তে ‘স’ হয়েছে।

**উদাহরণ:** কালু বলি নাম তার অজুপা রাখিল। মাতা পিতা কোথা তার নির্ণয় না জানি।।

অজুপার পুস্যপুত্র এই মাত্র শুনি।

পুস্যপুত্র< পোষ্যপুত্র [এখানে ‘ও’ কার হয়েছে ‘উ’ কারের মতো।]

ইসলামি সাহিত্যে যে বানানগুলো সাহিত্যিকরা ব্যবহার করছেন সেই বানানগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁরা আরবি-ফারসি উচ্চারণ রীতিকে তাঁদের ধারণায় রেখে তবেই শব্দগুলোকে ব্যবহার করেছেন। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন

শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী লেখকদের স্তর তৈরি হয়েছে। আমরা অনেকগুলো স্তর পাচ্ছি ফলে সেই স্তর অনুযায়ী দেখব যে এক এক জনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বানানবিধি ব্যবহার হচ্ছে। সেইক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধ্বনির সংযোগ, বিলোপন, রূপান্তর, বিপর্যাস এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো একে ধরে আমরা মান্যচলিত বাংলার সঙ্গে কতটা যে পার্থক্য হচ্ছে সেটাই এখানে আলোচনা করেছি। কাব্যগুলিতে বিচ্যুতি কোথায় হচ্ছে এটা খুঁজে বার করাই গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমরা কাব্যের মধ্যে দেখতে পাই বিভিন্নভাবে বানানের হেরফের হয়েছে। বানানের এই ধরনের বিচ্যুতির অনেক নিয়মের কথা এই অধ্যায়ের আলোচনায় উঠে এসেছে।

মধ্যযুগের এই কাব্যগুলি বেশিরভাগই কোনও না কোনওভাবে গল্পের ছলে রাজসভায় পঠিত হত অথবা লোকমুখে প্রচলিত ছিল, তাঁদের মুখের ভাষা কাব্যে স্থান পেয়েছে। এছাড়া যাঁরা লিপিকর ছিলেন তাঁরা মুখে মুখে যা শুনেছেন সেই ভাবেই পুথি রচনা করেছেন। মুখের উচ্চারণের মতো করেই এই সময়ের কাব্যগুলি লেখা হয়েছে, অভিধান তেমন তৈরি হয়নি। মধ্যযুগের পুথি সাহিত্যে আসলে বানানের কোনও সমতা পাওয়া যায় না তাই কাব্যগুলিতে বানানের এই ধরনের বিচ্যুতি ঘটেছে। এছাড়া মুসলমান সমাজের প্রচলিত ‘এছলামি বাংলা’র ব্যাপক প্রভাব এই সাহিত্যে লক্ষণীয়। পাশাপাশি আঞ্চলিক লৌকিক ভাষা এই সাহিত্যের সম্ভারকে ভরিয়ে তোলে। ফলে মুসলমান সাহিত্যিকরা এই ঘরানাকে ছেড়ে আসতে পারেননি।

## তথ্যসূত্র ও টীকা

১. মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে বেশকিছু সমস্যা দেখা যায় ভাষাকে কেন্দ্র করে। এস, ওয়াজেদ আলি কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন- প্রথমত, মুসলমানরা আরবি, ফারসি, উর্দু, শব্দ ত্যাগ করে হিন্দুদের ব্যবহৃত সংস্কৃত মূলক শব্দ গ্রহণ করবে কিনা? নাকি তাঁদের নিজস্ব শব্দগুলিই বাংলা সাহিত্যে চালাবে। দ্বিতীয়ত, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বলে বাংলায় কিছু ছিল না।

মুসলমানদের কাছে আরবি ছিল Classical Language. আরবি থেকে মুসলমানরা পরিভাষা গ্রহণ করে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে। তৃতীয়ত, বাংলা ভাষায় বর্ণমালার অসম্পূর্ণতার কথা বলা হয়েছে।

সূত্র: আলি. এস, ওয়াজেদ, 'বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা', 'মাসিক মোহাম্মদী', মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৫। পৃ.৪৪৪-৪৪৫

২. দোভাষী সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বলেন এই ভাষায় দুটি নয়, বহুভাষার (বাংলা, হিন্দি, ফারসি, আরবি ও তুর্কি) শব্দ এসে মিলেছে। সুতরাং, বিদেশি শব্দবাহুল্যের অনুসরণে একে মিশ্র ভাষারীতিও বলা হয়ে থাকে।

সূত্র: আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' ঢাকা, চারণলিপি, ২০১২। পৃ.১১৩-১১৪

৩. Abdul Mannan. Kazi Muhammad, 'The Emergence and development of doobhasi literature in Bengal upto 1855 A.D, University of London, Proquest, 1964. P.85

৪. গোস্বামী. মদনমোহন (সংকলন ও সম্পাদনা), 'ভারতচন্দ্র', কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৬। পৃ.৮৮

৫. আলী. সৈয়দ এমদাদ, 'বাংলাভাষা ও মুসলমান', 'মাসিক মোহাম্মদী', মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৪। পৃ.৩২৯

৬. আলি. এস. ওয়াজেদ, 'বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা', 'মাসিক মোহাম্মদী', মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৫। পৃ.৪৪৪

৭. থাপার. রোমিলা, 'আর্য ধারণার ইতিহাস ভাবনা', 'ভারতবর্ষঃ ঐতিহাসিক সূচনা ও আর্য ধারণা', আবীরা বসু চক্রবর্তী (অনুবাদ), নয়াদিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৭। পৃ.২৫

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়. সুমন্ত, 'বটতলার দোভাষী সাহিত্য সেকাল ও একাল', 'বাঙালির বটতলা (প্রথম খণ্ড)', অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য (সম্পা.), কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৩। পৃ.১৭০

৯. এই বিষয়ে Afia Dil বলেন- “The Middle Bengali period coincides roughly with the period of the Muslim rule in Bengal, which lasted from 1204 A.D. till its replacement by the British rule in 1764. Muslim rulers in Bengal were first Turks, then Afghans, and later the Mughals, but the language of administration had continued to be persina all throughout. The language of religion of these rulers as well as the growing Muslim population of Bengal was Arabic, and the common everyday language was Bengali, for the Hindus, the Muslims and people of other religions.”

সূত্র: Dil. Afia, ‘Impact of Arabic on Bengali Language and Culture’, Journal of the Asiatic of Bangladesh (Hum), vol.57(1), 2012. P.103

১০. শ. ডঃ রামেশ্বর, ‘সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা’, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৪০৩। পৃ.৪

১১. চক্রবর্তী. উদয়কুমার ও নীলিমা চক্রবর্তী, ‘ভাষাবিজ্ঞান’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৫। পৃ.২৫৯

১২. সরকার. পবিত্র, ‘ভাষা, দেশ, কাল’, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০১৫। পৃ.১৫৫

১৩. হুমায়ুন. রাজীব, ‘সমাজভাষাবিজ্ঞান’, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১৬। পৃ.১২

১৪. আলী চৌধুরী. মোহাম্মদ এয়াকুব, ‘বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য’, ‘কোহিনুর’, নবপরিচয়, মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ফরিদপুর, পাংশা, মাঘ ১৩২২। পৃ.৩৪১

১৫. শ. ডঃ রামেশ্বর, ‘সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা’, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৪০৩। পৃ.৪

১৬. ভাষাবিজ্ঞানীদের কথায় জানতে পারি- ‘by which the members of a social group co-operate and interact.’

সূত্র: তদেব। পৃ.১৪

১৭. রহমান. শেখ হবিবর, ‘জাতীয় সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান’, ‘আল্-এসলাম’, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৩। পৃ.৪০

১৮. ঘোষাল. চণ্ডিকাপ্রসাদ, ‘বটতলার ‘গুপ্তকথা’: কেছার ভাঁড়ার না অন্ত:পুরের আরশি’, ‘বাঙালির বটতলা (প্রথম খণ্ড)’, অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য (সম্পা.), কলকাতা, অনুষ্ঠপ, ২০১৩। পৃ.৪২

১৯. চক্রবর্তী. বরুণকুমার, ‘গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য’, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৩। পৃ.১৪২

২০. প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় (Pranab Bandyopadhyay) এ বিষয়ে জানান- “the enlightened Muslims gradually came closer to the Hindus, being attracted with their aesthetic consciousness, and beautiful sense of art, painting, music, literature etc. Of all, the art and music of the Hindus captured their hearts most. The Muslim kings and nobles Patronized the music of the Hindus. Sultan Hussain Sharqui of Jaunpur is said to have invented a new music style called ‘Khayal’ which became very popular among the Hindus and the Muslims. The pure Hindu music ‘Dhrupad’ was much appreciated by the Muslims of refined taste.”

সূত্র: Bandyopadhyay. Pranab, ‘Indian Culture And Heritage’, Calcutta, Book club, 1991. P.75

২১. আনিসুজ্জামান, ‘মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য’ ঢাকা, চারুলিপি, ২০১২। পৃ.২৯

২২. সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী বলেন- “Musalmani Bengali a considerable literature consisting of adoptions of Muslim and Persian stories and eomances and religious works and tracts has grown up... ‘The Musalmani Bengali’ employed in these works, however, is often too much persianized; but the metres are Bengali, and a large percentage of Sanskrit words are retained, cheek by jowl, with the perso-Arabic importations....It is the Maulavi’s reply to the pandit’s sadhubhasa of the early and middle part of the 19 th century. The percentage of Persian words [he meant perso-Arabic words] in a typical ‘Musalmani Bengali’ work.... Is about 31.74...Books in ‘Musalmani Bengali’ begin from the right side, following the way of an Arabic or Persian book, although the alphabet is Bengali.”

সূত্র: Chatterjee. Suniti Kumar, ‘The Origin and Development of the Bengali Language’, Calcutta, Rupa & Co. 1975. P.210-11



২৩. মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন. আবুল কাসিম, 'পুথি সাহিত্যের ইতিহাস' ঢাকা, পুরানা পল্টন, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ১৯৬৯। পৃ.৩
২৪. হক. কাজী রফিকুল (সংকলন ও সম্পাদনা), 'বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কি হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৭। পৃ.নয়
২৫. চক্রবর্তী. উদয়কুমার ও নীলিমা চক্রবর্তী, 'ভাষাবিজ্ঞান', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫। পৃ.৪০
২৬. Ali. Ashraf, 'Muslim Traditions In Bengali Literature', Karachi University, Bengali Literary Society, 1960. P.20
২৭. Dil. Afia, 'Impact of Arabic on Bengali Language And Culture', Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum), Vol. 57(1), 2012. P.114
২৮. "The use of Arabic and Persian words, phrases and images acquired a new significance and colour during the 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> centuries. These were the days of Muslim downfall. Muslim kingdom gradually passed away from their hands into the hands of foreigners. Muslim cusatoms, manners and ettiquetters were gradually losing the aristocratic halo which used to surround them during Muslim rule. Muslims were becoming poorer day by day and their Hindu managers. English was gradually being introduced at the cost of Persian and Arabic and the Hindu pundits wewre beginning to take revenge on the Muslims by trying to eliminate all Arabic and Persian words from the Bengali language."
- সূত্র: Ali. Ashraf, 'Muslim Traditions In Bengali Literature', Karachi University, Bengali Literary Society, 1960. P.12
২৯. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', নতুন দিল্লী, রূপা পাব্লিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড, আগস্ট ২০১৬। পৃ.৩৭৫
৩০. চক্রবর্তী. উদয়কুমার ও নীলিমা চক্রবর্তী, 'ভাষাবিজ্ঞান', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৫। পৃ.২৭৪
৩১. ঘোষ. শ্রীসতীশচন্দ্র, 'বাঙ্গালা শব্দ তথা বানান ও লিখন', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (সম্পা.), উনবিংশভাগ, ২য় সংখ্যা, কলকাতা, সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩২০। পৃ.৮৬

৩২. মোহম্মদ. শহীদুল্লাহ, 'বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (সম্পা.), ১ম সংখ্যা, কলকাতা, সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩২৫।পৃ.২

৩৩. চক্রবর্তী. উদয়কুমার ও নীলিমা চক্রবর্তী, 'ভাষাবিজ্ঞান', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৫। পৃ.১৫৮

## উপসংহার

বাংলা সাহিত্যের যে গতানুগতিক ধারা দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল, সেই বহমানতাকে স্বীকার করে মধ্যযুগের সময়পর্বে এসে বিশেষকরে মুসলমান সাহিত্যিকরা যখন কলম ধরেছেন তখন বাংলা সাহিত্যে এক অন্যমাত্রা উঠে এসেছে। সাহিত্যের গতি ঠিক তার পথ খোঁজে, তেমনই ভারতবর্ষ তথা বাংলায় মুসলমান শক্তির অভ্যুত্থান গোটা বঙ্গদেশের চালচিত্রকে পাল্টে দেয়, জনমানসে দোলা দেয় সংস্কৃতি ও ভাষার নতুন নতুন সম্ভার। গোটা মুসলমান জনজাতির জীবনধারার সঙ্গে পাশাপাশি চলতে থাকে অন্যান্য জাতির টিকে থাকার লড়াই। ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ যতটা কার্যকর তার চেয়েও বেশি মনকর্ষক সাহিত্য আলোচনার বিষয়টি। আসলে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির বিষয়ের কথা মনে রেখেই আমাদের আলোচনা। আমরা মূলত এই গবেষণায় মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যকর্ম এবং তাঁদের রচিত সাহিত্যের ভাষা ও সংস্কৃতির দিকগুলি আলোচনা করেছি। আসলে সাহিত্যিকদের কাজই হল তাঁদের মনোজগতে রঙ চড়িয়ে নতুন নতুন বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা, যেখানে শুধুমাত্র অনুবাদ-অনুকরণ নয়, নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা বেশ খানিকটা টিকে থাকে। মধ্যযুগে মুসলমান সাহিত্যিকরা যে সময় থেকে রচনাকর্মে নিয়োজিত হতে শুরু করেছেন তখন থেকেই তাঁদের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষের ছবি চিত্রপটে গেঁথে থেকেছে। এই দেশে মুসলমান জনজাতির প্রবেশ এবং প্রতিনিয়ত নিজেদের টিকিয়ে রাখার লড়াই এ যুক্ত থেকেছে তাঁরা। সামাজিকভাবে মুসলমান জাতি নিজেদের আলাদা পরিমণ্ডল তৈরি করলেও আদতেও তাঁরা বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি। পাশাপাশি সহাবস্থানে হিন্দু জন-জীবনের সঙ্গে নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছেন সর্বদাই। যাঁরা সমাজের গোঁড়া হিন্দু বা গোঁড়া মুসলিম তাঁদের কথা বাদই রাখলাম। তবে বেশিরভাগ অঞ্চলের মানুষের উদারনৈতিক সমঝোতা দুই গোষ্ঠীর বা জাতির মানুষকে সাংস্কৃতিকভাবে বন্ধ করেছে। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমরা এই দুই জনজাতির (হিন্দু-মুসলিম) জীবনের রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার, খাদ্যাভাস, বসন-

অংলকার প্রভৃতির পাশাপাশি তাঁদের পারস্পরিক সহযোগিতা বা সহমর্মিতার অবস্থান কতদূর তা লক্ষ করেছি। আসলে ‘সংস্কৃতি’র মধ্য দিয়েই জাতির ইতিহাস নির্মিত হয়। আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে যেমন কিছু সংস্কৃতির ছাপ দেখি পক্ষান্তরে ব্যক্তিমানসেও সংস্কৃতির আলাদা স্বরূপ চিহ্নিত হয়। মুসলমান সাহিত্যিকরা তাঁদের রচিত সাহিত্যকর্মে ইসলাম জাতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির (মুসলিম/ইসলামীয় সংস্কৃতি) কথা যেমন তুলে এনেছেন পাশাপাশি ভারতবর্ষের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বসবাস করে সংস্কৃতির সামগ্রিকতার চিত্রকেও নির্মাণ করেছেন।

সংস্কৃতির বিচারে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-শিখ ইত্যাদি ধর্মকে কেন্দ্র করে যে ভাগ করার প্রথা প্রচলিত আছে তা একটি সংস্কৃতির পূর্ণরূপকে খণ্ডিত রূপে দেখার প্রবণতা। নামকরণের ক্ষেত্রে প্রথানুসারী ধারণাটিকে গবেষণার শিরোনামে ব্যবহার করা হলেও আসলে সংস্কৃতির ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাসে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে তা অনুসন্ধান করে দেখাই এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। যখন হিন্দু, ইসলামি ইত্যাদি সংস্কৃতি বলছি তখন সংস্কৃতির ধারণা খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। একটা অংশের প্রবণতাকে বুঝতে খণ্ডিত করি আমরা। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যুগে যুগে পরিবর্তন হয়েছে। এই ভারতীয় সংস্কৃতির একটি ধারা ইসলামি সংস্কৃতি। মুসলমান বিজয়ের পর ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। ভারতবর্ষ বহু জাতির দেশ, বহু ধর্ম-বর্ণের মানুষের বাস। মুসলমান আক্রমণের আগে গ্রিক, শক, কুষাণ প্রভৃতি যে সমস্ত বিদেশি জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তাঁরা ভারতে দীর্ঘ সময় বসবাস করে গেছেন। প্রত্যেক জাতিই এদেশের লোকজনের সঙ্গে এমনভাবে মিশেছেন ধীরে ধীরে এই শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কৃতিতে লীন হয়ে যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির বড় লক্ষণ ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে বাংলায় সমন্বয়ধর্মিতা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেখা গেছে। এই সমন্বয়ধর্মিতাই একসূত্রে সকল ভারতবাসীকে বেঁধে রেখেছে যুগ যুগ ধরে। বাংলার নিজস্ব যে ধর্মবোধটি জাতিধর্ম-নির্বিশেষে একাকার হয়ে গেছে তা হল মানবধর্ম। এই প্রসঙ্গে ড. তৃপ্তি ব্রহ্ম বলেছেন-

“বস্তুত বাংলাদেশে চৈতন্য তথা বৈষ্ণব চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম এবং ইসলামের জীবনমুখী মানবতাবাদ বাঙলার মানসভুবনে এক উদার ও সমন্বিত জীবন চেতনার জন্ম দেয়। ইসলামের সাম্যের আদর্শ প্রচলিত বর্ণাশ্রম বিভক্ত সমাজকে যেমন নাড়া দেয় তেমনি হিন্দু সংস্কৃতির উন্মুক্ততা ও নমনীয়তা মুসলিম মানসে ভক্তি ও প্রেমের উৎসারণ ঘটাতে সক্ষম হয়। দুইয়ের মিলনেই সৃষ্টি হয় উদার মানবতাবাদের আবহ।” (ওয়াহাব, আবদুল, ‘বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সংগীত’, কলকাতা, রত্নাবলী, ১৯৯৯। পৃ.৯৬)

ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায়, মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি যখন বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তখন রাজধানী দিল্লি ও বাংলার যোগাযোগ ঘটাতে জৌনপুর এগিয়ে আসে। কিন্তু জৌনপুরের অবক্ষয়ের পর দিল্লির কর্তৃত্ব বাংলার উপর প্রবল আকার ধারণ করে। বাংলার রাজধানী গৌড়, রাজমহল, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ এই অঞ্চলগুলির সঙ্গে দিল্লির যোগাযোগ গঙ্গা নদীর জলপথে সুগম হয়। এই সুবিধার জন্য বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের হিন্দি ভাষাভাষী লোকজনের সঙ্গে বাংলার মেলবন্ধন তৈরি হয়। অন্যদিকে আরব দেশের সঙ্গে পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল বহুকালের। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের কথা আমরা বলতে পারি। আরব বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে এক মুসলমান উপনিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পূর্ব বাংলার অঞ্চলগুলির সঙ্গে মুসলিম শাসনের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। চেঙ্গিস খানের মধ্য এশিয়া আক্রমণের পর সেখানকার শিক্ষিত মুসলমানগণ ভারতে এসে আশ্রয় নেয়। মুসলিম অভিযানের ফলে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটেছিল এবং তারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস গড়ে তোলে। এরই মধ্যে সুফিরা ভারতীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে একটা জায়গা দখল করে নেয়। সুফি মতাবলম্বীরা ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে ভারতীয়দের মনে এক বিরাট জায়গা দখল করে নেয়। হিন্দু তান্ত্রিকরা যে সাধনতত্ত্বের কথা বলে মুসলমান সুফিরাও এই একই সাধনায় আস্থা রাখে। ভারতীয় যোগদর্শন এবং সুফিতত্ত্ব মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। ফলে সব মিলিয়ে বাংলায় তথা গোটা

ভারতে এক মিশ্র-ভাবধারার উন্মেষ ঘটেছিল। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী এই সময়ে বাংলা সাহিত্য ও সমাজে বিভিন্ন ধর্মের সম্প্রদায়গত বিভেদ যেমন এসেছে অপরপক্ষে মিলনের চিত্রও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের সমস্ত বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু কবির রচনার মধ্যে একধরনের আত্মীয়তা লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের মুসলমান লেখকদের রচনার ভিতর যে সংস্কৃতির পরিচয় আমরা পেতে চেয়েছি তা বর্হিভারত থেকে আগত সংস্কৃতি এবং ভারতবর্ষের ভিতরে নানা সংস্কৃতির মিলিত রূপ যা মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় বহন করেছে। মধ্যযুগের মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত সাহিত্যগুলি বিশ্লেষণ করে সংস্কৃতির নানাদিক তুলে ধরাই মূল উদ্দেশ্য থেকেছে। ‘বিবিধের মাঝে মিলন মহান’ রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় ভারতবর্ষ সম্পর্কিত যে চিন্তা আমরা পাই সেখানে সর্বত্রই তিনি বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনে এক মিলিত সংস্কৃতির কথা বলেছেন। এই মিলিত সংস্কৃতির মধ্যে নানা যুগে নানা সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁদের নানারকম সংস্কৃতি এবং আচার আচরণ নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন। শক, হুণ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্যের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে গেছে। আর সেই কারণেই বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব যেভাবে পড়ার কথা সেভাবে পড়েনি। সমস্ত সংস্কৃতির মূল সুরটি ভারতবর্ষ নিজের বলে গ্রহণ করেছে এবং ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে তা চিরন্তন সত্যে আবদ্ধ হয়েছে। ভারতবর্ষের যে প্রাণসত্তার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তা তাঁর নানা প্রবন্ধে, কবিতায় এবং ‘গোরা’ উপন্যাসের ভিতর দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর ভারতবর্ষ সম্পর্কিত চিন্তা বিশ্বের মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে একই আত্মীয়তারসূত্রে গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি অনেকেই ভারতবর্ষের সাধনায় বৃন্দ থেকেছেন। অন্যভাবে সংস্কৃতির সংরক্ষণের কথাও ভেবেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মর্মবাণী আমাদের স্মরণে আসে ভারতীয় সমাজের রূপ হবে ইসলাম-দেহ ও বেদান্ত-মস্তিষ্ক, সমস্ত সৃষ্টি-শক্তির প্রকাশ যেখানে অবাধে ঘটবে। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর সংস্কৃতি ভাবনায় জানান বাংলায় বসবাসকারী মুসলমান ও হিন্দু এই দুই জাতি ভারতবর্ষের অংশ ভিন্ন আর কিছু নয় সেইক্ষেত্রে এঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের সার্থকতা এই বিশাল সত্তার সঙ্গে তার গূঢ় যোগ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই আসবে।

মধ্যযুগের ইসলামি সাহিত্যের ভিতরে যে সংস্কৃতির পরিচয় আমরা পেতে চেয়েছি তা বর্হিভারত থেকে আগত সংস্কৃতি এবং ভারতবর্ষের ভিতরে নানা যুগের নানা সংস্কৃতির মিলিতরূপ যা একটি মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। সেখানে কোনটি ভারতীয় এবং ভারতীয় নয় তা নির্ণয় করা দুর্কর হয়ে ওঠে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে মুসলমান সমাজের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির দিকগুলিকে আলোচনা করাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল পরিধির জায়গা। সেই প্রসঙ্গ ধরে মুসলমান সাহিত্যিক রচিত তাঁদের কাব্যে মুসলমান সমাজের নানাবিধ সংস্কৃতির কথা জানতে পারি কিন্তু সেই সংস্কৃতির সবটাই বিচার করা হয়েছে এই ভারতীয় সংস্কৃতিকে সামনে রেখে। তাছাড়া মৌখিক ভাষার অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করার মতো। তাঁদের কথা বলার স্টাইল এবং উচ্চারিত শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি প্রভাব পড়েছে।

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে আমরা মুসলমান সাহিত্যিক রচিত বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির বহুমাত্রিকতাকে যেমন বুঝে নিয়েছি তেমনই ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকটিকেও আলোচনা করেছি। প্রথম অধ্যায়ের কথা বলা যাক, এই অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের ধারায় মুসলমান সাহিত্যিকদের অবস্থান সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি। ঠিক কোন সময় থেকে মুসলমান জনমানসে আলাদা করে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনের তাগিদ দেখা দিল এবং সাহিত্য রচনায় তাঁদের বিভিন্নরকম সমস্যার কথা উঠে এসেছে। মুসলমান সাহিত্যিকরা আরব-পারস্যের সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন একথা যেমন সত্য অন্যদিকে দেশীয় সংস্কৃতির প্রভাবে হিন্দু সাহিত্যিকদের রচনা-পদ্ধতিকেও অনুসরণ করেছেন। মুসলমান সাহিত্যিকরা মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় নিজেদের জায়গা তৈরি করেন। সাহিত্য রচনায় আলাদা ধরনের ঘরানা তৈরির মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবন, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। আমরা এই অধ্যায়ে এমন অনেক রচনাকারের পরিচয় পেয়েছি যাঁরা সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে কাব্য রচনা করেছেন। তবে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি নির্বাচিত সময়ের সাহিত্যগুলিতে মুসলমান লেখকরা নিজেদের সংস্কৃতির কথাকে যেমন

তুলে এনেছেন পাশাপাশি হিন্দু সংস্কৃতির ছাপও স্পষ্ট। গোটা বঙ্গদেশের হিন্দু-মুসলিম উভয়ের নিজস্ব এক ধরনের যে সংস্কৃতি তা মুসলমান সাহিত্যিকরা বহন করেছেন।

পরবর্তী দ্বিতীয় অধ্যায়ে, মুসলমান সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যে কেমন ধরনের সাহিত্য রচনা করেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পেয়েছি। মুসলমান সাহিত্যিকদের কাব্যগুলোকে বেশকিছু সংরূপ ও শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিকরা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের যে প্রেমের আখ্যান নির্মাণ করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বকে তুলে ধরে। নিজেদের ধর্ম-ইতিহাস ও আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেও সাহিত্য রচিত হয়েছে, এই রচনার মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের প্রাণপুরুষ প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ এর জীবন, আদর্শ এবং তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্মের যে মর্মবাণী আমরা তার কথা জানতে পেরেছি। ইমাম হাসান ও হোসেনের জীবনের ঘটনা সমগ্র মুসলিম জগতে স্মরণীয়। মুসলমান সাহিত্যিকরা নিজেদের লেখনীতে এই করুণ কাহিনিকে তুলে এনেছেন। বিভিন্ন সাহিত্যিকরা জঙ্গনামা নাম দিয়ে এই পুরো বিষয়বস্তুকে কাব্যের আকারে জনমানসে এঁকেছেন। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান জনমানসে পীর বা ফকিরদের মধ্য দিয়ে এক সমন্বয়ধর্মিতার সূত্র তৈরি হয়। উভয়সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই পীরের পূজিত হওয়ার ভিতর দিয়ে এক মিলনের ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। এই ভাবনা থেকেই হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকরা একের পর এক সাহিত্য রচনা করেছেন। মুসলমান সাহিত্যিকদের হাতে পীরকেন্দ্রিক সাহিত্য রচিত হয়। এছাড়া বেশকিছু মুসলমান সাহিত্যিক ইসলাম ধর্মের রীতি-নীতি ও হাদিস বিষয়ক সাহিত্যও রচনা করেছেন যা নীতিশাস্ত্রমূলক রচনার আওতাভুক্ত হয়েছে। বাংলা সাহিত্য জগতে ইংরেজি ‘মিস্ট্রি’ রচনার মতো একধরনের রচনার কথা প্রকাশ পেতে থাকে যা ‘গুপ্তকথা’ নামে চিহ্নিত হয়েছে, এক্ষেত্রে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’ (১৮৯৮) এই উপন্যাসটি স্মরণে আসে। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনাকর্ম মূলত বটতলার প্রেস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। মুসলমান সাহিত্যিকরা এই গুপ্তকথাকেও খানিক নিজেদের মতো করে বলার চেষ্টা করেছেন। তবে আমাদের মনে রাখার মতো মুসলমান সাহিত্যিকরা এই রচনাকে ‘কেছা বা কিসসা’ নামে অভিহিত



করেছেন। মুসলমান সাহিত্যিকরা কেচ্ছা রচনার ক্ষেত্রেও আরব-পারস্যের গল্পকথাকে আঁকড়ে ধরেছেন। তবে গুপ্তকথার অনেক আগেই মুসলমানি কেচ্ছা আমরা ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাংলা সাহিত্যে পেতে থাকি। এক্ষেত্রে বলা যায় একধরনের স্বকীয়তা মুসলমান সাহিত্যিকরা নিজেদের সাহিত্য রচনায় এনেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়, এই অধ্যায়ে আমরা মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত সাহিত্যগুলির নিবিড়পাঠ করে বিশ্লেষণ যেমন করেছি পাশাপাশি কাব্য রচনার উৎস, সমসাময়িক সময়ের সাহিত্যের সঙ্গে কতখানি সামঞ্জস্য রেখে সাহিত্য রচিত হয়েছে সেই সব বিষয় এই অধ্যায়ের আলোচনায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। একই বিষয়কে প্লট করে কাব্য রচিত হলেও সময়ের বদলে লেখার ধরনও বদলে গেছে। শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত ‘ইউসুফ-জোলেখা’ কাব্য যেভাবে বর্ণিত হয়েছে পরবর্তী শতকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে গরীবুল্লাহ একই বিষয় নিয়ে যখন কাব্য রচনা করেন সেক্ষেত্রে লেখার প্যাটার্ন অনেকটাই পালটে গেছে। অনেক সময় উর্দু গ্রন্থ থেকে কাব্য অনুবাদ করেছেন মুসলমান সাহিত্যিকরা। শ্রীমনিরদিন আহম্মদ রচিত ‘কালন্নবি’ কাব্যটি উর্দু গ্রন্থ থেকে অনূদিত হয়েছে। বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বাঁধন আরও পরিস্ফুট হয়েছে সাহিত্যিকদের হাতে। হিন্দু দেবতা সত্যনারায়ণ মুসলমান সমাজে সত্যপীরের রূপ নেয়। কিন্তু এই পীরের ভক্তিতে মাথা নত করেছেন উভয়সম্প্রদায়ের মানুষ। মুসলমান সাহিত্যিকরা এই সত্যপীরকে নিয়ে কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান দুই সমাজের কথা তুলে ধরেছেন এবং সাংস্কৃতিকভাবে তাঁদের মিলনকে চিত্রিত করেছেন। অপরদিকে হিন্দু সাহিত্যিকরাও সত্যনারায়ণকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন যে কাব্যের মধ্যেও উভয়সম্প্রদায়ের কথা এসেছে।

“পুরাকালে পীরেরা জাগ্রত ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমান তাঁহাদের সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। বিশেষরূপে দীক্ষিত হিন্দু বা মুসলমান ভক্ত তাঁহাদের দর্শনও লাভ করিতেন। কোনও হিন্দু ভক্ত বড়পীরকে সত্যনারায়ণ নাম দিয়া বড়পীর সাহেবেরই গুণগান করিয়াছিলেন এবং তিনি হিন্দুপ্রযুক্ত এই শিরিণী অবলম্বন করিয়াছিল এবং তাহাই এযাবৎ

প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।” (আহমদ, তসলীমুদ্দীন, ‘পীর, সত্যপীর, পীরবরহক, বড়পীর’, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী (সম্পা.), নবমভাগ, কলিকাতা, ১৩২১। পৃ.৪০)

সত্যপীর ছাড়াও গাজি পীর, কালু পীরের কাহিনি নিয়ে কাব্য লিখেছেন মুসলমান সাহিত্যিকরা। সবসময় যে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মিলনের চিত্র ফুটে উঠেছে এমন নয়। ক্ষমতার শীর্ষে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে দুই পক্ষই কখনও কখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। গাজি পীরের সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধ, পরবর্তীতে পীরের কাছে বশ্যতা স্বীকারের মধ্য দিয়ে সখ্যতা গড়ে ওঠা এই চিত্রও আমাদের সামনে আসে। আমরা ‘গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথী’ এই কাব্যে হিন্দু-মুসলমানের মিত্রতার চিত্র দেখি। গাজি পীর ও চাম্পার প্রেমের সার্থকতা ধর্মীয় বিভেদ ভুলিয়ে দেয়। আমরা কেচ্ছা বা কিসসা সাহিত্যে দেখি মুসলমান সাহিত্যিকরা আরব-পারস্যের কাহিনিকে নিয়ে যেমন কাব্য রচনা করেছেন অন্যদিকে দেশীয় কাহিনির প্রভাবও পড়েছে। পীরদের কাহিনি নিয়েও কেচ্ছা রচিত হয়েছে। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত কেচ্ছায় কাহিনির মধ্যে কাহিনির সমাবেশ লক্ষ করার মতো। মুসলমান সাহিত্যিকদের হাতে একের পর এক সাহিত্য রচনার ধারা অব্যাহত থাকে। এই অধ্যায়ে মোটামুটিভাবে বিশেষ কয়েকটি ধারার কাব্য সম্পর্কে আমরা জেনেছি। এছাড়া সম্পাদিত পুথির বিষয়বস্তুর আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আমরা গবেষণা অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে সংস্কৃতির নানাদিকের কথা জানতে পারি। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত যে সাহিত্য আমরা আলোচনা করেছি সেই সাহিত্যের মধ্যে সংস্কৃতির যে প্রসঙ্গ এসেছে তার পুঞ্জানুপুঞ্জ বর্ণনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। একদম সাধারণ জনজীবনের সংস্কৃতির দিকগুলিকে আমরা চিনে নিতে চেষ্টা করেছি সেই সঙ্গে মুসলমান সমাজের যে সংস্কৃতি তার কথাও এসেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে। সংস্কৃতির মধ্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে ছবি তা বাস্তব জীবনের সঙ্গে অনেকটাই সম্পৃক্ত হয়ে যায়। শাশুড়ী ও ননদ প্রসঙ্গ, সতিন জ্বালা, পতিসেবা, পুরুষের বহুবিবাহ, নারীর গর্ভধারণ, নারীর ঋতুস্রাব ইত্যাদি এইরকম বহু

চিত্র সংস্কৃতিকেই বহন করে। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনার ভিতর দিয়ে আমরা আসলে একটা জাতির সংস্কৃতিকে যেমন বুঝে নিতে চেয়েছি অপরপক্ষে সাধারণ জনজীবনের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবিও ফুটে ওঠে। এছাড়া সংস্কৃতির আলোচনার মধ্য দিয়ে গোটা বঙ্গদেশের সমাজজীবনে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দিকগুলিকেও চিনে নিতে চেয়েছি। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনাকর্মে শুধুমাত্র নিজেদের ধর্মীয় জীবনের কথা এসেছে এমন নয়, সামাজিক পরিমণ্ডলে একই সূত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে অন্যান্য সংস্কৃতির প্রসঙ্গকেও নিজেদের কাব্যে স্থান দিয়েছেন। মুসলমান সংস্কৃতি কি আলাদা করে নিজেদের জায়গা তৈরি করতে পেরেছে? এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঁকি দেয়। কিন্তু গবেষণার আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই বার্তা যেমন এসেছে তার চেয়েও সামাজিকভাবে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে সাংস্কৃতিকভাবে কতটা আলিঙ্গনে বদ্ধ তাও পরিস্ফুট করে। তাই মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যের মধ্যে শুধুমাত্র একক সংস্কৃতির কথা উঠে আসে না বরং সমন্বয়ের বার্তা বহন করে এই সংস্কৃতির আলোচনা।

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন যেমন নতুন সংস্কৃতির ধারাকে বয়ে আনে এর পাশাপাশি সুফিদের জীবনপ্রণালী ভারতবর্ষ তথা বাংলার মাটিতে নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেয়। গবেষণা অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে সুফি মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুফিরা ভারতবর্ষে প্রবেশের পর ইসলামীয় জীবন দর্শনে যেমন জড়িয়ে গেছে পাশাপাশি হিন্দু জনমানসেও সুফি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুফিতত্ত্ব সাহিত্যে কিভাবে এসেছে এবং মুসলমান সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনায় এর কতটা ছাপ রেখে গেছেন সবই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুফিভাবনার মধ্য দিয়েও হিন্দু-মুসলিম উভয়সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিকগত দিক দিয়ে মিলনের পথ তৈরি হয়ে যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়-

“Sufi philosophy and spiritual culture also form part of it. As a part of the matter of the Islamic world, the ideas and philosophy of Sufism came to India through both Persian literature and the Indian languages, and were received with

open arms by some Hindu religious groups and thus Sufism become a common platform where liberal Muslims and Hindus freely met in India from the 13th century onwards.”

(Suniti Kumar Chatterjee, ‘The Literatures of India’, ‘Aspects of Indian Culture (Tagore Centenary volume part II)’, Mahendra Kulasrestha (Edited), Hoshiarpur, Dev Dutt Sastri Press, 1961, p.159)

এছাড়া মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যগুলিতে সুফিবাদের প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি কাব্যের বিষয়বস্তু বর্ণনার মধ্যে সুফি মতবাদ বেশ স্পষ্ট হয়েছে। নায়িকাকে (প্রেমিকা) পেতে প্রেমিক পুরুষের যোগীরূপ ধারণ হিন্দু যোগীর ধারণাকে ব্যক্ত করে। তাই আমরা একথা বলতে পারি মুসলমান সাহিত্যিকের রচনায় শুধুমাত্র মুসলমান সংস্কৃতির পরিচয় পাই না বরং সেইসঙ্গে আমরা হিন্দু সংস্কৃতির বহু ধারণা পাই। আবার কোথাও গিয়ে আমাদের মনে হয় এ যেন আলাদা কোনও ঘরানার সংস্কৃতি নয়, হিন্দু-মুসলিম উভয়যোগে তৈরি হওয়া এক মিশ্র-সংস্কৃতি।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের একদম শেষ অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা ভাষাগত বিশ্লেষণের দিকটিকে নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনায় ভাষাগত সমস্যা কেন দেখা দিয়েছিল? সেই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা জেনেছি। মুসলমান সাহিত্যিকরা তাঁদের রচিত সাহিত্যে ‘দোভাষী ভাষা’ প্রয়োগ করে। ভাষাগত নানা রকম স্বাতন্ত্র্যের কথা মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় আমরা পেয়ে থাকি। সামাজিকভাবে মুসলমানরা তাঁদের লেখায় ধর্মীয় ভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত থেকেছেন একই সঙ্গে স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনধারায় আরবি-ফারসির প্রভাবে আত্মীয়তা বা সম্বোধনের ভাষাতেও আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি প্রভৃতি ভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। মূলত কেছ সাহিত্যে সাধারণ জনজীবনে নারীর একধরনের মুখের ভাষা আমরা পেয়ে থাকি, নারীর পতিনিন্দা, নারীর বেদনা, নারীর দুঃখপ্রকাশ, স্বামীর জন্য আর্তনাদ, পুত্রশোক ইত্যাদিতে একদম নিজেদের মতো করে সাবলীর ভাষার প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া মুসলমান সাহিত্যিকরা তাঁদের রচিত

সাহিত্যে শব্দ ব্যবহারে বানানের যে রীতি'র প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তার মধ্য দিয়েও তাঁদের নিজস্ব একধরনের লেখার স্টাইল বজায় রেখেছেন।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের অবস্থান, তাঁদের রচিত সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি ও ভাষার যে অনন্যমাত্রাকে আমরা এই গবেষণার ভিতর থেকে খুঁজে নিতে চেয়েছি তা অনবদ্য মাত্রায় উঠে আসে। আসলে 'মুসলমান সাহিত্যিক' এই পরিচয়ের কথা উঠে আসলেই অনেক সমালোচনার দাবী রাখে কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের আলাদা করে সাহিত্য রচনার প্রয়াস কেন দিল? সেই ইতিহাসও আমাদের জানা প্রয়োজন। শুধুই কি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই সাহিত্য বিবেচ্য? গবেষণা অভিসন্দর্ভের আলোচনার ভিতর দিয়ে যে তথ্য উঠে আসে তাতে জানা যায় মুসলমানরা ভারতবর্ষে প্রবেশের পর নিজেদের সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে হিন্দুদের সঙ্গে সখ্যতাও গড়ে তোলে। কখনও সামাজিকক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভূ ক্ষমতার চেষ্টায় লড়াই এ সামিল হলেও শেষপর্যন্ত মিলনের পরিসর তৈরি করেছে। আসলে আমরা এই গবেষণার ভিতর দিয়ে বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের চিত্রকে যেমন তুলে এনেছি অপরপক্ষে মিশ্র-সংস্কৃতির যে ধারা বহমান ছিল তাকেও বুঝে নিয়েছি। ভারতবর্ষে অন্যান্য জাতির মতোই মুসলমানরাও এদেশের সংস্কৃতিতে মিশে গেছেন একথা যেমন সত্য অপরদিকে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাকেও বয়ে নিয়ে চলেছেন। আসলে ভারতবর্ষে বসবাসকারী মুসলমান এদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের জায়গা ধীরে ধীরে তৈরি করেছেন। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি জনজাতির যে চিত্র গোটা বাংলায় নির্মাণ হয়েছিল সেই সময়ে মুসলমান সাহিত্যিকদের পক্ষে এর চেয়ে আরও সমাদৃত সাহিত্য রচনা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এই সময় ভারতবর্ষের পরিস্থিতি এবং এই দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকের কথা জানলে আরও স্পষ্ট হয়-

“The eighteenth century and the early nineteenth century, how ever found our culture in a state of well-nigh hopeless torpor and disintegration. It was the true Dark age for India.”

(C.C.Dutt. 'The Culture of India', Bombay, Vidya Bhavan,  
1964. P. 31)

ধ্রুপদি সংস্কৃতির ধারায় সাহিত্যকে বিচার বিশ্লেষণের দিকটি যেমন আমরা করেছি ঠিক সেইভাবেই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভিতর দিয়েও আর একটি সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় যে সংস্কৃতি আসলে মাটির কাছাকাছি মানুষের লোককেন্দ্রিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে মূলত সর্বদাই লৌকিক কাহিনিই কাব্যের উপজীব্য হয়েছে। ফলে সমাজজীবনে লৌকিক সংস্কৃতির দিকগুলি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। প্রতিটি চরিত্র লোকজীবনের কথা বলে। লোকজীবনের একদম মাটির কাছাকাছি মানুষের অভিব্যক্তি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। নির্বাচিত কাব্যগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানবরসে পর্যবসিত একথা বলা যেতেই পারে। প্রতিটি কাব্য রচনায় রাজসভার বর্ণনা, প্রাসাদের কারুকার্য, স্থাপত্য-কার্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে যেমন একধরনের সংস্কৃতিকে তুলে এনেছেন পাশাপাশি চরিত্রগুলোর মধ্যে সাধারণ লোকজীবনের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরেছেন যা আর এক সংস্কৃতিকে বহন করে। ফলে সংস্কৃতির সংজ্ঞা চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্যকেই শুধুমাত্র বোঝায় না, একদম তৃণমূলস্তরের মানুষের জীবনধারণের কথা, তাঁদের আচার-সংস্কার, পোশাক, বাসস্থান, খাদ্যাভাস, বিনোদনের বিষয়ও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে আমরা গ্রহণ করেছি এবং তারই পরিচয় এখানে দেওয়া হয়েছে। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভে এই দিকগুলি বর্ণনা করাই মূল উদ্দেশ্য থেকেছে। এছাড়া মুসলমান সংস্কৃতির পাশাপাশি হিন্দু সমাজের প্রচলিত সংস্কৃতিকে মিলিয়ে দেখা। উভয়সম্প্রদায় (হিন্দু-মুসলিম) সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে কতটা উন্মুক্ত? মুসলমান সাহিত্যিকরা কতটা হিন্দু সংস্কৃতিকে আঁকড়ে নিজেদের সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত থেকেছেন। এছাড়াও বলা যায় বঙ্গদেশের সামাজিক ক্ষেত্রভূমিতে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি কতটা নিবিড় সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছে তা উল্লিখিত সময়ের সাহিত্যগুলির মধ্যে উঠে এসেছে।

মুসলমানরা এদেশে বসবাস করেও নিজেদের সমস্ত উৎসব আনন্দে যেমন মেতে থেকেছে অন্যদিকে হিন্দু উৎসবেও যোগদান করেছে। আজও বেশকিছু জায়গায় হিন্দু-মুসলমান উভয়-জাতিই পীরের সেবায় নিয়োজিত থেকেছে। রক্ষণশীলতাকে বাদ দিয়েও হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র-সংস্কৃতির চিত্র আমাদের সামনে পরিলক্ষিত হয়। মুসলমান সাহিত্যিকদের যে রচনার কথা আমরা জেনেছি সেই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একক সংস্কৃতিকে ভুলে বহুমাত্রিক সংস্কৃতির ধারাকে বুঝে নিতে চেয়েছি এটাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল আলোচনার জায়গা। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত আরও অনেক সাহিত্য অনালোচিত থেকে গেছে পরবর্তী গবেষক, সাহিত্যিকদের এই আলোচনায় অগ্রসর হয়ে বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোত থেকে সঠিকভাবে ‘মুসলমান সাহিত্যিক’দের অবস্থান বুঝে নিতে হবে। আশা রাখি এই আলোচনা উত্তরোত্তর বহনকারী পাঠক সমাজে আলোর দিশারি পেতে সাহায্য জোগাবে।

## গ্রন্থপঞ্জি

(MLA 8<sup>th</sup> Edition ফরম্যাট এবং নামের ক্রমতালিকা অনুযায়ী গ্রন্থপঞ্জি করা হয়েছে, বাংলা গ্রন্থের শেষে একদাঁড়ি (।) এবং ইংরেজি গ্রন্থের শেষে ফুলস্টপ (.) ব্যবহৃত হয়েছে।)

### আকর গ্রন্থ (বাংলা): (মূল বানান অপরিবর্তিত আছে)

- আবেদীন. জয়নাল, 'ছহি আবুসামা', কলিকাতা, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৩৯৩।
- আলাওল. 'পদ্মাবতী (দ্বিতীয় খণ্ড)', দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ফেব্রুয়ারি ২০০২।
- আলী. মুন্সী মোয়াজ্জম, 'আমির সদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী', ঢাকা, চুড়িহাটা, হামিদিয়া প্রেস, ১৯৪৫।
- আহাম্মদ. শ্রীমনিরদিন, 'কালন্নবি', কলিকাতা, নুরিয়া প্রেস, ১২৯১।
- ওয়াহাব. আবদুল, 'ছহি বড় ছায়েত নামা', কলকাতা, জি.কে.প্রকাশনী, ১৪১৭।
- কাজি. দৌলত, 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না', দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.), কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, জুন ২০১২।
- খান. দৌলত উজীর বাহরাম (১৫৪৫-১৫৫৩), 'লায়লী-মজনু', আহমদ শরীফ (সম্পা.), ঢাকা, বাঙলা-একাডেমী, জুন ১৯৫৭।
- জলিল মুহম্মদ. আবদুল, (সম্পা.), 'শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জানুয়ারী ১৯৯১।
- জায়সী ও আলাওল. 'পদ্মাবতী (প্রথম খণ্ড)', দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগস্ট ২০০৯।
- ভুইঞা. মৌলবী হাজী আবদুল মজিদ, 'ছহী রঙ্গ-বাহার বা শাহে আলম ও মাহে আলমের কেছা', কলিকাতা, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট হবিবী প্রেস, ১৩৩৯।



মুন্সী শাহ. গরীবুল্লাহ, 'ইউছফ জোলেখা বা মোহাব্বাতনামা', ঢাকা, চকবাজার, আলিমি লাইব্রেরী, ১৩৬৯।

মুনসী মোহম্মদ. ইউনুছ, 'আবদুল আলী গারলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি', ঢাকা, চকবাজার, আলিমি লাইব্রেরী, ১৩৭০।

মুনশী. মহাম্মদ, 'বড় নিজাম পাগলার কেছা', কলিকাতা, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট ওসমানিয়া প্রেস, ১৩২৩।

মোহাম্মদ. খাতের, 'বোন বিবী জহুরা নামা নারায়নীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা', কলিকাতা, জি. কে. প্রকাশনী, ১৪১৬।

রহিম. আবদুর, 'গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথী', ঢাকা, ময়মনসিংহ, আজিমী প্রেস, ১৯১৯।

শকুর. মুন্সী আবদুশ্ (ওরফে মানিক মিংগা), 'ছহী গুলে বকাওলী', কলিকাতা, হবিবি প্রেস, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, ১৩২৭।

শাহ মুহম্মদ. সগীর, 'ইউসুফ-জোলেখা', মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা.), কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, মে ১৯৮৪।

শ্রীকবিবল্লভ. 'সত্যনারায়ণের পুথি', মুন্সী আব্দুল করিম (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২।

শেখ. কামরুদ্দিন, 'ছহি নেক বিবির কেছা', কলিকাতা, মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৪০৯।

শেখ. ওমরদ্দিন, 'খয়রল হাসার' কলিকাতা, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, অগ্রহায়ন ১৪১০।

সরকার. এনাতুল্লাহ, 'ফকির বিলাস ও মারফতি সওয়াল জওয়াব', কলিকাতা, জি.কে. প্রকাশনী, ১৪০৩।

সেখ. কামরুদ্দিন, 'খায়রল হাসার', কলিকাতা, জি.কে.প্রকাশনী, ইসলামিয়া লাইব্রেরী।

হাকিম মোহাম্মদ. মোয়াজ্জম, 'ছহী তেলেছমাত ছোলেমানী বা আজায়েব ছোলেমানীর দ্বিতীয়ভাগ', কলিকাতা, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৩৯৩ সাল।

## সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা):

আনিসুজ্জামান, 'স্বরূপের সন্ধানে', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০৯।

আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)', ঢাকা, চারুলিপি, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র (১৮৩১-১৯৩০)', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ১৯৬৯।

আমেদ. আফসার, 'মুসলমান সমাজ: নানাদিক', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০৪।

আলী. আহমদ (সংকলিত), 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

আহমদ. ওয়াকিল, 'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা (প্রথম খণ্ড)', নিউ দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৩।

আহমদ. ওয়াকিল, 'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা (দ্বিতীয় খণ্ড)', নিউ দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৩।

আহমদ. ওয়াকিল, 'বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী (১৭৫৭-১৮০০)', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

আহমদ. ওয়াকিল, 'বাংলার পীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি', ঢাকা, বইপত্র, আগস্ট ২০১৬।

আহমদ. ওয়াকিল, 'বাংলার সুফি পির-দরবেশ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য', ঢাকা, গতিধারা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

আহমদ. ওয়াকিল, 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান', ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, জুলাই ২০১২।

ইসলাম. সা'আদুল, 'বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মিশ্রণ', কলকাতা, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, জুন ২০১০।

এমরান. সৈয়দ শাহ, 'ইসলামী পরিভাষা', ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০১৯।

ওদুদ. কাজী আবদুল, 'শাশ্বতবঙ্গ', কলিকাতা, সিগনেট বুকশপ, ১৩৫৮।

ওদুদ. কাজী আবদুল, 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ', বরেন্দ্র মণ্ডল (সংকলন ও সম্পাদনা), বাংলাদেশ, কথাপ্রকাশ, ২০১৮।

কবির. আহমদ, 'আহমদ শরীফ রচনাবলী (প্রথম)', ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১০।

কামরুজ্জামান, 'বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আরবি ফারসি চর্চা', কলকাতা, এডুকেশন ফোরাম, ডিসেম্বর ২০১৬।

করিম. আবদুল, 'ইসলামের ইতিহাস পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন (প্রাচীন সভ্যতা থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২০।

করিম. আবদুল, 'বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)', ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

করিম. শ্রীআবদুল (সঙ্কলিত), 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা)', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ১৩২০।

কোসাম্বি. দামোদর ধর্মানন্দ, 'ভারত-ইতিহাস চর্চার ভূমিকা', কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০২।

ক্ষেমানন্দ. কেতকাদাস, 'মনসামঙ্গল', ভট্টাচার্য শ্রীবিজনবিহারী (সংকলন ও সম্পাদনা), নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৫।

গনী. ওসমান, 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি', কলকাতা, রত্নাবলী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯।

গোস্বামী. মদনমোহন (সংকলন ও সম্পাদনা), 'ভারতচন্দ্র', কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৬।

ঘোষ. কবিতা, 'সপ্তদশ শতকের বাঙালির সমাজ ও সাহিত্য', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪।

ঘোষ. মণীন্দ্রকুমার, 'বাংলা বানান', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, শ্রাবণ ১৪২০।

চক্রবর্তী. উদয়কুমার ও নীলিমা চক্রবর্তী, 'ভাষাবিজ্ঞান', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৫।

চক্রবর্তী, উদয়কুমার, 'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর  
২০০৪।

চক্রবর্তী. উদয়কুমার, 'নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ', কলকাতা, ইন্দাস, ডিসেম্বর  
২০০৬।

চক্রবর্তী. উদয়কুমার, 'বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ', কলকাতা, অরিন্দম পাবলিকেশন, মার্চ  
২০১৩।

চক্রবর্তী. বরণকুমার, 'গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৩।

চট্টোপাধ্যায়. কুন্তল, 'সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', কলকাতা, রত্নাবলী,  
২০০৯।

চট্টোপাধ্যায়. জীবনানন্দ, 'বটতলার ভোরবেলা', কলকাতা, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট  
লিমিটেড, ২০১৪।

চট্টোপাধ্যায়. মুনমুন, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা: পুনর্বিচার', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৪।

চট্টোপাধ্যায়. শ্রীসুনীতিকুমার, 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা  
আকাদেমি, ২০০৫।

চট্টোপাধ্যায়. শ্রীসুনীতিকুমার, 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস', কলকাতা, জিজ্ঞাসা, জানুয়ারী  
২০০৩।

চট্টোপাধ্যায়. সুনীতিকুমার, 'ভারত সংস্কৃতি', কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ  
লিঃ, ১৪০৯।

চট্টোপাধ্যায়. সুনীতিকুমার, 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', কলকাতা, কলিকাতা  
বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৯৬।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', নতুন দিল্লী, রূপা পাবলিকেশন  
ইন্ডিয়া লিমিটেড, আগস্ট ২০১৬।

চট্টোপাধ্যায়. হীরেন, 'সাহিত্য প্রকরণ', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১৩।

চৌধুরী. আবুল আহসান (সম্পা.), 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ঐতিহ্য-অশ্বেষার  
প্রাক্ত পুরুষ', ঢাকা, শোভা প্রকাশ, ২০১১।

ছফা. আহমদ, 'বাঙালি মুসলমানের মন', ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৭।

জওহর. মোবারক করীম, 'ভারতের সুফি (১ম খণ্ড)', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১লা  
বৈশাখ ১৪১৯।

তরফদার. মমতাজুর রহমান, 'বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়ামী-হিন্দী পটভূমি', ঢাকা,  
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

দত্ত. মিলন, 'চলিত ইসলামি শব্দকোষ', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১।

দাশ. নির্মল, 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১০।

দাশ. নির্মল, 'লোকভাষা থেকে ভাষাবিজ্ঞান', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর  
২০১০।

দাশ. শিশিরকুমার, 'ভাষা জিজ্ঞাসা', কলকাতা, প্যাপিরাস, অগ্রহায়ণ ১৪২৪।

দাশ. শিশিরকুমার, 'সংসদ বাংলা সাহিত্য সঙ্গী', কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০০৩।

দাশগুপ্ত. কল্যাণকুমার, 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি', কলকাতা, সচ্চিদানন্দ প্রকাশনী, ১৯৬০।

দাস. গিরীন্দ্রনাথ, 'বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা', বারাসাত, শেহিদ লাইব্রেরী, এপ্রিল  
১৯৭৬।

দাস. শশাঙ্কশেখর, 'বনবিবি', কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র', মার্চ  
২০০৪।

দে. অমলেন্দু, 'সমাজ ও সংস্কৃতি', কলিকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৮১।

নীলিমা. পৃথ্বীলা নাজনীন (সম্পা.), 'আহমদ শরীফ রচনাবলী (পঞ্চম)', ঢাকা, আগামী  
প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১৩।

পন্ডিত. রামাই, 'শূন্যপুরাণ', শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য-  
পরিষদ, মাঘ ১৩১৪।

বসু. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, 'বাংলার লৌকিক দেবতা', কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল  
১৯৭৮।

বসু চক্রবর্তী. আবীরা (অনুবাদ), 'ভারতবর্ষঃ ঐতিহাসিক সূচনা ও আর্থ ধারণা',  
নয়াদিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০১৭।

ব্রহ্ম. তৃপ্তি, 'বাংলার ইসলামী সংস্কৃতি', কলকাতা, ফার্মা কে. এল. এম (প্রাঃ) লিঃ, ১৩৯২।

ব্রহ্ম. তৃপ্তি, 'লোকজীবনে বাংলার লৌকিক ধর্মসঙ্গীত ও ধর্মীয়মেলা', কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. এম (প্রাঃ লিঃ), ১৩৯২।

বন্দ্যোপাধ্যায়. অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯-২০১০।

বন্দ্যোপাধ্যায়. ব্রজেন্দ্রনাথ, 'বাংলা সাময়িক-পত্র (অখণ্ড)', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়. ব্রজেন্দ্রনাথ, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দুখণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ)', কলিকাতা, ১৩৫৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়. শ্রীশ্রীকুমার, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে', কলিকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ ১৩৬৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়. সুরভি, 'গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০০৫।

বিশ্বাস. অচিন্ত্য, 'বাংলা পুথির কথা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ২০১৩।

বিশ্বাস. অদ্রিশ ও অনিল আচার্য (সম্পা.), 'বাঙালির বটতলা (প্রথম খণ্ড)', কলকাতা, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩।

বিশ্বাস. সুকুমার (সংকলন ও সম্পাদনা), 'বাংলা একাডেমী পুঁথি পরিচয়-১', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ১৯৯৫।

ভট্টাচার্য. অতীন, 'উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান মনন: স্বঅন্বেষণ', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০২২।

ভট্টাচার্য. অমিত্রসূদন (সম্পা.), 'বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১।

ভট্টাচার্য. আনন্দ, 'বাংলায় সুফি আন্দোলন', কলকাতা, আকাশপ্রদীপ, ২০১২।

ভট্টাচার্য. শ্রীসত্যনারায়ণ (সম্পা.), 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী', কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

ভট্টাচার্য. যতীন্দ্রমোহন, 'বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি', কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।

ভট্টাচার্য. শান্তিরঞ্জন, 'উর্দুপ্রেমী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়', কলিকাতা, অতিথি, জুলাই ১৯৮৬।

ভট্টাচার্য. সুভাষ, 'বাঙালির ভাষা', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৪।

ভদ্র. গৌতম, 'ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার?', কলিকাতা, ছাতিম বুকস, জুন ২০১১।

ভৌমিক. সুহৃদকুমার, 'শব্দ ও বানান', কলিকাতা, মনফকিরা, জানুয়ারি ২০১৮।

মজুমদার. পরেশচন্দ্র, 'বাঙলা বানান বিধি', কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৪।

মণ্ডল. শ্রীপঞ্চানন (সম্পা.), 'পুঁথি-পরিচয় (দ্বিতীয় খণ্ড)', বীরভূম, শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতন প্রেস, মার্চ ১৯৫৮।

মণ্ডল. শ্রীপঞ্চানন (সম্পা.), 'পুঁথি-পরিচয় (তৃতীয় খণ্ড)', বীরভূম, শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতন প্রেস, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩।

মণ্ডল. শ্রীপঞ্চানন (সম্পা.), 'পুঁথি-পরিচয় (চতুর্থ খণ্ড)', বিশ্বভারতী, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি, ফেব্রুয়ারী ১৯৮০।

মণ্ডল. সুজিতকুমার (সম্পা.), 'বনবিবির পালা', কলিকাতা, গাঙচিল, মার্চ ২০১০।

মুখোপাধ্যায়. সুখময় (সম্পা.), 'ময়মনসিংহ গীতিকা', কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৮২।

মল্লিক. শ্রীকল্যাণ, 'নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী', কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৬।

মাধব. দ্বিজ, 'মঙ্গলচন্দীর গীত', শ্রী সুধীভূষণ ভট্টাচার্য (সম্পা.), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২।

মুকন্দ. কবিকঙ্কণ, 'চন্দীমঙ্গল', সুকুমার সেন (সম্পা.), নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৩।

- মুরশিদ. গোলাম, 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি', ঢাকা, অবসর, ২০০৬।
- মুহম্মদ. এনামুল হক ও আবদুল করিম (সম্পা.), 'আরাকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য [খ্রীষ্টীয় ১৬০০-১৭০০অব্দ]', কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৩৫।
- মুহম্মদ. শহীদুল্লাহ, 'বাংলা সাহিত্যের ধারা', ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭।
- মুহম্মদ. শহীদুল্লাহ, 'বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড-মধ্যযুগ)', ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৭।
- মুহম্মদ. শহীদুল্লাহ, 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত', ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, মে ২০১৪।
- মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন. আবুল কাসিম, 'পুথি সাহিত্যের ইতিহাস' ঢাকা, পুরানা পল্টন, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ১৯৬৯।
- মৈত্রেয়. অক্ষয়কুমার, 'গৌড়ের কথা', দীনেশচন্দ্র সরকারের ভূমিকা সংবলিত, কলকাতা, সাহিত্যলোক, বৈশাখ ১৩৯০।
- মোহাম্মদ যাকারিয়া. আবুল কালাম (সম্পা.), 'বাঙলা সাহিত্যে গায়ী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান', কলকাতা, সারস্বতকুঞ্জ, ১৯৯২।
- মৌলিক. শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পা.), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (তৃতীয় খণ্ড)', কলিকাতা, ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, ১৯৭১।
- রশিদ. মোহাম্মদ হারুন (সম্পাদনা ও সংকলন), 'বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, মে ২০১৫।
- রহমান. হাবিব, 'বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন', কলকাতা, মিত্রম, ২০০৯।
- রহিম. মুহম্মদ আবদুর, 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।
- রায়. অসীম, 'ইসলাম ও বাঙালী মুসলমান' কলকাতা রেডিয়্যান্স, ২০১৫।
- রায়. নীহাররঞ্জন, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব (১ম পর্ব)', কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৮০।



রায়. নীহাররঞ্জন, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব (২য় খণ্ড)', কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৮০।

রায়. নীহাররঞ্জন, 'কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি', কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৯।

রায়. শ্রীব্রজসুন্দর, 'ইসলাম গৌরব', কলিকাতা, সাধারণ ব্রহ্মসমাজ, ১৩৫০।

শ. ডঃ রামেশ্বর, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, অগ্রহায়ণ ১৪০৩।

শর্মা. উমেশ, 'মুসলিম লোকগান মুর্শিয়া', কলিকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।

শরীফ. আহমদ, 'বাঙলার সূফী সাহিত্য', ঢাকা, সময় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

শরীফ. আহমদ, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড)', ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন, ২০১৩।

শরীফ. আহমদ (সম্পা.), 'মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৌষ ১৩৬৯।

শরীফ. আহমদ, 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ', ঢাকা, সময় প্রকাশন, নভেম্বর ২০০০।

শরীফ. আহমদ, 'বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব', ঢাকা, অনন্যা, আগস্ট ২০১২।

শরীফ. আহমদ, 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য গ্রন্থ-ভূমিকা (প্রথম খণ্ড)', আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা.), ঢাকা, শোভা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

শরীফ. আহমদ, 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য গ্রন্থ-ভূমিকা (দ্বিতীয় খণ্ড)', আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা.), ঢাকা, শোভা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

শ্রীপাত্ত, 'যখন ছাপাখানা এলো', কলিকাতা, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, সংস্কৃতি ও গবেষণা কেন্দ্র, জুলাই ১৯৭৭।

শ্রীপাত্ত, 'বটতলা', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭।

শ্রীমন্মহর্ষি. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, 'স্কন্দ পুরাণম্ (সপ্তখণ্ডাত্মকম্), শ্রীযুক্ত পঞ্চগনন তর্করত্ন (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন প্রেস, ১৩১৮।

সরকার. কনকচন্দ্র, 'বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি', কলিকাতা, রত্না প্রকাশনী, ২০০৩।

সরকার. পবিত্র, 'ভাষা, দেশ, কাল', কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯।

সরকার. পবিত্র, 'ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ', কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৩।

সরকার. পবিত্র, 'প্রসঙ্গ: বাংলা ব্যাকরণ', কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০১০।

সালেকীন. সিরাজ, 'ভাটির দেশের বাঙাল', ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২২।

সাংকৃত্যায়ন. রাহুল, 'ইসলাম ধর্মের রূপরেখা', মলয় চট্টোপাধ্যায় (অনুবাদ), কলিকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ২০১৫।

সিন্দীকী. আবদুর গফুর, 'মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য', কলিকাতা, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৬।

সিন্হা. রাজেশ্বর (সংকলন ও সম্পাদনা), 'আপন হতে বাহিরে', কলিকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, মে ২০২২।

সেন. দীনেশচন্দ্র, 'বৃহৎবঙ্গ', কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৩৫।

সেন. সুকুমার, 'বটতলার ছাপা ও ছবি', সুভদ্রকুমার সেন (সম্পা.), কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪।

সেন. সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৪০।

সেন. সুকুমার, 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৩।

সেন. শ্রীসুকুমার, 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, শ্রাবণ ১৩৫২।

সেন. সুকুমার, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

সেন. শ্রীদীনেশচন্দ্র (সঙ্কলিত), 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা)', কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৬।

সেন. দীনেশচন্দ্র, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৫।

সেন. দীনেশচন্দ্র, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১।

সেনগুপ্ত. সমীর, 'মুসলমান বাঙালির ধর্মীয় পরিভাষা', কলকাতা, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১১।

সেন. ক্ষিতিমোহন, 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা', কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০।

সৈয়দ. আবদুল মান্নান, নির্বাচিত শিখা মুসলিম সাহিত্য সমাজের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দলিল', ফেব্রুয়ারি ২০০০।

হক. কাজী রফিকুল (সংকলন ও সম্পাদনা), 'বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ২০০৭।

হক. এনামুল, 'মুসলিম বাংলা-সাহিত্য', কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০০১।

হক. মুহম্মদ এনামুল, 'বঙ্গে সূফী-প্রভাব', ঢাকা, র্যামন পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

হালদার. গোপাল, 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ', কলিকাতা, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, মে ১৯৬০।

হান্টার. ডব্লিউ, ডব্লিউ, 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস', এম. আনিসুজ্জামান (অনুবাদ), ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১৪।

হুমায়ুন. রাজীব, 'সমাজভাষাবিজ্ঞান', ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১৬।

হোসেন. ইমরান, 'বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী: চিন্তা ও কর্ম', ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।

**সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজি):**

Abdul Mannan. Kazi Muhammad, 'The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal up to 1855 A.D', University of London, Proquest, 1964.

- Ahmad. Hajrat Mirza Bashir-ud-din Mahmud, 'The economic structure of Islamic Society', India, Nazik Dawat-O-Tabligh Ahmadiyya Community, 1966.
- Ahmed. Rafiuddin, 'The Bengal Muslims 1871-1906: A Quest for Identity', Delhi, Oxford University Press, 1988.
- Ahmed. S. M, 'Islam in India and the Middle East', Allahabad, J. K. Sharma at the Allahabad Law Journal Press, 1962.
- Akanda. Latifa, 'Social History of Muslim Bengal', Dacca, Islamic Cultural Centre, 1981.
- Ashraf. Syed Ali, 'Muslim Traditions In Bengali Literature', Karachi University, Bengali Literary Society, 1960.
- Arberry. A. J. 'Sufism an Account of the Mystics of Islam', London, George allen & unwin ltd, 1968.
- Arnold. Sir Thomas. Alfred Guillaume, 'The legacy of Islam', London, Oxford University Press, 1952.
- Bandhu. Vishva (Gen Editor), 'Aspects of Indian Culture (tagore centenary volume part II)', Hoshiarpur, Dev Dutt Sastri, 1961.
- Bandyopadhyay. Pranab, 'Indian Culture And Heritage', Calcutta, Book club, 1991.
- Banerjee. Sumanta, 'The Parlour and the Streets Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta', Calcutta, Seagull Books, 1998.
- Basham. A. L, 'Cultural History of India', Oxford, Oxford University Press, 1985.
- Begum. Shabnam, 'Bengal's Contribution to Islamic studies during the 18<sup>th</sup> century,' Aligarh: Aligarh Muslim University, 1994.
- Billah. Abu Musa Mohammad Arif, 'The Development of Bengali Literature during Muslim Rule', Bangladesh: University of Dacca, 2007.
- Bose. Neilesh, 'Recasting the Region Language, Culture, and Colonial Bengal', New Delhi: Oxford university press, 2014.
- Brockelmann. Carl, 'History of the Islamic People', London, Routledge & Kegan Paul Ltd, 1956.
- Browne. Edward G, 'A Literary History of Persia', London: T. Fisher Unwin, 1009.
- Chakraborty. Uday Kumar & Atin Bhattacharya, 'The Muslims of 24 Parganas', June 1982.

Chand. Tara, 'Influence of Islam on Indian Culture', Allahbad, The Indian press limited, 1946.

Chandra. Satish, 'History of Medieval India (800-1700)', New Delhi, Orient BlackSwan, 2014.

Chatterjee. Suniti Kumar, 'The Origin and Development of the Bengali Language', Calcutta, Rupa & Co. 1975.

Dasgupta. Shashibhusan, 'Obscure Religious Cults', Calcutta, University of Calcutta, December 1946.

Dil. Afia, 'Impact of Arabic on Bengali Language And Culture', Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum), Vol. 57(1), 2012.

Eaton. Richard M, 'The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760', Berkeley: University of California Press, 1993.

Gaur. Vinod K, 'Growing Culture Deficit of Contemporary Indian Society', Economic and Political Weekly, Vol. 44. No. 21 (May 23-29, 2009). PP. 15-18

Gibb. Sir Hamilton A. R, 'An Interpretation of Islamic History', Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, 1957.

Goel. Sita Ram, 'The Story of Islamic Imperialism in India', New Delhi, Voice of India.

Gokak. Vinayak Krishna, 'India and World Culture', Kolkata, Sahitya Akademi, 1994.

Green. Nile, 'Indian Sufism Since the Seventeenth Century (Saints, books and empires in the Muslim Deccan)', New York, Routledge, 2006.

Haque. Muhammad Enamul, 'A History of Sufi-ism in Bengal', Dacca, Asiatic Society of Bangladesh, 1975.

Husain. S. Abid, 'The national culture of Indian', Calcutta, Asia Publishing House, 1961.

Inglis. David, 'Culture and Everyday life', New York, Routledge, 2005.

Karim. Abdul, 'Social History of The Muslims In Bengal' (down to A.D 1538), Dacca, The Asiatic Society of Pakistan, 1959.

Latif. Dr. Syed Abdul, 'Islamic Cultural Studies,' Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, 1953.

Levy. Reuber, 'The Social Structure of Islam', Cambridge, At the University Press, 1957.

Lewis. Bernard, 'The Middle East A Brife History of The Last 2,000 Years', New York: Scribner, 1995.

- Majumdar. R. C, 'History of Mediaeval Bengal', Calcutta, G. Bharadwaj & co. 1973.
- Martin. Vanessa, 'Islam and Modernism', London, I. B. Tauris & co Ltd, 1989.
- Mitra. Sisirkumar, 'A Marvel of Cultural Fellowship', Calcutta, Lalvani Publishing House, 1967.
- Mitra. Sisirkumar, 'Cultural Fellowship of Bengal', Calcutta, Culture Publishers, 1946.
- Munshi Abdul karim & Ahmad Sharif, 'A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts', Dacca: The Asiatic Society of Pakistan, 1960.
- Nehru. Jawaharlal, 'The Discovery of India', Delhi, Oxford University Press, 1994.
- Panikkar. K. N, 'Culture, Ideology, Hegemony Intellectuals and Social Conciousness in Colonial India', New Delhi, Tulika, 2001.
- Prasad. Ishwari, 'History of Mediaeval India', Allahbad, The Indian Press Ltd, 1933.
- Rahim. Muhammad Abdur, 'Social and Cultural History of Bengal' (vol. I 1201-1576), London, 1959.
- Rahman, A, 'History of Indian Science, Technology and Culture AD 1000-1800', New Delhi, Oxford University Press, 2000.
- Rahman. Hossainur, 'Hindu-Muslim Relations in Bengal 1905-1947: Study in Cultural Confrontation', Bombay, Nachikta Publications Limited, 1974.
- Rizvi. Saiyid Athar Abbas, 'A History of Sufism in India' (vol-i), New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers pvt. Ltd. 1978.
- Robb. Peter, 'A History of Indian', New York, Palgrave, 2002.
- Said. Edward W, 'Culture and Imperialism', New York, vintage Books, 1994.
- Sarkar. Dr. Jadu-Nath, 'The History of Bengal', (volume II Muslim Period 1200-1757), Dacca, The University of Dacca, 1948.
- Sarkar. Jagadish Narayan, 'Hindu-Muslim Relations in Bengal' (Medieval Period), Delhi, Idarah-I Adabiyat-i Delli, 2009.
- Sarkar. Jagadish Narayan, 'Islam In Bengal'(Thirteenth to Nineteenth Century), Calcutta, Ratna Prakashhan, 1972.
- Sastri. K. S. Ramaswami, 'Hindu Culture and the Modern Age', Annamalainagar, Annamalai university, 1956.

Sen. Amartya, 'The Argumentative Indian Writings on Indian History, Culture and Identity', New York, Farrar, Straus and Giroux, 2005.

Sen. Sukumar, 'History of Bengali Literature', New Delhi, Sahitya Akademy, 1960.

Shah. Idries, 'The Way of the Sufi', New York, Penguin books, 1979.

Singh. B.P, 'India's Culture The State, the Arts and Beyond', New Delhi, Oxford University Press, 2000.

Srivastava. Ashirbadi Lal, 'Medieval Indian Culture', Agra, Shiva Lal Agarwala & Publishers, 1964.

Syed. Ameer Ali, 'The Spirit of Islam', Calcutta, S. K. Lahiri & co. 1902.

Syed. Raza Haider, 'Relations of the Bhakti Saints with Muslim Sufis (16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> Centuries)', (Master of Philosophy), Aligarh, Aligarh Muslim University, 1984.

Titus. Murray, 'The Religious Quest of India: Indian Islam: A Religious History of Islam in India', New Delhi, Oriental Books Reprint Corporation, 1979.

Vanina. Eugenia, 'Hindus and Muslims in Medieval North India: Stages of Reciprocal Perception', New Delhi, Sage Journals, Studies in People's History Volume 8, Issue 1, June 2021.

Vidyarthi. Mohan Lal, 'India's Culture through the ages', Kanpur, Citizen Press, 1952.

Wm. Theodore de Bary, Stephen Hay, Royal Weiler & Andrew zyarow, 'Sources of Indian Tradition', Delhi, Motilal Banarsidass, 1963.

Zami. Tahmidal, 'Vernacular Sufism in Bengal (1500-1800 CE)', Bangladesh, History of Bangladesh: volume II- Politics, History, Culture, 2020.

### পত্র-পত্রিকা

অনুষ্ঠাপ, (বিশেষ বাংলা পুঁথি সংখ্যা, প্রাক্ শারদীয়), অনিল আচার্য (সম্পা.), ৪৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা, ১৪২২।

আল্-এসলাম, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ২য় ভাগ, ৮ম সংখ্যা, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩২৩।

আল্-এসলাম, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ১ম ভাগ, ৭ম সংখ্যা, কলিকাতা, কার্তিক  
১৩২২।

আল্-এসলাম, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা, কলিকাতা, বৈশাখ  
১৩২৩।

আল্-এসলাম, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, কলিকাতা, আশ্বিন  
১৩২৩।

আহমদী, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, গোলাম ছমদানী (সম্পা.), কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩৩৩।

কোহিনুর, মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (সম্পা.), সপ্তমবর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ফরিদপুর,  
পাংশা, মাঘ ১৩১৩।

কোহিনুর নবপর্যায়, মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (সম্পা.), দ্বিতীয়বর্ষ, ৮ম সংখ্যা,  
অগ্রহায়ণ ১৩২২।

কোহিনুর নবপর্যায়, মোহাম্মদ রওশনা আলী চৌধুরী (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা,  
মাঘ ১৩২২।

দেশ (সাহিত্য সংখ্যা), ৩২ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, শ্রী অশোককুমার সরকার (সম্পা.),  
শ্রীসাগরময় ঘোষ (সহকারী সম্পাদক), কলিকাতা, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট  
লিমিটেড, ১৩৭২।

নবনূর, মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.), ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কলিকাতা, আশ্বিন-  
কার্তিক ১৩১০।

নবনূর, মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.), ঈদ সংখ্যা, ৯ম সংখ্যা, কলিকাতা, পৌষ  
১৩১০।

নবনূর, মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কলিকাতা, শ্রাবণ  
১৩১১।

নবনূর, মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কলিকাতা, কার্তিক  
১৩১১।



নবনূর, মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.), ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩১২।

নবনূর, মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী (সম্পা.), ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২।

পড়শি, শাহ আবদুল করিম সংখ্যা, মৃদুল হক ও সখিগতা দত্ত (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলিকাতা, শীত ১৪২৮(২০২১)।

বহুবচন, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পবিত্র সরকার (প্রধান সম্পাদক), দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও উদয়কুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), ভাষা-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, কলিকাতা, সেজুঁতি, মার্চ ১৯৯৮।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলিকাতা, কার্তিক, ১৩৩৪।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, মাঘ ১৩৩৪।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথমবর্ষ, ষষ্ঠসংখ্যা, কলিকাতা, চৈত্র ১৩৩৪।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথমবর্ষ, সপ্তমসংখ্যা, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৩৫।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), প্রথমবর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৩৫।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), দ্বিতীয়বর্ষ, অষ্টমসংখ্যা, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), দ্বিতীয়বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, কলিকাতা, চৈত্র ১৩৩৫।

মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), ৭ম বর্ষ, কলিকাতা, কার্তিক-আশ্বিন ১৩৪০-৪১।

ରଞ୍ଗପୁର-ସାହିତ୍ୟ-ପରିଷଦ୍ ପତ୍ରିକା, ଶ୍ରୀଭବାନୀପ୍ରସନ୍ନ ଲାହିଡ଼ି (ସମ୍ପା.), ନବମଭାଗ, ରଞ୍ଗପୁର,  
୧୦୨୧।

ସାହିତ୍ୟ-ପରିଷଦ୍-ପତ୍ରିକା, ଉନବିଂଶଭାଗ, ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀସତୀଶଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ (ସମ୍ପା.),  
କଲିକାତା, ବଙ୍ଗୀୟ-ସାହିତ୍ୟ-ପରିଷଦ୍-ମନ୍ଦିର, ୧୦୨୦।

### ଆନ୍ତର୍ଜାଲ:

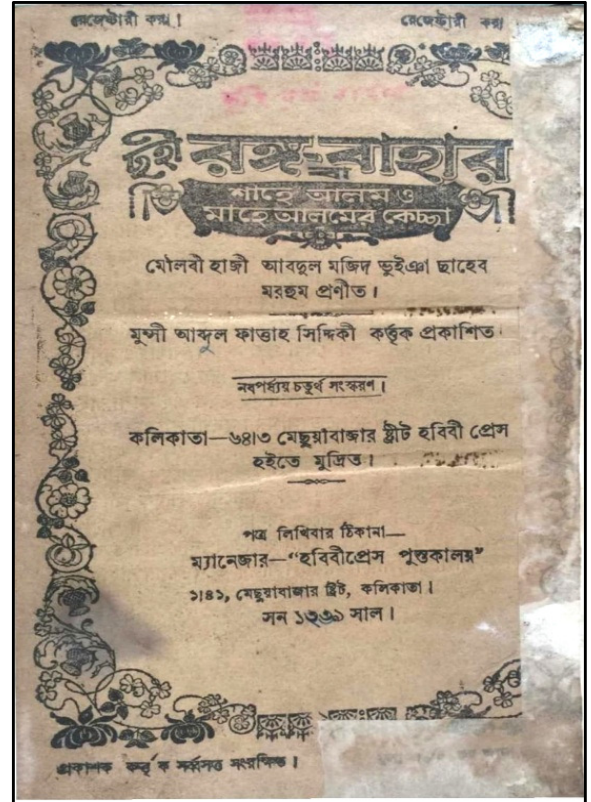
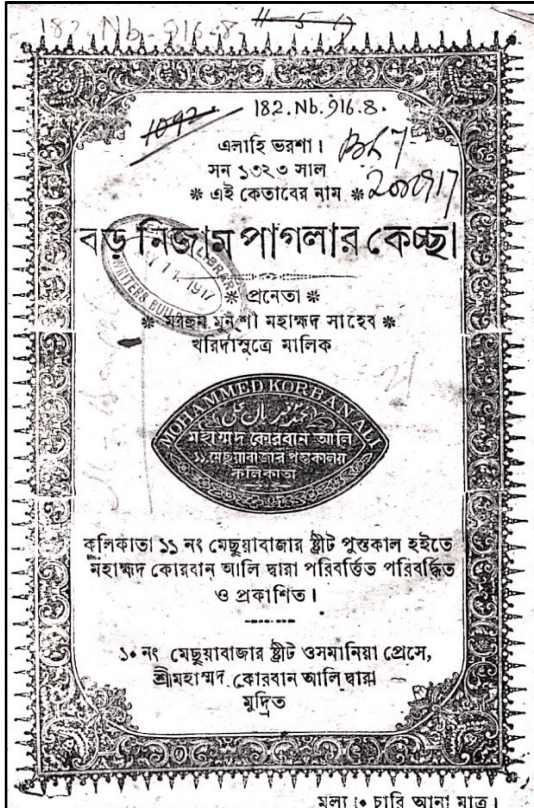
<https://www.google.com/amp/s/www.ntvbd.com/arts-and-literature/14986/%25E0%25A6%2595%25E0%25A7%2580-%25E0%25A6%2595%25E0%25A7%2587%25E0%25A6%259A%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%259B%25E0%25A6%25BE%3famp> (10/11/2022)

## পরিশিষ্ট ১

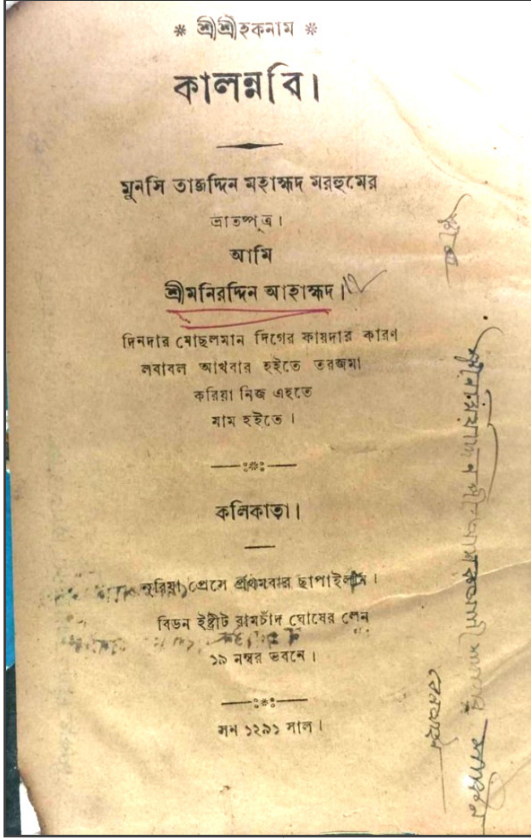
মুসলমান সাহিত্যিক রচিত নির্বাচিত পুস্তকের আখ্যাপত্র

আখ্যাপত্র - ১

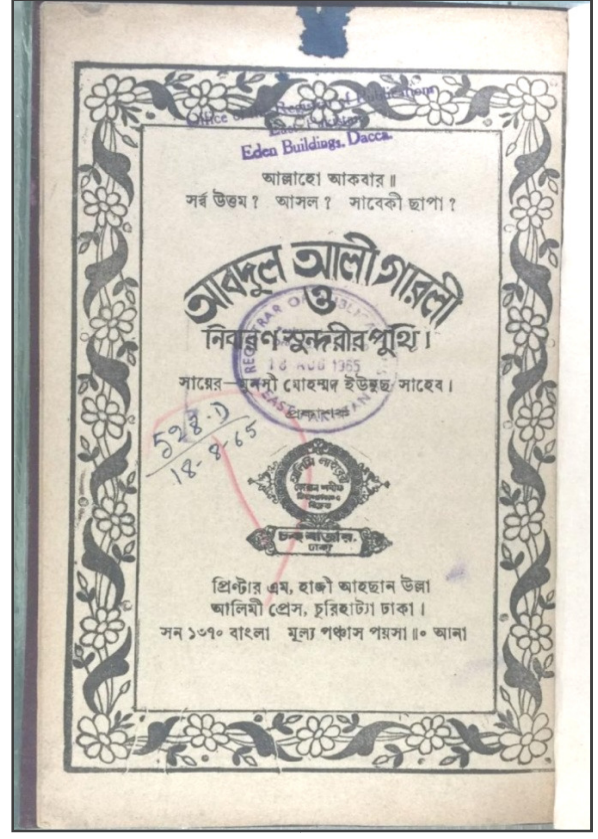
আখ্যাপত্র- ২



আখ্যাপত্র- ৩





আখ্যাপত্র- ৪






আখ্যাপত্র- ৫

আল্লাহু আকবর ।  
 রেজেক্টেরী করা আসল  
 ১৫-১-৫০  
 ১৯২০  
 গাজি কাল ও চাম্পাবতী  
 কবীর পুথী  
 আদি ও আসল আর যত হইয়াছে সত্যই নকল  
 আবদুর রহিম প্রণীত  
 শ্রী আবদুল করিম দ্বারা প্রকাশিত ।  
 মাঃ গলাচিপা পোঃ আঃ হোসেনপুর জিঃ ময়মনসিংহ

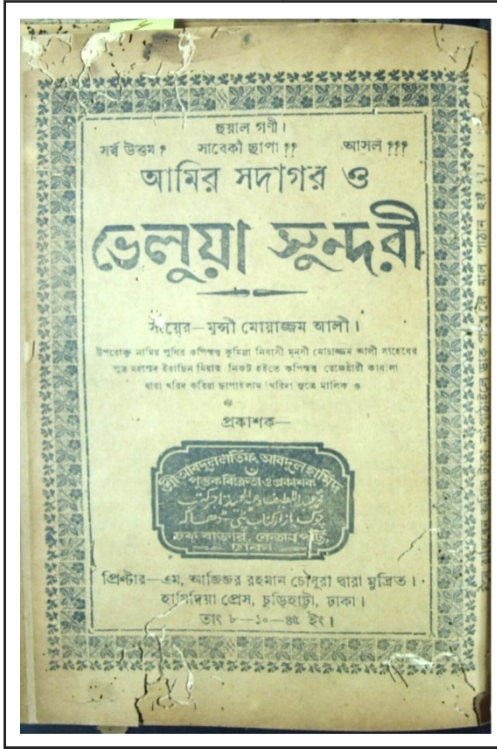



এই পুস্তক আমার পিতা মুন্সী আবদুর রহিম  
 সাহেবের রচনা আমি আবদুল করিম  
 ঢাকা চওকের মসজিদের নীচে আজিমী প্রেসে  
 পূর্ব হইতে সূত্র ও নরস কাগজ দ্বারা ছাপাইলাম ।  
 সত্য মিথ্যা পুস্তক দেখিলেই জানিতে পারিবেন  
 বৃদ্ধের নামকি, ফলে পরিচয় ।  
 সন ১২১২ মাল ।  
 শ্রী হামিদররহমান খাঁ প্রিন্টার দ্বারা মুদ্রিত ।  
 মূল্য ১০ আনা মাত্র ।

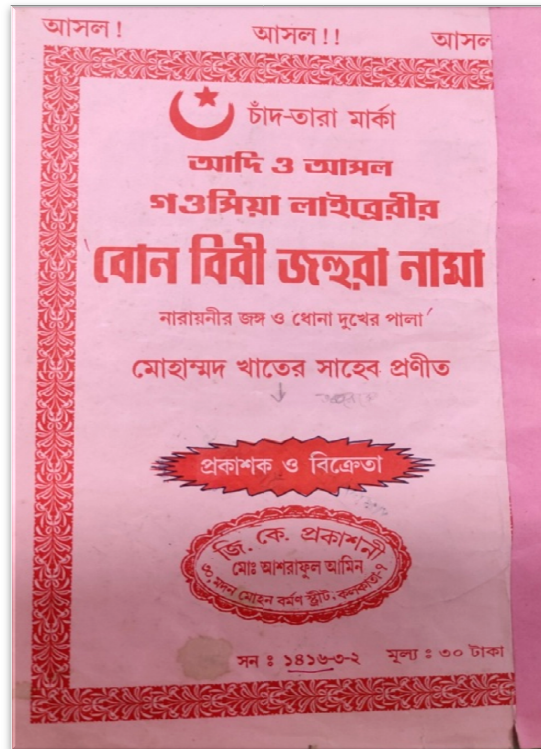
আখ্যাপত্র- ৬

ছয়াল গণী  
  
 আদি ও আসল  
**ইউছফ জোলেখা**  
 বা  
**মোহাব্বাত নামা**  
 রচনা মুন্সী শাহ মুহম্মদ হারুণ আলি  
 Office of the Executive Committee  
 of the  
 United Provinces  
 Government  
 Lucknow  
  
**চক্ৰবর্তী**  
 ঢাকা  
 মন ১২১২ সন  
 মূল্য ১০ আনা মাত্র

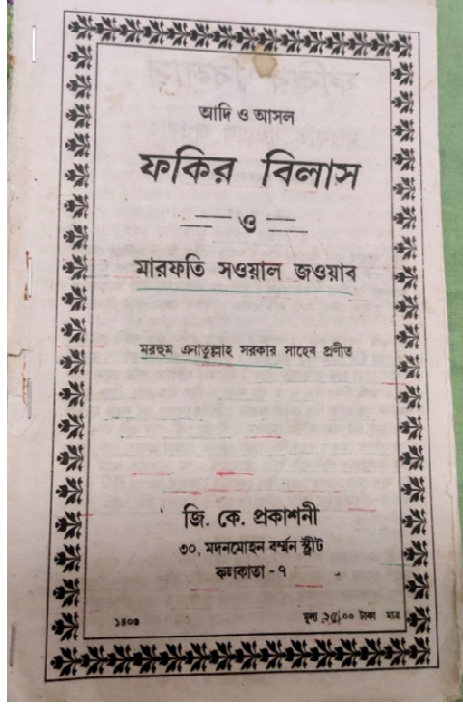
আখ্যাপত্র- ৭



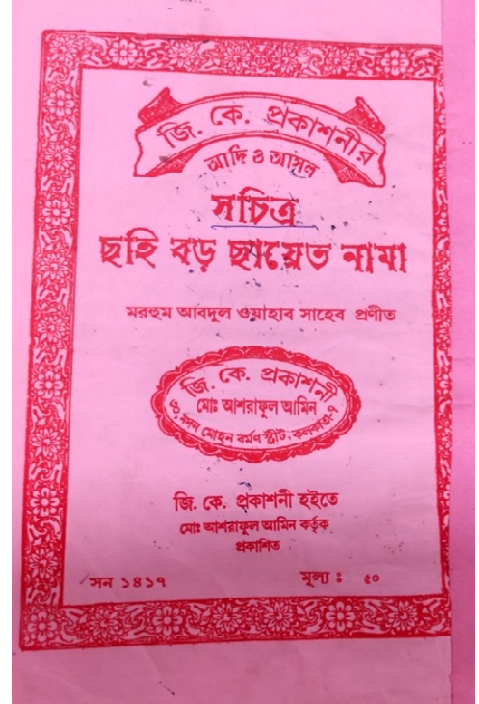
আখ্যাপত্র- ৮



আখ্যাপত্র- ৯

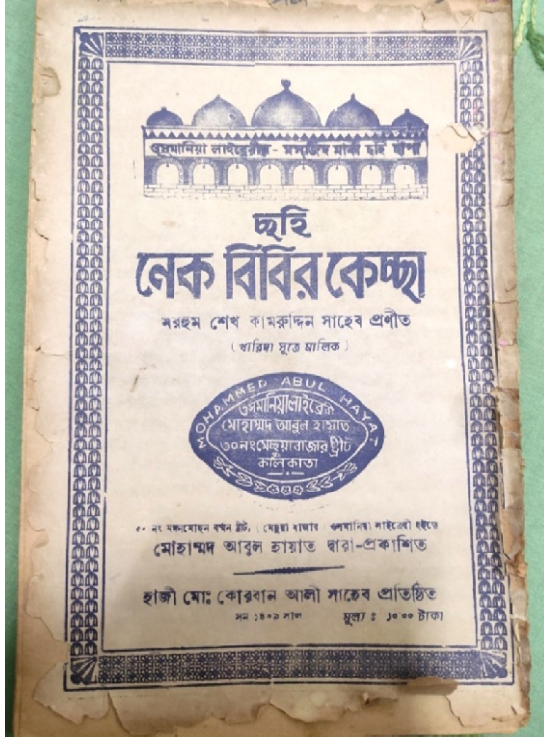


আখ্যাপত্র- ১০

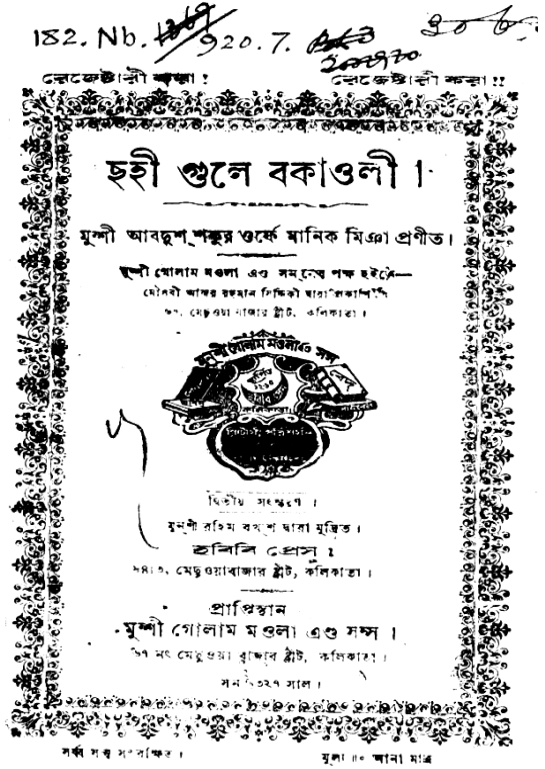




আখ্যাপত্র- ১১



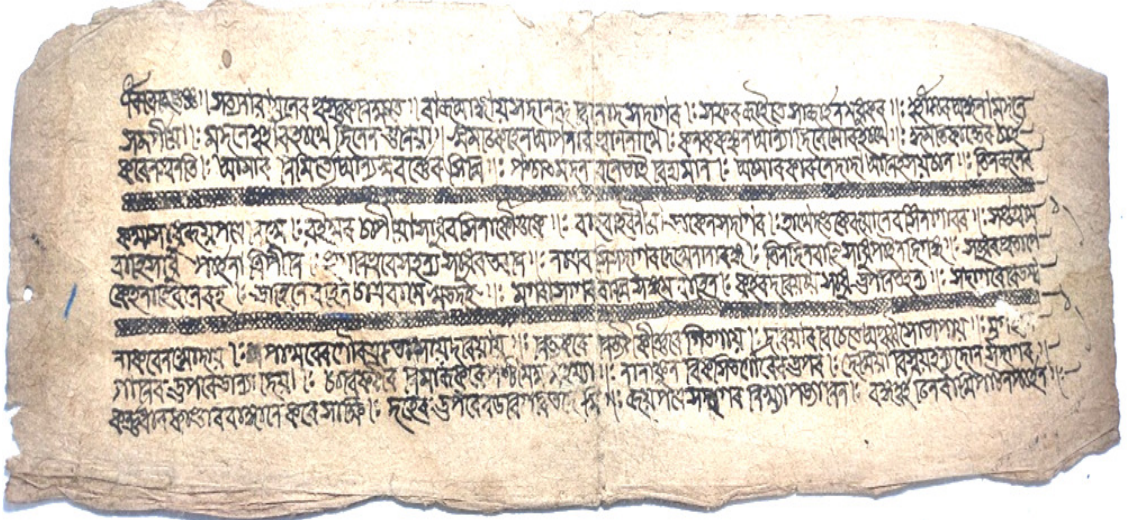
আখ্যাপত্র- ১২



পরিশিষ্ট ২

ইসলামি পুথির চিত্র

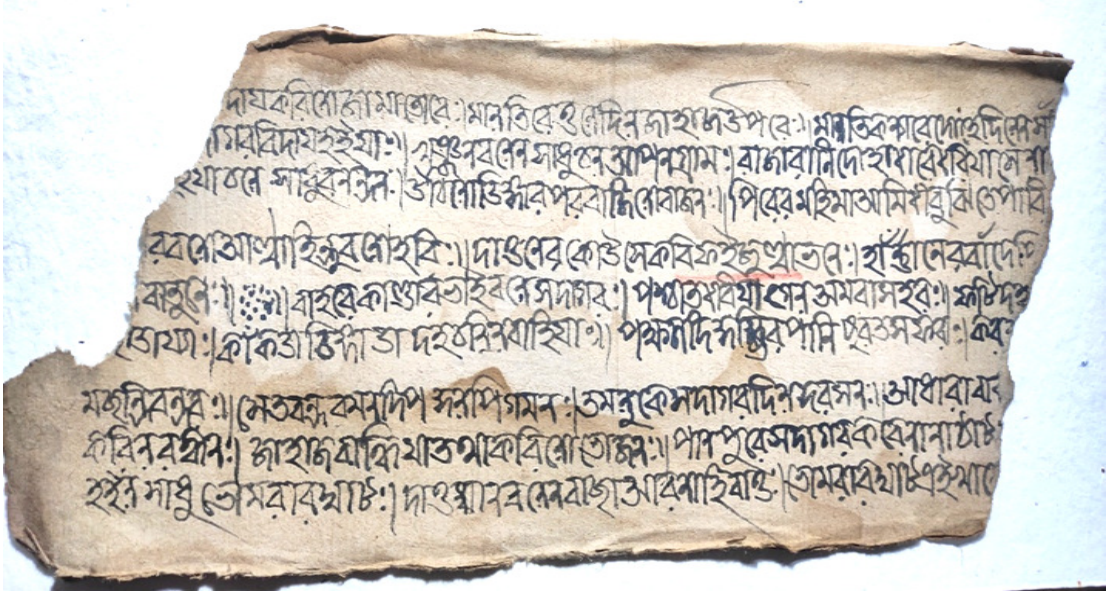
চিত্র- ১



কবিবল্লভ রচিত সত্যনারায়ণের পুস্তক-মদনসুন্দরের পালা মূল পুথির ১খ পৃষ্ঠা

সংগৃহীত: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুথিসংখ্যা-১৭৯৫

চিত্র- ২

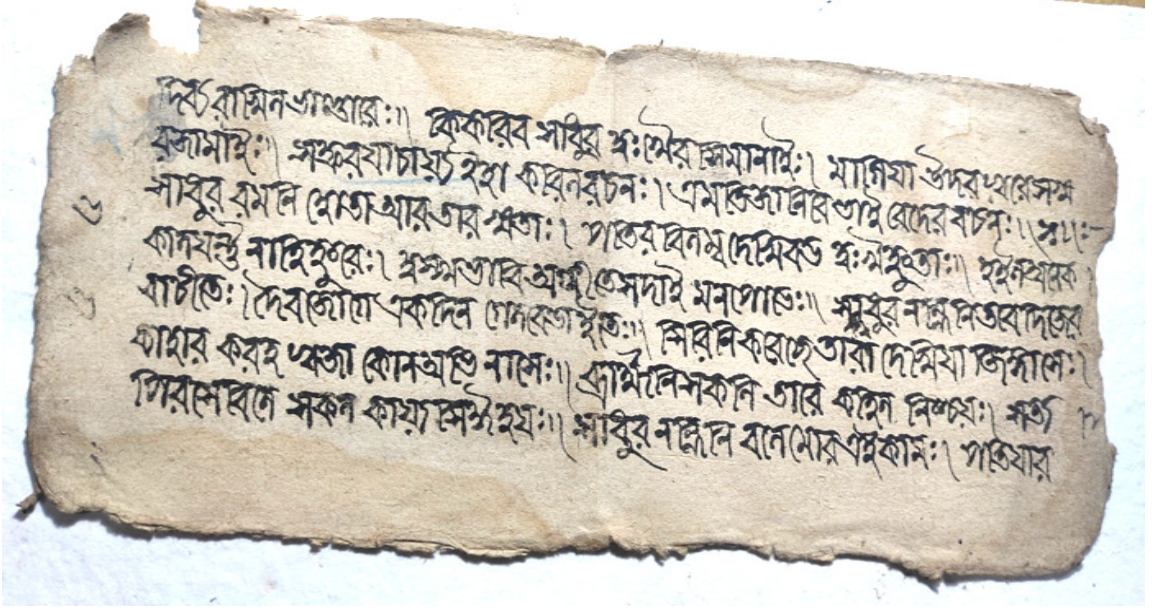


ফয়জুল্লা রচিত সত্যপীরের পাঁচালী পুথির ১১খ পৃষ্ঠা

সংগৃহীত: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুথিসংখ্যা- ২৯৫১

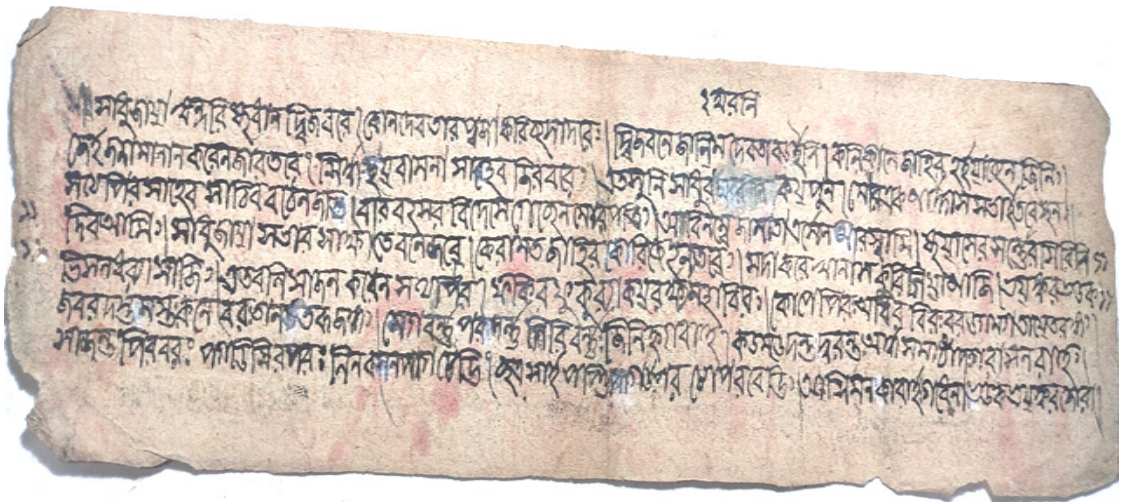


চিত্র- ৩



শঙ্কর আচার্য্য রচিত সত্যনারায়ণের পুথি ৬খ পৃষ্ঠা  
সংগৃহীত: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুথিসংখ্যা-২২৭৭

চিত্র-৪



ফকিররাম রচিত সত্যনারায়ণ পুথি ১১খ পৃষ্ঠা  
সংগৃহীত: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুথিসংখ্যা-২৩৮১

## পরিশিষ্ট ৩

মুসলিম জনসংখ্যা ও শিক্ষার গণনা

## সংযোজনী-১

বছর (খ্রিঃ)	ভারতের মোট জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতাংশে
১০০০	২০০,০০০,০০০	-	-
১১০০	১৮০,০০০,০০০	*	*
১২০০	১৯০,০০০,০০০	৩০,০০,০০০ ৪০,০০,০০০	১.৬-২.১
১৩০০	১৭৫,০০০,০০০	*	*
১৪০০	১৭০,০০০,০০০	৩,২০০,০০০	১.৮
১৫০০	১২৫,০০০,০০০	*	*
১৬০০	১৪০,০০০,০০০	১৫,০০০,০০০	৯.৮৫
১৭০০	১৭৫,০০০,০০০	*	*
১৮০০	১৭০,০০০,০০০	২৫,০০০,০০০	১৪.০০
১৮৮১	*	৪৯,৯৫৩,০০০	১৯.০০

\* তথ্য নেই।

সূত্র: প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়, 'মুসলিম জনসংখ্যা কি বাড়ছে?', কলকাতা, সংহতি, ১৯৯১।

পৃ.৮



## সংযোজনী-২

### হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিতের অনুপাত\*

	মুসলমান	হিন্দু
ফার্সি জানা	$1\frac{2}{3}$	১
বাংলা জানা	১	২৪
শিক্ষারত	১	$10\frac{1}{2}$
পড়তে সক্ষম	৭.৩	$9\frac{1}{3}$
মোট শিক্ষিত	১	৯

\*Adam's Reports এ বর্ণিত তথ্য অবলম্বনে।

সূত্র: আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)', ঢাকা, চারুলিপি, ২০১২। পৃ.৫৮

## সংযোজনী-৩

### Religion Table

Religion	Total no. of Souls
Hindus	1,692,054
Mahomedans	176,109
Bhuddhists	1,472
Christians	1,379
People of other religions	8,636
Total	1,879,650

সূত্র: Report of the Census of Bengal 1872, By H. Beverley (Inspector Central of Registration, Bengal), P.3